জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

১৯৭৯-২০০৬

৩য় খণ্ড

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

(১৯৭৯-২০০৬)

৩য় খণ্ড

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক মোসলেম উদ্দিন শিকদার
মাওলানা আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন মোল্লা

পরিবেশনায়
প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

(১৯৭৯-২০০৬)

৩য় খণ্ড

প্রকাশক	ঃ	আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৫ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
প্রকাশকাল	ঃ	নভেম্বর ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ	ঃ	জানুয়ারি - ২০২২ পৌষ - ১৪২৮ জমাদিউস সানি - ১৪৪৩
নির্ধারিত মূল্য	ঃ	২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।
মুদ্রণে	ঃ	আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Jamaate Islamir Itihas : 1979 - 2006 (3rd part). *Published by : Abu Taher Mohammad Masum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.*

Fixed Price: Two hundred fifty taka only.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের কাহিনীই ইতিহাস। ইতিহাস প্রায়শঃই পুনরাবৃত্ত হয়। তাই অতীত জানা মানে বর্তমানকেই জানা। ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্যও তাই, অতীতের আয়নায় বর্তমানকে দেখে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। ইতিহাস পাঠে পাঠকের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়।

জামায়াতে ইসলামীরও রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। জামায়াত গঠনের লক্ষ্যে মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৪১ সালের ২৬ থেকে ২৯ শে আগস্ট এক সম্মেলনের আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে সারা ভারত থেকে ৭৫ জন মর্দে মু'মিন উপস্থিত হন এবং জামায়াতে ইসলামী হিন্দ গঠিত হয়। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী গোপন ব্যালটে সর্ব সম্মতিক্রমে আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন এবং দলের গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সম্মেলনের তৃতীয় দিনে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে শূরা গঠন করা হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ অগাস্টের মধ্যবর্তী রাতে দিল্লিতে বসে এশিয়া উপমহাদেশের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। সে সময় উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬২৫ জন। দেশ ভাগের কারণে জামায়াতে ইসলামী ভাগ হল। ২৪০ জন সদস্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ এবং ৩৮৫ জন সদস্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে।

১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ক্ষমতাসীন সরকার সকল ইসলামী সংগঠন বেআইনি ঘোষণা করে এবং ১৯৭৫ সালে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ফরমান জারী করে একদলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ আদেশের ফলে বিলুপ্ত ঘোষিত আওয়ামী লীগ যেমন নতুন করে রাজনীতি করার সুযোগ পায় তেমনি জামায়াতে ইসলামীসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী দলগুলোও নতুন করে রাজনীতি করার অধিকার লাভ করে।

১৯৭৯ সালের ২৭ মে ঢাকাস্থ হোটেল ইডেনে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আব্বাস আলী খানের আহ্বানে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। কনভেনশনে সারা বাংলাদেশ থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রায় ১০০০ সদস্য উপস্থিত হন। উক্ত সম্মেলনে একটি নতুন গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয় এবং সেই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে চার দফা পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু হয়।

গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনটি আপসহীনভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পথে চলতে যেয়ে জামায়াতকে মোকাবিলা করতে হয়েছে হাজারো বাঁধা প্রতিবন্ধকতা। সকল বাঁধাকে ছিন্ন করে জামায়াত এগিয়ে চলছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে জামায়াতের পথ চলাকে শানিত করেছে শত-শহীদেরা। দিন-দিন দীর্ঘ হচ্ছে সে কাফেলা, শামিল হচ্ছে নতুনেরা।

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকের ইতিহাস প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশ আমলের কোন ইতিহাস বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ ইতিহাস জানার আগ্রহ পাঠক সমাজের দীর্ঘ দিনের। সেজন্য অনেক আগে উদ্যোগ নেয়া হলেও মকবুল আহমাদ (রাহি.) আমীরে জামায়াত এর দায়িত্ব পালনকালে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ১৯৭৯ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঘটনা প্রবাহের একটি সংকলন চূড়ান্ত করা হয়। যা তৃতীয় খণ্ড হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অনেক মেহনত করে যারা এই ইতিহাসকে রচনা করেছেন তাদের জন্য মহান রবের কাছে যথাযথ প্রতিদান চাচ্ছি। দুআ' করছি সাবেক কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মাযহারুল ইসলাম সাহেবসহ যেসকল সুহৃদ বন্ধুগণ রচয়িতাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

শত সহস্র ঘটনা প্রবাহের মধ্য থেকে কলেবর বড় হয়ে যাবে সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ই অত্র খন্ডে সন্নিবেশ করা যায়নি। যতটুকু সন্নিবেশিত হয়েছে আশা করছি বিদগ্ধ পাঠক সমাজ তা থেকে লাভবান হবেন। বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পেলে জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন ॥

আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
০৪ জানুয়ারি ২০২২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমীরে জামায়াত
জনাব মকবুল আহমাদ এর কথা

বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় মানুষের অতি পরিচিত একটি সংগঠনের নাম জামায়াতে ইসলামী। অনেক পথ পেরিয়ে জামায়াতে ইসলামী আজ এদেশের গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হয়েছে। ১৯৪১ সালে মাত্র ৭৫ জন সদস্য নিয়ে নিখিল ভারতে সংগঠনটি পদযাত্রা শুরু করে। ভারত বিভক্তির পর সংগঠনটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তানে কার্যক্রম চালায়।

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর শাসক গোষ্ঠী যথেচ্ছা সংবিধান প্রণয়ন করে ইসলামী রাজনীতির পথ রুদ্ধ করে দেয়। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘ সময় এদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে তাদের কোন তৎপরতা চালাতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘোষিত ফরমানের বদৌলতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের ফলে ইসলামী রাজনীতির ধারা চালু হয় এবং ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

রাজনীতির মাঠে আত্মপ্রকাশের পর জামায়াতে ইসলামী এদেশের মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের পাশাপাশি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালে দেশ ও জনগণের কল্যাণে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজনে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জামায়াতের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম "কেয়ারটেকার সরকার" ফর্মুলা প্রদান করেন। ১৯৮১ সালে জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার দাবিসহ ইসলামী বিপ্লবের সাতদফা গণ দাবি পেশ করে।

বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, বাম সংগঠনের ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ০৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার পদত্যাগ করে এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে দেশের ইতিহাসে প্রথম কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য প্রতিটি পার্লামেন্ট নির্বাচনেই জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ করে এবং জামায়াত এম,পিগণ পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন লাভ করে। বিএনপি ১৪০টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও ১১টি আসনের সমর্থন ব্যতিত সরকার গঠন করতে পারছিলেন না। দেশের স্থিতিশীলতা ও গণ-মানুষের কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় এনে জামায়াতে ইসলামী ১৯৯১ সালে সরকার গঠনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে নিঃস্বার্থভাবে সমর্থন প্রদান করে যা ইতিহাসে নজির বিহীন।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে একটি অসম চুক্তি সম্পাদন করে। মূলত এই চুক্তি স্বাক্ষর করে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে ফেলে। এই চুক্তির মাধ্যমে উপজাতীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির মালিক বানানো হয়। অ-উপজাতীয় লোকেরা সেখানে জমির মালিকানা ভোগ করতে পারবে না। আবার গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করবে উপজাতীয় লোকেরাই। জামায়াতে ইসলামী সংসদের ভিতরে ও বাহিরে এই অসম এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

আওয়ামী দুঃশাসনের শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং দেশের কল্যাণ সাধনের প্রত্যয়ে ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী চার দলীয় জোট গঠন করে এবং ২০০১ সালের ০১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে চার দলীয় জোট- সরকার গঠন করে। জামায়াতের তৎকালীন আমীর

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ পরবর্তীতে ২০০৬ সালে নিময়তান্ত্রিক পন্থায় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। সে প্রক্রিয়াকে ভন্ডুল করার জন্য আওয়ামী লীগ ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমের উত্তর গেট সংলগ্ন সড়কে জামায়াতে ইসলামীর পূর্বঘোষিত জনসভায় লগি-বৈঠার হামলা চালিয়ে ৬ জন নিরপরাধ জামায়াত কর্মীকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। হত্যার পর হামলাকারীরা শহীদদের লাশের উপর নেচে-নেচে নারকীয় কায়দায় উল্লাশ প্রকাশ করে। এ দিনটিতে সারা দেশ যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আর এভাবেই ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকার দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

জামায়াতে ইসলামী মনে করে সকল ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম কায়েম সহজ হবে। তাই এদেশের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রেও জামায়াতে ইসলামী অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ইসলামী ঐক্যের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। তারই অংশ হিসেবে ১৯৮১ সালে প্রায় ৩০০ নেতৃস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের নিয়ে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' গঠন করা হয়েছিল। এদেশের ইসলামী শক্তিগুলোর বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে সকল ইসলামী দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্যোগও জামায়াতে ইসলামীই নিয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে দেশের বিশিষ্ট ০৮টি দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন- খেলাফত মজলিশের সাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, জমীয়তে ওলামায়ে ইসলামের মাওলানা মহিউদ্দিন খান, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়্যেদ ফজলুল করিম, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের ব্যারিস্টার কুরবান আলী, তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবদুল গফুর, শর্ষিনার পীর সাহেবের প্রতিনিধি মাওলানা রূহুল আমীন খান, নেযামে ইসলামীর মাওলানা আশরাফ আলী ও জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম। ঐক্য প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে নভেম্বর

মাসে জামায়াতে ইসলামীর 'ওলামা-মাশায়েখ কমিটির পক্ষ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান (প্রাক্তন এমপি) এবং এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম (সুপ্রিম কোর্ট) চট্টগ্রামের কয়েকজন আলেমসহ হাটহাজারী ও পটিয়ার বিখ্যাত দু'টো মাদ্রাসার মুহতারাম মুহতামিমদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের লেখা চিঠি হস্তান্তর করেন এবং ঐক্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জামায়াতে ইসলামী একটি সন্ত্রাস ও ভায়োলেন্স বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় জামায়াত কখনই কোন সন্ত্রাস করেনি এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে সমর্থন দেয়নি। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র বানাতে চায়।

জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে এক বর্নাঢ্য ইতিহাস। সংগঠনের প্রাথমিক যুগের সাত বছরের ইতিহাস বহু আগে রচিত হলেও পরবর্তী সময়ের ইতিহাস পুস্তকাকারে পাওয়ার জন্যে অনেকেই দাবি করে আসছিলেন। চলমান বাস্তবতার কারণে বেশ সময় পরে হলেও স্বাধীনতাত্তোর (১৯৭৯-২০০৬ পর্যন্ত) জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসের সংকলনটি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। সংকলনটি পাঠে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস জানার পাশাপাশি পাঠক সমাজ যেন তাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই ফরিয়াদ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন॥

ঢাকা
নভেম্বর ২০১৮

মকবুল আহমাদ
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

—— সূচিপত্র ——

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী ১৭
বাংলাদেশ পরিচিতি ১৭
ইতিহাসের আলোকে বর্তমান বাংলাদেশ ১৮
বাংলাদেশে ইসলাম ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ২১
হোটেল ইডেন প্রাঙ্গনে সদস্য (রুকন) সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণ ২৩
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ১৯৭৯-১৯৮১ কার্যকালের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ২৭
১৯৭৯ সালের জেলা আমীরগণ ২৯
একটি সাংগঠনিক সমস্যা ও তার প্রতিকার ৩০
জনাব আবদুল খালেকের ইন্তেকাল ৩১

তৃতীয় অধ্যায়

অধ্যাপক গোলাম আযমের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে সমস্যা ৩৩
বাংলাদেশের জনগণের রাষ্ট্রীয় পরিচয়– জাতীয়তা ৩৩
বাংলাদেশী জাতীয়তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ৩৪
মাওলানা মওদূদীর ইন্তেকাল ও জানাজা ৩৫
ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি ৩৭
প্রেসিডেন্ট জিয়ার অসতর্ক উচ্চারণ- জামায়াত-শিবিরের উপর নির্যাতন ৪০
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা ৪১
১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ৪২
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটদানের ব্যাপারে জামায়াতের বক্তব্য ৪৩
জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল ৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা ৪৬
কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ৪৬
প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সংলাপে জামায়াত ৪৯

সংলাপে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য ৫০
বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উপায় ৫০
সংলাপে সবাই একসাথে না যাবার পরিনাম ৫১
১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রস্তাব ৫২
সমকালীণ রাজনীতিতে হাফেজ্জী হুজুর (১৮৮৮-১৯৮৭) ৫৩
সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মাওলানা হাফেজ্জী হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ ৫৪
গণতন্ত্র দিবস পালন ৫৬
১৯৮৬-১৯৮৮ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম ৫৭
অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসায় হামলা ও তার প্রতিবাদ ৫৮
অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার আন্দোলনের পটভূমি ৫৯
জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আতাউল গণী ওসমানীর মৃত্যু ৬২
রাষ্ট্রপতি এরশাদের দেওয়া গণভোট ও উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন বর্জন ৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে মুসলিম নিধন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ ৬৪
অনশনরত ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ ৬৫
আওয়ামী জোটের সভায় বোমা হামলার নিন্দাজ্ঞাপন ৬৬
৩য় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং প্রতীক সমস্যার সমাধান ৬৬
১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৬৭
সরকারি দল কর্তৃক ভোট কারচুপির প্রমাণ ৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জন ৭১
৩য় সংসদে জামায়াত এম.পি-গণের ভূমিকা ৭২
সংসদ অধিবেশন বর্জনের আহবান- ১৯৮৬ ৭৩
১৯৮৬ সালে বিরাজমান দুর্ভিক্ষাবস্থা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ ৭৪
জেলা আমীর সম্মেলন ১৯৮৭ এর প্রস্তাব ৭৫
হরিপুরে তৈল ইজারা দেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ ৭৫
জামায়াতের দু'টি আদর্শিক বিজয় ৭৬
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ইন্তেকাল ৭৭

জামায়াতের দশজন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ ও
তৃতীয় জাতীয় সংসদের পরিনতি ৭৯
চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৮০
১৯৮৯-১৯৯১ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত
নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম ৮২

সপ্তম অধ্যায়

রুশদীর "দি স্যাটানিক ভার্সেসের" প্রতিবাদে হরতাল পালন ৮৫
শ্রীলংকায় ভারতীয় বাহিনীর অভিযানে উদ্বেগ প্রকাশ ৮৫
বিহারী মুসলমানদের পূনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন প্রশ্নে জামায়াত ৮৬
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে মজলিসে শূরা ৮৭
ইসলামী ঐক্যের জন্য জামায়াতের সর্বাত্মক প্রয়াস ৮৯
ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াতের নীতি ৯০
ছারছীনার পীর মাওলানা আবু জাফর সাহেবের ইন্তেকালে
অধ্যাপক গোলাম আযমের শোক প্রকাশ ৯১
কওমী মাদরাসার উস্তাদগণের প্রতি মাওলানা মওদূদীর (রহ.)
রচিত সাহিত্য অধ্যয়নের আহ্বান ৯২
কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে আবার যুগপৎ আন্দোলন ৯৩
জেনারেল এরশাদের পতন ও পদত্যাগ প্রসংগ-১৯৯০ ৯৩

অষ্টম অধ্যায়

ইরাকের কুয়েত দখলে জামায়াতের প্রতিক্রিয়া ৯৫
৫ম সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠনে জামায়াতের ঐতিহাসিক ভূমিকা ৯৬
বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব ৯৬
আওয়ামীলীগ-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব ৯৮
জামায়াত কর্তৃক ক্ষমতার রাজনীতি বর্জনের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত ৯৯
একটি অনানুষ্ঠানিক ঐতিহাসিক সমঝোতা বৈঠক ১০০
প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার ১০০
সরকার পদ্ধতি নিয়ে সমস্যা ও তার সমাধান ১০১
প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না ১০৩
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওয়াদা রক্ষা করলেন না ১০৪
ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ১০৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর
হামলার প্রেক্ষিতে মজলিসে শূরার অভিমত ১০৫

১৯৯১ সনের ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থীদের জামায়াতে ইসলামীর আমীরের কাছে ধর্ণা ১০৭
জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণ ১০৭
বর্মী সৈন্যদের হামলার নিন্দায় জামায়াত ১০৮

নবম অধ্যায়

জামায়াতের ত্রি-বার্ষিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন ১৯৮১-৮৯ ১০৯
কেন্দ্রীয় আমীর ও মজলিসে শূরার নির্বাচন পদ্ধতি ১১০
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের ফলাফল পর্যালোচনা ১১১
৫ম সংসদে জামায়াত এমপিদের ভূমিকা প্রসংগ ১১১
১৯৯২-১৯৯৪ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম ১১৩
বিদেশী নাগরিক অজুহাতে অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রেফতার ১১৬
ইসলামী শক্তির সময়োপযোগী সমাবেশ ১১৮
তথাকথিত গণ-আদালত সম্পর্কে জামায়াত ১২০

দশম অধ্যায়

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন- ১৯৯২ ১২৪
অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস প্রসঙ্গে প্রস্তাব গ্রহন ১২৪
পঞ্চম কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন-১৯৯২ ১২৫
আফগান মুজাহিদদের শান্তি চুক্তিকে মোবারকবাদ ও মজলুম বিশ্ব মুসলিমের পাশে জামায়াত ১২৮
প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও ধর্মদ্রোহী রুশদীর মধ্যকার বৈঠকের নিন্দা জ্ঞাপনে জামায়াত ১৩০
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বিশেষ অধিবেশন-১৯৯৩ ১৩১
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন-১৯৯৩ ১৩১
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন- ১৯৯৩ ১৩৩

একাদশ অধ্যায়

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলা ১৩৪
সর্বোচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায় ১৩৫
নাগরিকত্ব পুনর্বহাল আন্দোলনে শহীদ যারা ১৩৬
বায়তুল মুকাররমে শুকরিয়া সমাবেশ ১৩৬
মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন জুলাই- ১৯৯৪ ১৩৮

লালদিঘির রক্তস্নাত ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভা ১৪০
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ১৯৯৪ ১৪১
১৯৯৫-১৯৯৭ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত
নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম ১৪৩
৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচন ও কেয়ারটেকার বিল সংবিধানভূক্তকরণ ১৪৬
কেয়ারটেকার সরকার দাবি আদায়ে জামায়াতের শোকরিয়া জ্ঞাপন ১৪৭
সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১২ জুন ১৯৯৬ ১৪৮

দ্বাদশ অধ্যায়

আওয়ামী শাসন শুরু ও জামায়াতের প্রস্তাব ১৪৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, মার্চ ১৯৯৭ ১৫০
জামায়াতের ১৭ দফা কর্মসূচি (১৯৯৭) ১৫২
১৭ দফার লক্ষ্য ও রূপরেখা (Aims & outline) ১৫২
বায়তুল মোকাররমের খতীবের প্রতি সরকারি নোটিশ জারি ১৫৬
খতীব সাহেবের ইন্তেকাল ১৫৮
স্বাধীনতা সুরক্ষায় জামায়াতের ভূমিকা ১৫৮
জাতিসংঘের ইসলাম বিরোধী প্রস্তাবে সরকারের স্বাক্ষরদানের
প্রতিবাদ ও দেশব্যাপী হরতাল ১৬০
১৯৯৮-২০০০ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত
নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম ১৬১
ত্রি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন-১৯৯৭ ১৬৩
সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি ও আলোচ্য বিষয় ১৬৫
শুভেচ্ছাবানী পাঠ ও মেহমানবৃন্দ ১৬৭
গ্যারন্টি ক্লজবিহীন ফারাক্কা চুক্তির প্রতিবাদ ১৬৮
১৯৯৭ সনের ২ রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত তথাকথিত 'শান্তি চুক্তি'র প্রতিবাদ ১৭১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুদান, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা ও ভারতের পুশ-ইনের নিন্দা ১৯৯৮ ১৭৬
কসোভোর মজলুম মুসলমানদের পক্ষে আমীরে জামায়াত ১৭৮
দৈনিক ইনকিলাব কর্তৃপক্ষের প্রতি নিজামীর সমবেদনা (এপ্রিল' ৯৯) ১৭৯
দৈনিক ইনকিলাব মহা সম্পাদকের ইন্তেকালে আমীরে জামায়াত ১৭৯
আব্বাস আলী খানের ইন্তেকাল ১৯৯৯ ১৮০
জয়পুরহাটে শেষ যাত্রা ১৮১
জনাব আব্বাস আলী খান (১৯১৪-১৯৯৯) ১৮২

বিভিন্ন দূর্যোগ ও বন্যায় জামায়াতের ভূমিকা (১৯৯৮-২০০০) ১৮৫
চট্টগ্রামে শিবিরনেতা হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন ১৮৭
পল্টনে কর্মী সভায় বোমা হামলার অপপ্রয়াস ১৯৯৯ ১৮৯
চারদলীয় জোট গঠন ঃ জোটের ঘোষণাপত্র ১৮৯
ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের নিন্দা ১৯৪
সরকারি দল কর্তৃক বিচার বিভাগের অবমাননার নিন্দা ১৯৬
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতজানু মানসিকতার প্রতিবাদ ১৯৭

চতুর্দশ অধ্যায়

২০০১-২০০৩ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত
নির্বাচিত হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৮
বিদায়ী আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য ২০২
অধ্যাপক গোলাম আযমসহ দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী বলার প্রতিবাদ ২০৪
মাওলানা সাঈদী সম্পর্কিত বানোয়াট তথ্যের প্রতিবাদ ২০৬
বি.সি.এস. ক্যাডার সার্ভিস দলীয় করণের নিন্দা ২০৭
আল কুদস দিবসে জামায়াত প্রধান ২০৯
জামায়াত শিবির বিরোধী অপ-প্রচারের মোকাবিলায়
মাওলানা নিজামীর সাংবাদিক সম্মেলন-২০০১ ২০৯
বেসরকারি শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে আমীরে জামায়াতের সাক্ষাতকার ২১৫
সেক্রেটারি জেনারেলের সকাশে তাফসিলী নেতৃবর্গ ২১৬
২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইনটাওয়ার
ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় জামায়াত ২১৮
২০০১ সনের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ২১৯
নির্বাচনোত্তর সাংবাদিক সম্মেলন ২২১
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন ২২২
আমীরে জামায়াত ও কৃষি মন্ত্রীর সাথে অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার ২২৩

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র আখ্যা দেবার ষড়যন্ত্র ২২৬
পীরজাদা মোসলেহ উদ্দীনের হত্যায় জামায়াত নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতি ২২৭
উপজেলা আমীর সম্মেলন- ২০০২ ২২৭
মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন ২২৯
শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রসঙ্গে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ২৩১
ইসলাম বিরোধী বাংলাপিডিয়া নিষিদ্ধ করার জন্য
উলামা মাশায়েখ কমিটির যুক্ত বিবৃতি ২৩২

যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাই দারিদ্র বিমোচনের একমাত্র মাধ্যম ২৩৩
কেন্দ্রীয় শূরায় আমীরে জামায়াত ও কৃষিমন্ত্রীর ভাষণ ২৩৫
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকাল ২৩৭
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মন্ত্রণালয় পরিবর্তন ২৩৯

ষোড়শ অধ্যায়

জামায়াতের দৃষ্টিতে অমুসলিম নাগরিক ২৪৩
অমুসলিমদের প্রতি অধ্যাপক গোলাম আযমের আবেদন ২৪৪
মাওলানা মওদূদীর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে জামায়াত নেতাদের লাহোরে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান ২৪৫
মওদূদী একাডেমীর উদ্যোগে একটি সেমিনারে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২৪৫
২০০৪-২০০৬ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২৪৭
আমীরে জামায়াতের ইফতার মাহফিল ২৪৯
পেশাজীবীদের নিয়ে ইফতার মাহফিল ২৫০
শিল্পমন্ত্রী ও আমীরে জামায়াতের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় ২৫২
বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ সম্মেলনে সম্মানীত আমীরে জামায়াত ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ২৫৩

সপ্তদশ অধ্যায়

জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহ উদযাপন ২৫৫
তাবলীগ জামায়াতের বিশ্ব ইজতিমা- প্রসংগ কথা ২৫৫
তাবলীগ জামায়াত নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি কেন ২৫৬
একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২৫৭
স্বাধীনতা দিবস- ২৬ মার্চ ২৫৭
বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জামায়াত ২৫৮
জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস প্রসংগ ২৫৯
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন ২৬১
অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি অপনোদনের আহবান ২৬২
ঐতিহাসিক বিজয় দিবসে জামায়াত ২৬৩
মহরম (আশুরা) উদযাপন ২৬৫
মে দিবস উদযাপন ২৬৬
বালাকোট দিবস উদযাপন ২৬৬
১লা এপ্রিল ঐতিহাসিক গ্রানাডা ট্রাজেডি দিবস এ শিক্ষা ২৬৬
আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও আশু তদন্ত দাবি ২৬৭

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মাওলানা নিজামীর ভাষণ ২৬৯
৮ম জাতীয় সংসদে মাওলানা নিজামী ২৭৯
কাদিয়ানী সমস্যা ও মাওলানা মওদূদী (রহ.) সম্পর্কে ২৭৯
২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনা ২৮২
দেশব্যাপী আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন ২৮৩
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ গঠন ২৯৩
ফাজিল ও কামিলের স্বীকৃতির পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ২৯৩
দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা প্রসঙ্গে
জাতীয় সংসদে আমীরে জামায়াত ২৯৫
৮ম জাতীয় রুকন সম্মেলন- ২০০৬ ২৯৮
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব
আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বক্তব্য ২৯৮
আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ ৩১৩
জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলা
রক্তাক্ত ও ভয়াল ২৮ অক্টোবর ২০০৬ ৩২৭
শিউরে ওঠা সেই কালো অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৩২৮
লাশ নিয়ে সেই পুরনো রাজনীতি ৩২৯
২৮ অক্টোবর শহীদ হলেন যারা ৩৩০
কেন্দ্রীয় ওলামা সমাবেশে মাওলানা নিজামীর ঐতিহাসিক ভাষণ ৩৩১

উনিশতম অধ্যায়

জোট সরকারের সাফল্যে দু'জন মন্ত্রীর ভূমিকা ৩৪৬
সফল মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ৩৪৬
কৃষি মন্ত্রণালয়ে মাওলানা নিজামীর অবদান ৩৪৭
শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাওলানা নিজামীর অবদান ৩৪৮
সফল মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ৩৪৯
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মুজাহিদের অবদান ৩৫০
স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে জামায়াতের রচিত সাহিত্য ৩৫১
২০০৬ সালের রাজনৈতিক সংকট এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র ৩৫৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী

মহান আল্লাহর জমীনে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণরূপে কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রাম করার যে জামায়াত বা দল তাই জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামী একটি পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন। মানব জাতির কল্যাণের জন্য বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে তার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার পতাকাবাহী সংগঠনের নাম জামায়াতে ইসলামী। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি সুন্দর ও সুখী সমাজ বিনির্মাণে নিরন্তর এগিয়ে চলছে এই সংগঠন।

১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট দক্ষিণ এশিয়ার লাহোর সিটিতে জামায়াতে ইসলামী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ৭৫ জন এবং আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হয়েছিলেন সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত আলাদা দু'টি রাষ্ট্র হলে জামায়াতে ইসলামীও দু'ভাগ হয় এবং ৩৮৫ জন সদস্য (রুকন) নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর শাসকগোষ্ঠী এদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে- জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশ পরিচিতি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরিণতিতে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী হাইকমান্ড জেনারেল এ, এ, কে, নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, তাই আজকের বাংলাদেশ। দক্ষিণ

এশিয়ার উত্তর পূর্বাংশে বঙ্গোপসাগরের উত্তরে একটি সুবৃহৎ বদ্বীপ আকারে বাংলাদেশের অবস্থান। পৃথিবীর মানচিত্রে উত্তর গোলার্ধে ২০°৩৪" থেকে ২৬°৩৮" উত্তর অক্ষাংশে এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৮৮১ থেকে ৯২°৪১" এর মধ্যবর্তী স্থানে দেশটি অবস্থিত।

বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবংগ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য, মিজোরাম ও মায়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণাংশ জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। ২৩.৫° কর্কটক্রান্তিরেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে কল্পিত। প্রায় চারশো বছরের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী ঢাকা মহানগরী ৯০°২৬" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। দেশটির মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার প্রায় ৫৭০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২০১৫ সালে প্রায় ১৭ কোটি। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম দেশটি পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ ভূ-খণ্ড।

ইতিহাসের আলোকে বর্তমান বাংলাদেশ

'রাষ্ট্র কখনো সাগরের বুকে একটি দ্বীপের মতো হঠাৎ জেগে ওঠে না।' রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার ও একটি গুরুত্ব থাকে, থাকে তার একটি অতীত ঐতিহ্য। বর্তমান জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম হলো পূর্বপুরুষদের সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা। সেই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ভিত্তিভূমিতে প্রোথিত হয় বর্তমান স্বাধীনতার শিকড়। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রসত্তা ও জাতিসত্তার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটেছে এ পাললিক জনপদের মানুষদের নিরন্তর সংগ্রাম ও অব্যাহত সাধনার মাধ্যমে। এই সংগ্রামের রয়েছে এক বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা ও অসামান্য বহমানতা। সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরব পতাকা হাতে এই ভাটি অঞ্চলের সাহসী ও পরিশ্রমী অধিবাসীরা শতাব্দীর পরে শতাব্দী লড়াই করেছেন আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। তাদের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও মুক্তির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে এই জনপদ বিবেচিত হয়েছে উপমহাদেশের বিশাল মানচিত্রে আর্যপূর্ব সুসভ্য মানব গোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল রূপে। এ এলাকার জনগণের অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের সংগ্রামে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আলোচনায় বাংলাদেশ বলতে সেই রাষ্ট্রসত্তাকেই বুঝায় যা আজকের বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত। আজ যে জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের প্রধান জাতিসত্তা, তাদের পূর্ব পুরুষরা যেসব রাজ্যে বসতিস্থাপন

করেছিলেন সেসব রাজ্য নিয়েই আজকের বাংলাদেশ। এ বিচারে বঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, সমতট ও হরিকেল এসব জনপদই বর্তমান বাংলাদেশের প্রাচীন রূপ। পশ্চিমবংগ এর মধ্যে পড়ে না। প্রাচীন রাঢ় ভূমিও বর্তমান বাংলাদেশে পড়ে না। তার চাইতে বরং প্রাচীন কামরূপের অংশ হিসেবে আজকের সিলেট অথবা যে মধ্যযুগীয় আরাকানের অংশ আজকের চট্টগ্রাম, সে কামরূপ ও আরাকানই বাংলাদেশের ভৌগোলিক আওতায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[১]

বাংলাদেশে ইসলাম

বাংলায় সর্বপ্রথম কখন মুসলমানদের আগমন হয়েছিল তার সঠিক সময় নিরূপণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তবে প্রাচীন ভারতে বাহির্গত যেসব মুসলমান এসেছিল তাদের দুই ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। আবার কতিপয় অলি, দরবেশ, ফকীর শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন এবং এই মহান কাজে সারা জীবন অতিবাহিত করে এখানেই দেহত্যাগ করেন।

আর এক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দেশ জয়ের অভিযানে। তাদের বিজয়ের ফলে এ দেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। ৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন কাশিম আগমন করেন বিজয়ীর বেশে এবং এটা ছিল ইসলামের বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। তার এ বিজয় সিন্ধু পর্যন্তই সীমিত থাকেনি, বরং তা বিস্তার লাভ করেছিল পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত।

এয়োদশ শতাব্দীর উষালগ্নে ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীর আগমনে এদেশের সাধারণ মানুষ নতুন করে চেতনা পেল। প্রখ্যাত গবেষক লেখক সুকুমার সেন তাঁর একটি লেখায় স্বীকার করেছেন যে, "অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুরা বখতিয়ারের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকি কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণও বৃদ্ধরাজা লক্ষণ সেনকে দেশত্যাগ করতে সহায়তা করেছিল। মানুষে মানুষে বিভাজন মুসলিম শাসনে আর রইলোনা। মুসলমানেরা একটি নতুন জীবন বিধান

---

[১] এ ব্যাপারে অধিক জানার জন্য নিম্নোক্ত বই সমূহ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

১. মাহবুবুর রহমান- মুসলিম বাংলার অভ্যুদয় প্রকাশনা, ১৯৮৮

২. ড. মোহর আলী- হিষ্টরী অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশনা ২০০৩

ও ধর্ম বিশ্বাসকে নিয়ে এলেন, এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং বিস্ময়কর মানবিক চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটালেন, সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও ভ্রাতৃত্ব দিয়ে।"

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, শাসকের কারণে অথবা তরবারীর জোরে এতদ-অঞ্চলের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষের মতো মান-ইজ্জত নিয়ে বাঁচার তাকিদে তারা মুসলমান হয়। এ কারণেই এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এতবেশী ধর্মপ্রাণ ও ইসলাম পরায়ণ।

বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের সময় মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলায় তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু এসবের অনেক পূর্বেই যে এদেশে ইসলামের বীজ বপন করা হয়েছিল সে বীজ অংকুরিত হয়ে পরবর্তী কালে তা যে একটি মহীরূহের আকার ধারণ করেছিল তাও এক ধ্রুব সত্য।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে হযরত মুহম্মদ (সা.) আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তীর পর সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বীন ইসলামের প্রচার কার্য্য শুরু করেন। তার এ প্রচারের ঢেউ আরব বনিকদের মাধ্যমে মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট এমনকি সুদূর চীন দেশেও পৌঁছে ছিল। এছাড়া প্রাক ইসলামী যুগেই মালাবার, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি স্থানে আরবদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এ সব কিছুই ইতিহাস অনুসন্ধান করে বের করার একটি বিষয়। তাই এর সঠিক সময়কালটা নিরূপন করা ইতহাস অনুসন্ধিৎসু প্রতিটি ছাত্রের জন্যই একান্ত বাঞ্চনীয়।

আমরা সে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ইতিহাস এখানে উল্লেখ না করলেও এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীভাত হয়ে উঠে যে, ৭ম শতাব্দী থেকেই বাংলার মাটিতে মুসলমানদের পদচারনা ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আওয়ামী লীগ সরকার মুসলিম লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে জামায়াতে ইসলামীসহ উল্লেখিত রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা বন্দ হয়ে যায়। উল্লেখ্য বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌমভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকেই জামায়াতে ইসলামী এবং তার সমস্ত জনশক্তি মনে প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নেন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। আন্তরিকভাবে তারা নিজ মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশের কল্যাণের জন্য কাজ করা শুরু করেন। ১৯৭২ সালের ৬ই জুন থেকে তারা ব্যক্তি গঠন এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। একই সাথে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেও জামায়াতের তৎপরতা শুরু হয় এবং শুধু তিন দফা দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখে।

১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে বাকশাল গঠন করলে এদেশে সকল দলের রাজনৈতিক তৎপরতা বে-আইনী ঘোষিত হয়। ১৯৭৬ সনের ৩রা মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জারিকৃত একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নাম্বার অনুচ্ছেদটি বাতিল করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সনের ৩০ মে গণভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো অনুমোদিত হওয়ায় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের পথ সুগম হয় এবং ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

১৯৭৮ সালে ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির ফরমান বলে এক দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। ফলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালের ৬ জুলাই স্বনামে পুনর্গঠিত হবার লক্ষ্যে সরকারি অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। উল্লেখ্য- তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য একটি বিধি জারী করেন। মূলত ঐ বিধির অধীনে অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন করা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে জামায়াতের সিনিয়র নেতা

জনাব আব্বাস আলী খানকে আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের মে মাসের ২৫,২৬ ও ২৭ তারিখে ঢাকাস্থ হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী এক কনভেনশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উক্ত কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক করা হয় সিনিয়র নেতা জনাব শামছুর রহমানকে এবং জামায়াতের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক করা হয় অধ্যাপক সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীকে।

১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ মে হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে উক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে প্রায় ১,০০০ (এক হাজার) প্রতিনিধি উক্ত কনভেনশনে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪৪৮ জন ছিলেন রুকন (সদস্য) যার মধ্যে ১১ জন ছিলেন মহিলা। সর্বসম্মতিক্রমে জামায়াতে ইসলামীর স্বনামে আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনসহ সম্মেলনের সকল অধিবেশনেই জনাব আব্বাস আলী খান সভাপতিত্ব করেন। জামায়াতের সবচেয়ে বর্ষিয়ান নেতা জনাব শামসুর রহমান সম্মেলন পরিচালনা করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন অন্য দুই সিনিয়র নেতা মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও জনাব আবদুল খালেক। অধ্যাপক গোলাম আযম নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে সম্মেলনের কার্যাবলীতে অংশ নিতে পারেননি। তিনি শুধু সমাপনী অধিবেশনে 'বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের কর্মনীতি কার্যসূচী' শিরোনামে যে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন উহাই পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী' নামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য ১৯৭৯ সালের আভ্যন্তরীন সাংগঠনিক নির্বাচনে অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় আমীর নির্বাচিত হন এবং ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন জনাব আব্বাস আলী খান।

এ সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের নিকট প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এই সম্মেলনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হয় ইসলামী আন্দোলন তথা জামায়াতে ইসলামীর ৩ দফা দাওয়াত ও ৪ দফা স্থায়ী কর্মসূচি। যা নিম্নরূপ :

জামায়াতের দাওয়াত নিম্নরূপ হইবেঃ

১। সাধারণভাবে সকল মানুষ ও বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করিবার আহ্বান।

২। ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের প্রতি বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের গরমিল পরিহার করিয়া খাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হওয়ার আহ্বান।

৩। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাহেলিয়াতের যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও শাসন কায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ ও অবিচারের অবসান ঘটানোর আহ্বান।

জামায়াতের স্থায়ী কর্মসূচি নিম্নরূপ হইবেঃ

১। সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

২। ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আগ্রহী সৎ ব্যক্তিদিগকে সংগঠিত করা এবং তাহাদিগকে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরূপে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দান করা।

৩। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।

৪। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাঞ্ছিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

একটা পূর্ণাঙ্গ দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ২৯ মে ১৯৭৯ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত প্রাণপ্রিয় সংগঠনকে আবার তিনদফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচির মাধ্যমে উজ্জীবিত করার জন্য কর্মীদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

হোটেল ইডেন প্রাঙ্গনে সদস্য (রুকন) সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণ

হোটেল ইডেন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে অধ্যাপক গোলাম আযম অংশ নিতে পারেননি। তাই সে সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি লিখিত ভাষণ পড়ে শুনানো হয়। এই ভাষণে তিনি বলেন-

আল্লাহ পাকই সমস্ত পৃথিবীর স্রষ্টা। আমরা তাঁর দাসত্ব কবুল করে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি। মুসলিমের দৃষ্টিতে আল্লাহর গোটা

দুনিয়াই তাঁর বাসভূমি। কিন্তু আমাদের মহান স্রষ্টা যে দেশে আমাদেরকে পয়দা করলেন, সে দেশের সাথে স্বাভাবিক কারণেই আমরা বিশেষ ধরনের এক গভীর সম্পর্ক অনুভব করি। কারণ আমরা ইচ্ছে করে এ দেশে পয়দা হইনি। আমাদের দয়াময় প্রভু নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এদেশে পয়দা করেছেন। তাই আমাদের স্রষ্টা আমাদেরকে এদেশে পয়দা করাই যখন পছন্দ করেছেন, তখন এদেশের প্রতি আমাদের মহব্বত অন্য সব দেশ থেকে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয়সহ প্রায় দশ কোটি লোক বাস করে। বাংলাদেশী হিসেবে সবার সাথেই আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় আমরা সমান অংশীদার। ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী আমাদের ভাই-বোন। সবার কল্যাণের সাথেই আমাদের মঙ্গল জড়িত। এদেশে আমরা যে আদর্শ কায়েম করতে চাই এর আহ্বান সবার নিকটই পৌছাতে হবে। আমাদের সবারই স্রষ্টা আল্লাহ। তাঁর দেয়া আদর্শ অমুসলিমদের মধ্যে পৌছানো আমাদেরই কর্তব্য। আল্লাহর সৃষ্ট সূর্য, চন্দ্র, আলো, বাতাস ইত্যাদি আমরা যেমন সমভাবে ভোগ করছি, আল্লাহর দীনের মহা নিয়ামতও আমাদের সবার প্রাপ্য। বংশগতভাবে মুসলিম হবার দাবিদার হওয়ার দরুন আল্লাহর দীনকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পদ মনে করা উচিত নয়। অমুসলিম ভাইদেরও যে তাদের স্বার্থেই দীন ইসলামকে জানা প্রয়োজন এবং গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করা কর্তব্য সে বিষয়ে আমাদের দেশীয় ভাই হিসেবে তাদেরকে মহব্বতের সাথে একথা বুঝানো আমাদের বিরাট দায়িত্ব ও দীনী কর্তব্য।

বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন, তাদের সবাইকে আমরা একারণেই শ্রদ্ধা করি যে, তারাও দেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন, দেশকে উন্নত করতে চান, দেশের সমস্যাগুলোর সমাধানে আগ্রহী এবং জনগণের কল্যাণকামী। তারা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নন, গোটা দেশের ভালমন্দ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এ ধরনের লোকদের সঠিক প্রচেষ্টায়ই একটি দেশ সত্যিকার উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা দেশ গড়ার চিন্তাই করে না, যারা কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, তারা দেশের সম্পদ নয়, তারা দেশের আপদ। যারা শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনীতি করেন, তারা দেশের কলঙ্ক। আর যারা দৈহিক শক্তি বা অস্ত্রশক্তির বলে জনগণের উপর শাসক সেজে বসতে চায়, তারা দেশের ডাকাত।

সব রকম রাজনৈতিক দলের প্রতি সম্মানবোধ সত্ত্বেও সবার সাথে আমাদের সমান সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন মানদণ্ডে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

১। যেসব দল ইসলামকে দলীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকার করে।

২। যেসব দল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী।

৩। যেসব দল সমাজতন্ত্রের আদর্শে দেশ গড়তে চায়।

আমরা যেহেতু ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, সেহেতু প্রথম শ্রেণিভুক্ত দলগুলোর সাথে আমাদের আদর্শিক সম্পর্কের দরুন তাদের সঙ্গে আমাদের নিম্নরূপ সম্বন্ধ বজায় রাখতে হবে ঃ

ক. ইসলামবিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে তাদের কারো উপর হামলা হলে আমরা ন্যায়ের খাতিরে তাদের পক্ষে থাকব ও হামলা প্রতিহত করতে সাহায্য করব।

খ. ইসলামী দল হিসেবে যারা পরিচয় দেন, তাদের সাথে দীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করব। এ সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই তাদেরকে দীনি ভাই হিসেবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব।

গ. ইসলামী দলের নেতা ও কর্মীদের জন্য যেসব বিশেষ গুণ অপরিহার্য, সে বিষয়ে কোন দলের মধ্যে কোন কমতি বা ত্রুটি দেখা গেলে মহব্বতের সাথে সে বিষয়ে তাদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরিয়ে দেব। অনুরূপভাবে আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে তা কবুল করব।

ঘ. কোন সময় যদি কোন ইসলামপন্থী দল আমাদের বিরোধিতা করে, তবুও আমরা তাদের বিরোধিতা করব না। প্রয়োজন হলে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় জওয়াব দেব।

ঙ. নির্বাচনের সময় তাদের সাথে দরকার হলে সমঝোতা করব।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বরে উল্লেখিত দলগুলোর সাথে আমরা নিম্নরূপ সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করব :

ক. যেসব রাজনৈতিক দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে জীবনাদর্শ মনে করে না, তাদের সাথেও আমরা কোন প্রকার শত্রুতার মনোভাব পোষণ করব না। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মত ও পথ বাছাই করার স্বাধীনতা সবারই থাকা উচিত। আমরা তাদের মত ও পথকে ভুল মনে করলে যুক্তির মাধ্যমে শালীন ভাষায় অবশ্যই সমালোচনা করব।

খ. তাদের কেউ আমাদের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ করলেও আমরা আমাদের শালীনতার মান বজায় রেখেই জওয়াব দেব। গালির জওয়াবে আমরা কখনও গালি দেব না বা অন্যায় দোষারোপের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা ন্যায়ের সীমালংঘন করব না।

গ. দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণে তাদের যেসব কাজকে আমরা মঙ্গলজনক মনে কবর, সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহযোগিতা করব।

যারা রাজনীতি করেন, তাদের উপরেই দেশের ভাল-মন্দ প্রধানত নির্ভরশীল। ভ্রান্ত রাজনীতি গোটা দেশকে বিপন্ন করতে পারে। ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের দুর্গতির কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে প্রতিযোগিতার এ দুনিয়ায় বাঞ্ছিত উন্নতির দিকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকলে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষেই নিম্নের নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য ঃ

১। সকল রাজনৈতিক দলকেই নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে জনগণই খিলাফাতের (রাজনৈতিক ক্ষমতার) অধিকারী ও সরকারি ক্ষমতার উৎস।

২। গণতন্ত্রের এই প্রথম কথাকে স্বীকার করার প্রমাণ স্বরূপ নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা হাসিলের চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩। বাংলাদেশের সম্মান রক্ষা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে এবং এর বিপরীত আচরণ সতর্কতার সাথে বর্জন করতে হবে। অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশকে সহজেই দুনিয়ায় নিন্দনীয় বানায়। তাই দেশের সম্মান রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সরকারি দলের।

৪। অভদ্র ভাষায় সমালোচনা করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করা এবং দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করাকে রাজনৈতিক গুন্ডামি ও লুটতরাজ মনে করে ঘৃণা করতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থে লুটতরাজ ও গুণ্ডামি করাকে সবাই অন্যায় মনে করে। কিন্তু এক শ্রেণির ভ্রান্ত মতবাদ রাজনৈতিক ময়দানে এসব জঘন্য কাজকেই বলিষ্ঠ নীতি হিসেবে ঘোষণা করে। এ ধরনের কার্যকলাপের প্রশ্রয়দাতাদেরকে গণতন্ত্রের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

৫। সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা দলকে স্বাধীনতার শত্রু, দেশদ্রোহী, বিদেশের দালাল, দেশের দুশমন ইত্যাদি গালি দেয়াকে রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। সবাই যদি আমরা একে অপরকে এ গালি দিতে থাকি, তাহলে দুনিয়াবাসীকে এ ধারণাই দেয়া হবে যে, এ দেশের সবাই কারো না কারো দালাল, এমন দেশের কোন মর্যাদাই দুনিয়ায় স্বীকৃত হতে পারে না।"

সম্মেলনে একটি নতুন গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সেই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনের ২৭ মে থেকে চারদফা পূর্ণাংগ কর্মসূচি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্মতৎপরতা শুরু করে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ১৯৭৯-১৯৮১ কার্যকালের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

*** অধ্যাপক গোলাম আযম- আমীরে জামায়াত**

১। জনাব আব্বাস আলী খান-- নায়েবে আমীর ও ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত
২। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ- নায়েবে আমীর
৩। জনাব শামসুর রহমান- সেক্রেটারি জেনারেল
৪। জনাব মকবুল আহমাদ- সাংগঠনিক সেক্রেটারি
৫। মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী
৬। মাষ্টার সফিক উল্লাহ এম.পি
৭। জনাব বদরে আলম
৮। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
৯। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
১০। মাওলানা আব্দুল জব্বার
১১। অধ্যাপক এ. কে. এম নাজির আহমদ

উল্লেখ্য আমীরে জামায়াত, নায়েবে আমীর এবং সেক্রেটারি জেনারেলসহ প্রত্যেক কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা হয় এবং এক একটি কমিটিকে পৃথক পৃথক বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা

* অধ্যাপক গোলাম আযম, আমীরে জামায়াত

১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
৩। জনাব শামসুর রহমান
৪। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
৫। জনাব মকবুল আহমাদ
৬। অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী
৭। মাওলানা আবদুল জব্বার
৮। জনাব বদরে আলম
৯। জনাব এ. কে. এম. নাজির আহমদ
১০। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
১১। মাওলানা সরদার আবদুস সালাম
১২। অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দিন
১৩। জনাব মুহাম্মদ আবদুল গাফফার
১৪। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
১৫। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
১৬। ডাক্তার ইছাহাক আলী খান - দিনাজপুর
১৭। অধ্যক্ষ শাহ মোহাম্মদ রুহুল ইসলাম- রংপুর
১৮। মাওলানা আবদুল গফুর - গাইবান্ধা
১৯। মাওলানা আবদুর রহমান ফকির- বগুড়া
২০। মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ- রাজশাহী জেলা
২১। এডভোকেট আশরাফুজ্জামান চৌধুরী - রাজশাহী শহর
২২। অধ্যাপক আবদুল খালেক- ঢাকা
২৩। ডাক্তার আনিছুর রহমান- কুষ্টিয়া
২৪। জনাব মোজাম্মেল হক এম.পি. - যশোর
২৫। মাষ্টার আবদুল ওয়াহেদ- যশোর
২৬। মাওলানা আবদুস সাত্তার- খুলনা শহর
২৭। কাজী শামসুর রহমান- খুলনা জেলা
২৮। মাওলানা আশরাফ আলী খান- পটুয়াখালী

২৯। এডভোকেট আবদুল হামিদ- ভোলা
৩০। মাওলানা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন- বরিশাল
৩১। অধ্যাপক মাওলানা আবদুল হামিদ- টাঙ্গাইল
৩২। জনাব ইসমাঈল হুসাইন- জামালপুর
৩৩। মাওলানা আবদুস সাত্তার- মোমেনশাহী
৩৪। জনাব ফজলুল করিম- নেত্রেকোণা
৩৫। ডাক্তার আজিজুল হক- কিশোরগঞ্জ
৩৬। হাফেজ মোহাম্মদ ইসহাক- ফরিদপুর
৩৭। অধ্যাপক ফজলুর রহমান- সিলেট
৩৮। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান- কুমিল্লা
৩৯। মাওলানা রফি উদ্দিন আহমদ- নোয়াখালী
৪০। মাওলানা শামছুদ্দিন- চট্টগ্রাম শহর
৪১। মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী- চট্টগ্রাম জেলা
৪২। এডভোকেট সালামত উল্লাহ- কক্সবাজার
৪৩। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসিম- পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯৭৯ সালের জেলা আমীরগণের নাম

জেলা আমীরগণ জেলাতে আমীরে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা সংগঠন পরিচালনা ও নিয়ম শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের যারা জেলা আমীর ছিলেন তারা হলেন-

১। ডাক্তার ইছাহাক আলী খান - দিনাজপুর
২। মাওলানা আবদুল গফুর- রংপুর
৩। মাওলানা আবদুর রহমান ফকির- বগুড়া
৪। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম- রাজশাহী শহর
৫। মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ- রাজশাহী জেলা
৬। অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন- পাবনা
৭। ডাঃ আনিসুর রহমান- কুষ্টিয়া
৮। জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম- যশোর
৯। মাওলানা হাবিবুর রহমান- খুলনা শহর
১০। কাজী শামছুর রহমান- খুলনা জেলা
১১। মাওলানা আশরাফ আলী খান- পটুয়াখালী

১২। অধ্যাপক মুনীরুজ্জামান ফরিদী- বরিশাল
১৩। অধ্যাপক শরীফ হুসাইন- টাঙ্গাইল
১৪। মাওলানা আবদুল জব্বার- মোমেনশাহী
১৫। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী- ঢাকা শহর
১৬। অধ্যাপক আবদুল খালেক- ঢাকা জেলা
১৭। জনাব শাহ মোহাম্মদ জাকারিয়া- ফরিদপুর
১৮। জনাব শামছুল হক- সিলেট
১৯। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান- কুমিল্লা
২০। জনাব মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার- নোয়াখালী
২১। জনাব মাওলানা মমিনুল হক চৌধুরী- চট্টগ্রাম জেলা
২২। মাওলানা শামছুদ্দীন- চট্টগ্রাম শহর

একটি সাংগঠনিক সমস্যা ও তার প্রতিকার

১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ময়দানে অবতীর্ণ হবার পর আই.ডি.এল নামে আর কোন রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন অবশিষ্ট রইলনা। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পি.ডি.পি, ইসলামিক পার্টি, ইমারত পার্টি ও বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি এই সাত দলের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশ ইসলামীক ডেমোক্রেটিক লীগ (আই,ডি,এল)। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আই,ডি,এল ০৬ (ছয়) টি আসন লাভ করে এবং উক্ত ০৬ জনই জামায়াত ইসলামীর নেতা ছিলেন। আই,ডি,এল এর নামে এমপি নির্বাচিত হবার কারণে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত আই,ডি,এল নামটার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই পরবর্তী নির্বাচন জামায়াতে ইসলামীর নামেই করা হবে এবং তখন আই,ডি,এল বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
কিন্তু প্রবীন রুকন ও সিনিয়র জামায়াত নেতা এবং তখনকার আই.ডি.এল চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম এ সিদ্ধান্তে একমত হতে পারলেননা। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে এ সংকট নিরসনের জন্য তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা বিস্তারিত আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীমসহ কয়েকজন সিনিয়র নেতা

আই.ডি.এলেই থেকে যান। তাদের কেউ কেউ আবার পরবর্তীতে জামায়াতে ফিরে আসেন। অবশ্য মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম আই.ডি.এলেই থেকে যান। একসময়ে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম আই.ডি.এল ছেড়ে দিয়ে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন নামে একটি সংগঠনের সভাপতি হিসেবে আমৃত্যু ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

জনাব আবদুল খালেক সাহেবের ইন্তেকাল

জামায়াত পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর জামায়াতে ইসলামীর একজন সিনিয়র এবং প্রথম সারির নেতা জনাব আব্দুল খালেক ১৯৭৯ সালেই ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন)। একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ নেতাকে হারিয়ে সকলের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জনাব আবদুল খালেক ১৯২১ সালে কুমিল্লা জেলার কসবা থানার দেবগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খুব ধর্মভীরু মানুষ। নিজ বাড়ীতে আরবী পড়ার মধ্য দিয়ে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। অতপর কিছুদিন হিফজখানায় পড়াশুনা করার পর তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি ১৯৫২ সালে মাওলানা মওদূদী (র.) এর রচনাবলীর সাথে পরিচিত হন। মনোযোগ সহকারে মাওলানার সাহিত্য অধ্যয়ন করে জনাব আবদুল খালেক ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং ১৯৫২ সালের শেষের দিকে তিনি জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক হিসাবে কাজ শুরু করেন।

জনাব আবদুল খালেক ছিদ্দিক বাজারে সর্বপ্রথম বাঙালীদের নিয়ে একটি ইউনিট কায়েম করেন। তারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। মাত্র এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে তিনি জামায়াতের রুকন হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি গাইবান্ধা জামায়াতের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন এবং জনগণের খুব কাছাকাছি গিয়ে "দায়ী ইলাল্লাহ" হিসাবে ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

জনাব আবদুল খালেক কোন মাদরাসাতে না পড়েও কুরআন এবং হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মূলত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) এর তাফসীর তাফহীমুল কুরআন এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তিনি একজন বিশিষ্ট্য ইসলামী চিন্তাবিদে উন্নীত হতে

পেরেছিলেন। তিনি অত্যন্ত যৌক্তিক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় দারসুল কুরআন পেশ করতেন। তাঁর দারসুল কুরআন ক্লাসে অনেক উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও সম্মোহিত হতো।

জনাব আবদুল খালেক ১৯৫৭ সালে জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক ও যোগ্য সংগঠক। কঠোর শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি করে তাকে ঢাকায় আনা হয় এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম লিখেছেন, "ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক শিক্ষা আমি তাঁর কাছে পাই এবং তাঁর দারসে কুরআন আমাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে।"

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তিনি একবার জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। এছাড়াও পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কেন্দ্রীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অধ্যাপক গোলাম আযমের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে সমস্যা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব স্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে প্রকাশ্য ময়দানে আমীরের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। জামায়াতের জন্য এটা বিরাট একটা সমস্যা ছিল। তিনি জামায়াতের জনসভার প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতে পারতেন না।

এ পরিস্থিতিতে জামায়াত নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য যে, যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাদের মধ্যে এডভোকেট হামিদুল হক চৌধুরী সহ অন্যেরা যেখানে একবার আবেদন করেই নাগরিকত্ব ফিরে পান, সেখানে অধ্যাপক গোলাম আযম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর জন্মগত অধিকার নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এতে দেশবাসীর কাছে প্রমাণ হয়ে যায় যে জামায়াতের অগ্রগতি রোধ করার জন্য তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে সরকারের তরফ থেকে টালবাহানা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনগণের রাষ্ট্রীয় পরিচয়– জাতীয়তা

জাতীয়তার মাধ্যমে মানুষের পরিচয় হয়। পরিচয়ের প্রয়োজনেই মানুষ যে রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করে সে রাষ্ট্রের নামেই তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় হয়। এ পরিচয়কে ইংরেজীতে Nationality বাংলায় জাতীয়তা বলা হয়ে থাকে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে এদেশবাসীর পরিচয় ছিল ভারতীয় এবং পাসপোর্টে Indian এবং ১৯৪৭ এর পরে পাকিস্তান আমলে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছিল Pakistani। পাকিস্তান থেকে এদেশ যখন বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন দেশের নামের সাথে মিল রেখে পাসপোর্টে Bangladeshi (বাংলাদেশী) লেখাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামীলীগ বাঙ্গালী জাতীয়তায় বিশ্বাসী বলে তারা দেশের নাম বদলে ভাষার ভিত্তিতে দেশ বাসীকে বাঙ্গালী জাতি গণ্য বলে পাসপোর্টে Bangalee লেখার ব্যবস্থা করল। অথচ বিশ্বের কোন দেশেই ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পরিচয় দেয়া হয় না। বহু দেশের প্রধান ভাষা ইংরেজি কিংবা আরবি কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ভাষার ভিত্তিতে নয়, রাষ্ট্রের নামের ভিত্তিতেই যেমন সৌদী, জাপানী ইত্যাদি।

ভাষার পরিচয়ে আমরা অবশ্যই বাঙ্গালী, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী। বিশ্বের সকল বাংলা ভাষীকে বাঙ্গালী জাতি বলায় কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলাদেশে বসবাসরত অবস্থায় সবাই বাংলাদেশী। এখানকার বাংলা ভাষীদেরকে পৃথকভাবে বাঙ্গালী জাতির বলা অর্থহীন ও ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে। এ প্রসংগে নানাজনের নানা কথা থাকলেও একটা মতামত উল্লেখ করা হলো- স্বাধীনতার পরপর কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সন্তোষ কুমার ঘোষ কয়েক দফা বাংলাদেশ ঘুরে গিয়ে তার পত্রিকায় স্বনামে এক সম্পাদকীয়তে লেখেন, "এখন বাংলাদেশ হয়েছে, বাংলাদেশের লোকেরা নিজেরা বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু কেবল তারাই তো বাঙ্গালী নয়, পশ্চিম বংগের লোকেরাও বাঙ্গালী, তারা পূর্ব বঙ্গের লোকদেরই বাঙ্গালী পরিচয়ের একচ্ছত্র অধিকার ছেড়ে দিতে পারে না"।

বাংলাদেশী জাতীয়তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

যতদুর জানা যায়, ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশের অধিবাসীদের পাসপোর্টসহ অন্যান্য স্থানে জাতীয়তাবাদ কলামে বাঙ্গালীর বদলে বাংলাদেশী লেখা হচ্ছে। এ পরিবর্তনের সূচনা কিভাবে হলো, এতে কাদের অবদান রয়েছে জানার কৌতূহল যে কোন বাংলাদেশীর থাকা স্বাভাবিক, এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ পরিবেশিত তথ্যটি উল্লেখযোগ্য- তমদ্দুন মজলিশের সেক্রেটারি, খ্যাতনামা ভাষা সৈনিক ও দৈনিক ইনকিলাবের ফিচার এডিটর অধ্যাপক আবদুল গফুর থেকে প্রকাশ: প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে বঙ্গভবনে একদল বুদ্দিজীবী ও লেখকদের সমাবেশ করেন, বাংলাদেশর জনগণের জাতীয়তার পরিচয় কী সে বিষয় সেখানে ব্যাপক মত বিনিময় হয়। উক্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে দৈনিক ইত্তেফাকের উপদেষ্টা সম্পাদক জনাব আখতারুল আলম, প্রখ্যাত কলামিষ্ট খন্দকার আবদুল হামিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খন্দকার সাহেবের বিশেষ অনুরোধে জনাব আখতার উল আলম সর্ব জনাব আবুল মনসুর আহমেদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজিবুর রহমান খাঁন প্রমুখ চিন্তাবিদদের প্রণীত অনুষ্ঠানে ৮/১০টি পুস্তক সংগ্রহ করে দিলে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা পূর্বক ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতে এক সুধী সমাবেশে পড়ে শুনান। উক্ত সমাবেশের প্রধান অতিথি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত উক্ত রচনাটি মনোযোগ দিয়ে শোনেনে। অত:পর ১৯৭৭ সালের ১০ অক্টোবর জিয়াউর রহমান

বাঙালী জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রচলনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

সকল জাতীয়তাবাদের মতো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদও ইতিহাসের ফসল। শুধু তাই নয়, এই জাতীয়তাবাদের পিছনে কাজ করেছে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। সর্বোপরি এই জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পিছনে আগাগোড়া সক্রিয় ছিল এদেশের জনগণের আশা ও আকাংখা। বস্তুত: বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ইতিহাস হলো একটি জাতির নিজ ভাগ্য গড়ার সুতীব্র আর্তি ও আকাংখার গৌরবময় কাহিনী।

মাওলানা মওদূদীর ইন্তেকাল ও জানাজা

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ বিশ্বব্যাপী ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের কর্ণধার, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বাফেলো শহরের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মাওলানা সারাজীবন দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য শারীরিক ও মানসিক কঠোর পরিশ্রম করেন, যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য অকালেই ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মূত্রাশয়ের পীড়ায় ভোগেন, তার ফলে হাঁটু ও কোমরের বেদনা, বলতে গেলে চিরস্থায়ী হয়ে পড়েছিল। ১৯৬৮ সালে লন্ডনে মূত্রাশয় অপারেশন করা হয়, কিন্তু রোগ নিরাময় হয়নি। আজীবন রোগ যন্ত্রনার ভেতরই তিনি সব কাজ আঞ্জাম দিলেও আল্লাহর এ প্রিয়বান্দার চোখে মুখে কোনদিনই রোগ যন্ত্রনা কিংবা শোক দু:খের কোন বহি:প্রকাশ দেখা যায়নি।

১৯৭৯ সালের ২০ মে থেকে মাওলানার অন্তিম সফরের জীবন সংঙ্গীনী বেগম সাইয়েদ মওদূদীর ইচ্ছে মোতাবেক তিনিই শেষ গোসল দিলেন, তাঁর পুত্র ডা. আহমদ ফারুক ও জামাতা মাসুদ আহমেদ এ ব্যাপারে তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন।

বিশ্ব বরেন্য আলেমকুল শিরমনি আল উস্তাজ, আল মুরশিদুল আম আল্লামা মওদূদীর জানাজা হলো বাফেলোতে, লন্ডনে, করাচী ও লাহোরে। আমেরিকা থেকে শেষ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই কয়েকবার জানাযা পড়ানো হয়। প্রথমবার নামাজে জানাজার ইমামতি করেন মাওলানা শরীফ বোখারী, দ্বিতীয় টরেন্টো শহরের একজন খ্যাতনামা ক্বারী সাহেব এবং শেষে পাকিস্তানের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আসরাব আহমদ। মরহুমের ইন্তেকালের খবর লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে সেখানে তৌহিদী জনতার এমনি

সমাবেশ ঘটে যে বিমান পোর্টের টার্মিনাল ভবনে বেশ কয়েকবার নামাজ-ই-জানাজার আয়োজন করতে হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ প্রকৌশলী খুররম যাহ মুরাদ ও প্রফেসর খুরশিদ আহমদ যথাক্রমে প্রথম দুবার ইমামতি করেন।

২৫ সেপ্টেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত নামাজে জানাজার ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের তৎকালীন আমীর মাওলানার ঘনিষ্টতম সহকর্মী মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ। ২৫ সেপ্টেম্বরই তার লাশ লাহোর পৌছে। এখানে উল্লেখ্য, মদীনার জান্নাতুল বাকীতে প্রিয় নবীর সাহাবীদের সাথে মরহুম মাওলানার দাফন করার একটা পরিকল্পনা ছিল। সেই মর্মে সৌদী কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে যমীন তাঁর পূন্যস্মৃতিসমূহে অধিকতর সমুজ্জল, সেই লাহোরের মাটিতেই তাঁকে দাফনের ব্যবস্থা করা হলো।[২]

পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ উন্মুক্ত ময়দান লাহোরের গাদ্দাফী স্টেডিয়ামে মরহুমের সর্বশেষ জানাজায় ২৬ সেপ্টেম্বর দেশ বিদেশের লাখ লাখ মুসলমান শরীক হন। এই সময় নাগরিকত্ব সমস্যার দরুন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম উক্ত জানাজায় শরীক হতে অসমর্থ থাকায় ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খাঁন বাংলাদেশ জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন। মরহুম খাঁন সাহেবের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফরসংগী হন ডা. চৌধূরী মুহাম্মদ আজিজুল হক। উল্লেখ্য, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেব ছিলেন তখন ঢাকা মহানগরীর আমীর। সেক্রেটারি ছিলেন মাওলানা সরদার আবদুস সালাম।
৭৬ বছরের নশ্বর জীবন শেষে মাওলানা মরহুমের পারোলৌকিক সফরের আখেরী জানাজার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে প্রবীন জামায়াত নেতা এবং বাংলাভাষায় মাওলানার প্রথম জীবনীকার জনাব আব্বাস আলী খাঁনের অভিব্যক্তির অংশবিশেষ পেশ করা হল-
"পঁচিশে সেপ্টেম্বর করাচীতে জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে রাত কাটালাম। রাত সাড়ে ৯ টায় মাওলানার জানাজাসহ তাঁর জীবনের উপরে কিছু ফিচার দেখানো হলো পাকিস্তান টেলিভিশনে। প্রবল অশ্রুধারা টিভি দেখতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিলো"।

জানাজার সামনের কাতারে যে সব বিদেশী মেহমান ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সৌদী রাষ্ট্রদূত রিয়াদ আল খতীব, জর্দান রাষ্ট্রদূত, আয়াতুলাহ খুমেনীর বিশেষ প্রতিনিধি ও ইরান সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, বিশ্ব মুসলিম

---

[২] হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ 'যে স্মৃতি আজো অম্লান'।

যুবসংঘের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ড. মোহাম্মদ তুতুনজী, সিরিয়ার প্রখ্যাত পন্ডিত ও মনীষী শেখ সাঈদ হাওয়া ও শেখ আদনান সাদুদ্দীন, কুয়েত আওকাফ মন্ত্রণালয়ের ইসলাম সম্পর্কিত বিভাগের ডাইরেক্টর শেখ আবদুল্লাহ আল আকীলা, কুয়েতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও আইনবিদ শেখ মুবারক আল মুতাওয়া, মাওলানা মরহুমের বিশিষ্ট বন্ধু শেখ আবদুল আজীজ আল আলী আল মোতাওয়া, বিশিষ্ট মিসরী ইখওয়ান নেতা ড. কামাল, শহীদ হাসানুল বান্নার পুত্র শেখ সাইফুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী হিন্দের আমীর মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ, পাঞ্জাবের গভর্ণর জেনারেল লেঃ জেনারেল সারওয়ার খান, কেবলা শরীফের পীর সাহেব এবং সামরিক বাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক।

ইমামে কাবা শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন সাবিইয়িল লাহোরের ঐতিহাসিক জানাজায় ইমামতি করার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্যকারণ বশতঃ তাঁর বিলম্বের দরুন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ড. ইউসুফ কারযাভী।

ড. কারযাভীর নাতিদীর্ঘ অথচ স্বারগর্ভ ভাষনের পরে স্টেডিয়ামের ভিতরে দু'হাজার বিদেশী মেহমানসহ প্রায় দশ লক্ষ ও বাইরে অপেক্ষমান অযুত কণ্ঠে শ্লোগান ধ্বনিত হলো "সাইয়েদী মুরশীদি, মাওলানা মওদূদী ইত্যাদি। সে ধ্বনী প্রতিধ্বনিত হলো আকাশে বাতাসে, বৃক্ষরাজিতে, দালান কোঠায়, প্রতিটি দিকদিগন্তে, আনাচে-কানাচে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর মনসুরাতে মরহুম মাওলানার কফিন আসা মাত্রই জে. জিয়াউল হক মাওলানাকে দেখতে গিয়ে ছিলেন। মাওলানা মুখের কাপড় সরিয়ে চক্ষু দেখে কেঁদে উঠে জিয়াউল হক বললেন, "আজ পাকিস্তান সে নূর চলগিয়া"।

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি

১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করলে ঐ বছরই সারাদেশে সংগঠন চালু হয়ে যায়। মহান আল্লাহর রহমতে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জামায়াতের সর্বস্তরের কর্মীগণ ইসলামী দাওয়াত প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সংগঠন সম্প্রসারনে তৎপর হন।

১৯৮০ সালের শুরু থেকে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বহুমুখী তথা ব্যাপক কর্মসূচী পালনের উদ্দেশ্যে পার্শ্ব সংগঠন কিংবা সহযোগী সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চালু হয়। প্রায় ছ'মাস এ

সব সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চালুর পর ইসলামী বিপ্লবের একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়নের এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১৯৮০ সালের নভেম্বর মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কর্মপরিষদে ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি নামে একটি সার্থক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দফাগুলোর রূপরেখা কিংবা শিরোনাম নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে;

(২) ঈমানদার, সৎ ও যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে;

(৩) বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ করতে হবে;

(৪) আইনশৃংখলা পূর্ণরূপে বহাল করতে হবে;

(৫) সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

(৬) ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবে;

(৭) কুরআন-হাদীস মুতাবিক মহিলাদের পৃথক শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নৈতিক অধঃপতনের ষড়যন্ত্র রোধসহ যাবতীয় অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১৯৮১ সালের ৩০ জানুয়ারি রমনা গ্রীনে এক জনাকীর্ণ কর্মী সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খাঁন 'ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করেন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "উক্ত দফা সমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি" শিরোনামে যে কয়েক হাজার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে ৭ দফা দাবি কার কাছে ? এ প্রশ্নের নিম্নরূপ জবাব প্রদান করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এ দাবি সরকারের নিকটে, সরকার যদি এসব দাবি পূরণের চেষ্টা করেন, তাহলে জামায়াত তাদের সাথে সহযোগিতা করা ফরজ মনে করবে।

দ্বিতীয়তঃ এ দাবি জনগণের নিকট, আপনারা এসব দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে জামায়াতের সাথে আন্দোলনের জানমাল দিয়ে শরীক হোন।

তৃতীয়তঃ যারা বিভিন্নভাবে দ্বীনের খিদমত করছেন তাদেরকে আহবান জানাচ্ছে যে, এসব দাবি আদায়ের আন্দোলনে না গেলে ভবিষ্যতে দ্বীনের প্রচার তথা খিদমতের বর্তমান সুযোগও হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

চতুর্থতঃ যেহেতু অতীতের যে কোন আন্দোলনে, এদেশের ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাই ছাত্র সমাজকে এসব বিপ্লবী দাবির পতাকাবাহী হবার আহবান জানাচ্ছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠতঃ কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে আশ্বাস দেয়া হচ্ছে যে, ৭ দফা গণদাবির বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তাদের মৌলিক অধিকার সমূহ আদায় হবে ও বহাল থাকবে।

সপ্তমতঃ মহিলা সমাজ জনগণের অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। একমাত্র ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমেই তারা সঠিক ও শরীয়ত সম্মত মর্যাদা ফিরে পাবেন।

এভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সাধারণভাবে সকল দেশবাসীকে এবং বিশেষভাবে সকল ইসলামী মহলকে অত্র ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হবার উদাত্ত আহবান জানায়। ১৯৮০ সালেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দু'টো ইস্যুকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। একটা হলো অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার ও অপরটি হলো বাংলাদেশের উপযোগী রাজনৈতিক পদ্ধতি নির্দ্ধারণ।

ঐ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (১৯৭৭-৮১) শেখ মুজিবের স্বৈরতন্ত্র ও এক দলীয় শাসনের পরিবর্তে বহুদলীয় গনতন্ত্র চালু করলেও প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্রই কায়েম ছিল। ইতিহাসের আলোকে ঐ সময়কার শাসনকে বড়জোর জনকল্যাণকামী স্বৈরতন্ত্র (Benevolent despotism) হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। একই ব্যক্তি রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনী প্রধান (দলীয় প্রধান ও বটে) হবার ফলে তিনি জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রীসভাকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, এমন পরিবেশে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করতে পারে না। প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও তিনি জাতীয় সংসদের সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন না। জনগণের ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের সংসদ এক ব্যক্তির মর্জিতে পরিচালিত হলে তা গনতন্ত্রের যথার্থ দাবি পূরণ করে না।

১৯৮০ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাংলাদেশের তখনকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়। জামায়াত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের আস্থা অর্জন করে দেশকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে উন্নতি করতে চায়। কিন্তু দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম না হলে জনগণ তাদের লক্ষ্য হাসিল করতে পারবে না। তাই জামায়াত দেশবাসীর সামনে বাংলাদেশের উপযোগী একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি (Political system of Government) পেশ করার প্রয়োজন বোধ করে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সফল রুপকার

ও জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক জামায়াতের কর্মপরিষদে পেশকৃত ও গৃহীত পলিটিক্যাল সিস্টেমের রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ

১. বাংলাদেশের জন্য সংসদীয় পদ্ধতিই উপযোগী, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি নয়;
২. প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন, দেশ শাসনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকবেনা। তিনি সরকারকে উপদেশ দিতে পারবেন;
৩. জনগণের নির্বাচিত জাতীয় সংসদ দেশ শাসন করবে, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা প্রধান মন্ত্রী হিসেবে সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রী পরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থাকবে;
৪. বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানের মধ্যে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বা কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ তার মীমাংসা করবে;
৫. সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারগণকে নিয়োগ দান করবেন;
৬. প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হবেন, তাহলে প্রেসিডেন্টকে সরকারি দলের কৃপার পাত্র হয়ে থাকতে হবে না;
৭. নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার নির্বাচন পরিচালনা করবে।[৩]

প্রেসিডেন্ট জিয়ার অসতর্ক উচ্চারণ- জামায়াত-শিবিরকে নির্যাতন

জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ এর নভেম্বরে ক্ষমতাশীন হবার পর থেকেই ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়ের রাজনীতি শুরু করেন। ডান-বাম, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ রাজনীতিক তথা জনগণকে বিভক্ত করার পরিবর্তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক বক্তব্যে কোন দলের নাম নিয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য করতেন না। যখনই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরোধী মহলের বিরুদ্ধে বলতেন, তিনি শুধু 'বাকশাল' এর বিরুদ্ধেই সতর্ক থাকতে বলতেন।

---

[৩] অধ্যাপক গোলাম আযম প্রণীত "কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা" শীর্ষক পুস্তিকা।

স্বাধীনতা বিরোধী বলে কথিত মুসলিমলীগের বেশ কয়েকজন নেতাকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী হিসেবে এমন কি শাহ্ আজিজুর রহমানকে প্রধান মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদে বিএনপি পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট জিয়া সাহসিকতার পরিচয় দেন। এ ব্যাপারে তিনি কারো আপত্তির পরওয়া করেন নি।

জনগণের মধ্যে বিভেদের পরিবর্তে তিনি ঐক্যের রাজনীতি চালু করেন। কিন্তু হঠাৎ ১৯৮১ সালের ২৪ মার্চ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের মুখে 'রাজাকার' ধ্বনি উচ্চারিত হবার দরুন অনেকেই স্তম্ভিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। তাঁর মুখে ঐ অপ্রত্যাশিত ও অসতর্ক উচ্চারণ সারাদেশে জামায়াতের সমাবেশ ও মিছিলে হামলা হতে থাকে। উল্লেখ্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সম্মেলনের পর দু'মাসেরও বেশি সময় জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে সারা দেশে রীতিমতো অভিযান চলে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা

১৯৮১ সালের ২৯ মে দিবাগত শেষ রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর লাশ প্রথমত হত্যাকারীরাই ওখানকার এক পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করে। একদিন পর সরকারের উদ্যোগে লাশ তুলে ঢাকায় আনা হয়। মানিক মিয়া এ্যাভেনিউয়ে এক বিশাল জানাজা শেষে তাকে সংসদ ভবনের লেকের পাশে চন্দ্রিমা উদ্যানে দাফন করা হয়।

বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করার ব্যাপারে জেনারেল জিয়ার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের কারণে তিনি জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেখ মুজিব প্রবর্তিত এক দলীয় বাকশালের পরিবর্তে তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক আইনের আওতায় সংবিধানে অনেকগুলো সংশোধণী আনয়ন করেন। তিনি "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" সংবিধানের প্রারম্ভে যুক্ত করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি এ দলিল থেকে বাদ দেন। উল্লেখ্য- দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মানুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক এসব কাজ করার মাধ্যমে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

তিনি ভারতের আগ্রাসী নীতির মোকাবিলার জন্য চীনের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো এবং ওআইসিতে বাংলাদেশের সফল উপস্থিতির ব্যবস্থা করেন। অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আওয়ামী আমলের একনায়কতন্ত্রের স্থলে বহু দলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। জনগণের মধ্যে ঐক্য, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির সাথে উন্নয়ন ও

উৎপাদনের রাজনীতি চালু করেন। বহির্বিশ্বে বিশেষত; মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। ইতিহাসের পাতায় তিনি তার অবদানের জন্য নিঃসন্দেহে চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নির্মম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হলে প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যাকান্ডের ফলে যে রাজনৈতিক শুন্যতা সৃষ্টি হলো তা পূরণের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়লো। কোন পদ্ধতি বর্তমান না থাকায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে নির্বাচনে প্রার্থী করার প্রয়োজনে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে হলো। উল্লেখ্য, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপযোগী ৫ দফা রাজনৈতিক পদ্ধতি পেশ করেছিলো।

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পদে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, জামায়াত ইসলামী, বিএনপির প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে সমর্থন করে। বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনে ড. কামাল হোসেনের চেয়ে বিচারপতি আবদুস সাত্তার ৮৫ লাখ ২২ হাজার ৭১৭ ভোট বেশি পেয়েছিলেন।

প্রথমে ৩৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। ৮ জন প্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তারের পক্ষে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায় শেষ পর্যন্ত ৩১ জন প্রার্থীর নাম নির্বাচন কমিশনে অবশিষ্ট ছিলো। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন প্রার্থী হলেন:

(১) জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী- জাতীয় নাগরিক কমিটি ও জাতীয় পার্টি
(২) মেজর এম.এ. জলিল- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
(৩) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম– আই.ডি.এল
(৪) অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমেদ– ন্যাপ
(৫) মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর– স্বতন্ত্র প্রার্থী

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে কোন প্রার্থী দেননি বলে হাফেজ্জী হুজুর এবং মাওলানা আবদুর রহীমের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জামায়াতের সহযোগিতা কামনা করা হয়। হাফেজ্জী হুজুরের পক্ষে চরমোনাই পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করিম এবং মাওলানা আবদুর রহীমের পক্ষে ব্যারিস্টার কুরবান

আলী আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন। এ ব্যাপারে আমীরে জামায়াত যা বলেছিলেন:

"আমি পীর সাহেবকে বললাম, হাফেজ্জী হুজুর পূর্বে রাজনীতি করেননি। হঠাৎ করে একেবারে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ অবস্থায় জামায়াত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা আমার একা বলা সম্ভব নয়।

ব্যারিস্টার সাহেবকে বললাম, মাওলানা আবদুর রহীম এমপি হিসেবে ভালো পজিশনেই আছেন। আপনারা তাঁকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করলেন কেন? আমার আশঙ্কা হয়, তিনি সংসদ নির্বাচনে একটি আসনে যে ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সারা দেশে ঐ সংখ্যক ভোটও হয়তো পাবেন না। জামায়াত এমন অবাস্তব প্রস্তাব সমর্থন করবে বলে মনে করি না।"

উক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রায় ৬ কোটি ভোটারের মধ্যে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দু'জন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যতীত সকল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রধান স্বতন্ত্রপ্রার্থী হাফেজ্জী হুজুর ৩ লাখ ৮৭ হাজার ২১৫ ভোট পেয়েও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। নির্বাচনের পরে হাফেজ্জী হুজুর খেলাফত আন্দোলন নামে একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটদানের ব্যাপারে জামায়াতের বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কিত সকলেই প্রেসিডেন্ট পদে কাকে ভোট দিবে- তা' জামায়াতের দায়িত্বশীলদের জিজ্ঞেস করা স্বাভাবিক, তাই জামায়াত নির্বাচনের প্রায় মাস দেড়েক পূর্বেই একটি সুচিন্তিত বক্তব্য পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে।

দেশ ও সংগঠনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভোটের ক্ষমতাটা দায়িত্ববোধ সহকারে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে জামায়াতের বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ:

(১) দেশের স্বাধীনতা কাদের হাতে নিরাপদ, সেটাই পয়লা নম্বরে বিবেচ্য বিষয়। যেহেতু প্রতিবেশী দেশ থেকে স্বাধীনতা বিপন্ন হবার আশংকা তাই যারা প্রতিবেশী এদেশকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে করে তাদের ভোট দেয়া যায় না।

(২) ইতঃপূর্বে যারা জাতির উপরে এক দলীয় শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল তারা গণতন্ত্রের শত্রু।

(৩) যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায় তাদের ভোট দেয়া আত্মহত্যারই শামিল।

(৪) ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে একাধিক প্রার্থী হয়েছেন, তাদের দ্বারা দ্বীন কায়েম হওয়া সম্ভবপর মনে করলে তাদের কাউকে ভোট দিতে পারেন।

(৫) হযরত মাওলানা মুহাম্মদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ইতঃপূর্বে রাজনীতি থেকে দূরে থেকে হঠাৎ করে একেবারে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হলেও জামায়াত তাঁকে মোবারকবাদ জানায়। ভোটের ফলাফল যাই হোক, তিনি রাজনৈতিক ময়দানে এ বৃদ্ধ বয়সে অবতীর্ণ হওয়ায় আলেম সমাজের মধ্যে যারা রাজনীতি করা দ্বীনি দায়িত্ব মনে করেননা, তাদের ভুল ধারণা দূর হবার দ্বারোদঘটিত হয়েছে।

জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল

বিচারপতি আবদুস সাত্তার (১৯০৬-৮৫) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ কর্তৃক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়ম বহির্ভূত আবদারের মুখোমুখি হলেন। লে. জেনারেল এরশাদ সাংবাদিকদের ডেকে বললেন, রাষ্ট্রপরিচালনায় সেনাবাহিনীর একটি সাংবিধানিক ভূমিকা থাকা দরকার।

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার পাকিস্তান আমল থেকেই নির্বাচন কমিশনার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিধ শের-ই-বাংলার একজন সাগরেদ হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিতে তিনি তেমনটা সুদক্ষ কখনোই ছিলেন না। এই দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি এরশাদের ধমকে বাধ্য হয়ে একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করলেন। এরশাদ খুশি না হওয়ায় উক্ত পরিষদকে পুনর্গঠন করা হলো। কিন্তু তাতেও এরশাদ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

তাই তিনি বিভিন্ন মহলে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মতামত জানালেন, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে যদি সশস্ত্র বাহিনীকে সংখ্যা গরিষ্ঠতা না দেয়া হয়, পরিষদ যদি মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নাকচ করার অধিকার না পায়, তা'হলে চীফ অব স্টাফের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না। এহেন সংবিধান বিরোধী মন্তব্য প্রকাশের পরও প্রেসিডেন্ট তাঁকে বরখাস্ত করার মত সাহস প্রদর্শন করতে পারেন নি।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান, সরকার দলীয় প্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনী প্রধান পদে তাঁর মতো একজন ঝানু বিচারপতি ও রাজনীতিক জেনারেল এরশাদের এমন অসাংবিধানিক ও অন্যায় দাবির নিকট

চরম অপমানজনকভাবে আত্মসমর্পণ করলেন, রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর নিজের গঠিত মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তিনি স্বেচ্ছায় সেনাপতি এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার ঘোষণা দিলেন।

বিচারপতি আবদুস সাত্তার যদি অন্তত: চুপ করেও থাকতেন, তাহলে তাঁর ও জনগণের ইজ্জত একটু রক্ষা হতো। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী ও এম.পি জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছেন, একমাত্র আপনারাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এরশাদ সরকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাত্তারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার দলীয় দাবির প্রতি সমর্থন প্রসংগে আমীরে জামায়াত ক্ষোভের সাথে বললেন যে, এ কাপুরুষ যদি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা এরশাদের হাতে তুলে না দিতেন, তাহলে লক্ষ লক্ষ বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলের পুরোভাগে তাঁকে রেখে বঙ্গভবন পুর্নদখলের আন্দোলণ করা যেতো।[৪]

অবৈধ ক্ষমতাধর স্বৈরাচারী এরশাদের পতন আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর অনন্য সাধারণ ও আপোষহীন যে ভূমিকা পালন করেছে তা গনতন্ত্রের সংগ্রাম ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

---

[৪] অধ্যাপক গোলাম আযম "জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা" আধুনিক প্রকাশনী।

চতুর্থ অধ্যায়

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির প্রেক্ষাপট ও প্রস্তাবনা

গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনের সময় এক ধরনের কেয়ারটেকার সরকার থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দলীয় নেতা হওয়ায় সরকার পরিচালনার সুযোগ নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশে ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালেই দু'টো নির্বাচনে কমবেশী অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা থেকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার পদ্ধতির প্রস্তাব করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব গোলাম আযম।

অধ্যাপক গোলাম আযম কর্তৃক প্রস্তাবনায় উক্ত কেয়ারটেকার সরকারের মূলকথা ছিল নিম্নরূপ, "নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্টে কর্মরত (অবসর প্রাপ্ত নয়) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার গঠন করতে হবে। এ সরকারে মন্ত্রী পদ মর্যাদার এমন লোকদেরকে 'উপদেষ্টা' নিয়োগ করতে হবে, যারা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত নন এবং কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নন। এ সরকার নিরপেক্ষ লোকদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নতুন সরকার গঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ সরকার কায়েম থাকবে এবং প্রধান বিচারপতি নিজ পদে প্রত্যাবর্তন করবেন"।

মূল প্রস্তাবে কর্মরত প্রধান বিচারপতিকে সরকার প্রধান করার কথা এ কারণেই বলা হয়েছে যে, তিনি নির্বাচনের পরেই পূর্ব পদে ফিরে যাবেন বলে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের সুযোগ থাকবে না। এ অবস্থায় তাঁর কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার কোন আশংকা থাকবে না। কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কিংবা আমলা হলে তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। "Prevention is better than cure." এই আপ্তবাক্যটি এ স্থানে প্রণিধানযোগ্য।

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৮০ সালে জামায়াতের কর্মপরিষদে প্রথম কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা পেশ করলে তা বিশদ আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত

সমস্যার দরুন জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর রমনা গ্রীণে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম ৭ দফা গণদাবির মাধ্যমে পেশ করেন। পরে তিনি ১৯৮৩ সালের ২০শে নভেম্বর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় জামায়াতের পক্ষ থেকে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এ দাবির সাথে প্রথমদিকে একমত হলে আরো পাঁচ বছর আগেই হয়ত স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটতো। কালক্রমে এ দাবিই গণদাবিতে পরিণত হয়।

অবশেষে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট জামায়াতে ইসলামীর উত্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়। এ দাবি অনুযায়ী পরিশেষে ১৯৯০ সালে ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ পূর্বক সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দিন আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ঐ সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৯৯৬ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ নং সংশোধনী হিসেবে সংবিধানে ২ ক পরিচ্ছেদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিরোনামে ৫৮ ঘ (১) অনুচ্ছেদে সংযোজিত হয়।

জামায়াতে ইসলামী ৮ নভেম্বর ১৯৮৭ সালের কর্মপরিষদে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে ইতিপূর্বে পেশকৃত কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে সংবিধানিকভাবে নিম্নোক্ত রূপরেখা পেশ করে:

(১) সংবিধানের ৭২ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট বর্তমান জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করবেন এবং সংবিধানের ৫৮ (৫) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিবেন।

(২) সংবিধানের ৫১ (৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করবেন।

(৩) প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৪৯ ধারা অনুযায়ী এমন একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করবেন যিনি আন্দোলনরত প্রধান রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হবেন।

(৪) সংবিধানের ৫১ (৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

(৫) ৫১ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদত্যাগের সাথে সাথেই সংবিধানের ৫৫ (১) ধারা মুতাবিক নবনিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন।

(৬) সংবিধানের ৫৮ (১) ধারানুসারে নতুন প্রেসিডেন্ট আন্দোলনরত প্রধান দল সমূহের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীণ ক্যাবিনেট গঠন করবেন।

(৭) নতুন প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী পরিষদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না বা রাজনীতির সাথে জড়িত থাকবেন না, নিরপেক্ষ থাকবেন।

(৮) সংবিধানের ১২০ (৩) খ ধারানুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(৯) পদত্যাগের ১৮০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিধান থাকা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদই দেশের ভবিষ্যৎ সরকার পদ্ধতি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার না সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে, তা ঠিক করবে।

জামায়াতে ইসলামী মনে করে বর্তমান জাতীয় সংকট কালে কোন মৌলিক সাংবিধানিক ইস্যু নিয়ে বিরোধী মহলে বিতর্ক শুরু হলে, তা' ক্ষমতাশীল সরকারের জন্যই লাভজনক হবে। দেশকে অব্যাহত সংকটের হাত থেকে বাঁচাতে হলে বর্তমান সরকারের উচিত সসম্মানে পদত্যাগ পূর্বক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের সাথে সংলাপে জামায়াত

১৯৮৪ সালে মার্চ মাসে ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামী মিলে ২৩ দলের যুগপৎ আন্দোলন এতটা জোরদার হয় যে, জেনারেল এরশাদ এপ্রিলের প্রথম দিকেই উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করার ঘোষণা দিয়ে দুই জোট ও জামায়াতকে তাঁর সাথে সংলাপের দাওয়াত দেন। ১০ এপ্রিল সংলাপের শুরুতে সকাল ১০ টায় জামায়াতকে এবং বিকালে ৭ দলীয় জোটকে দাওয়াত দেয়া হয়।

জামায়াত সিদ্ধান্ত নিল যে, ১৫ ও ৭ দলীয় জোটকে নিয়ে এক সাথে এরশাদের কাছে যেতে হবে। ইতোপূর্বে উভয় জোটের সাথে যোগাযোগের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট একটি লিয়াঁজো কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ আহ্বায়ক এবং সদস্য হয় সর্বজনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা ও এডভোকেট শেখ আনসার আলী। পরবর্তীকালে তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে লিয়াঁজো কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামায়াতের লিয়াঁজো কমিটি উভয় জোটকে সম্মত করার উদ্দেশ্যে প্রথমে দুই জোট নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে। একজন বলেন আমি তার সাথে যাবো না। একজন যেতে সম্মত হলেও উভয়ে একসাথে যেতে রাজি না হলে তো উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। অতঃপর নেত্রীদ্বয়ের পরামর্শ মুতাবিক জামায়াতের পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলাসহ সাধারণ দাবিনামার খসড়া তাদের হাতে তুলে দেয়া হলো, কিন্তু পরিতাপের বিষয় পরবর্তীকালে নিশ্চিতভাবে জানা গেল, সংলাপের উদ্দেশ্যে প্রণীত ও প্রদত্ত খসড়ার তারা কেউ সদ্ব্যবহার করলেন না। তারা নিজেরা কী বক্তব্য পেশ করলেন কি বললেন, তাও জামায়াতকে জানানোর কোন প্রয়োজনবোধ করলেন না। উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালে ১০ এপ্রিল সকাল ১০টায় ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে সরকারের সাথে সংলাপের উদ্দেশ্যে বৈঠকে মিলিত হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ হলো সর্বজনাব শামসুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাস্টার মুহাম্মদ সফিক উল্লাহ, আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান।

সংলাপে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামী সামরিক আইন প্রত্যাহার ও মুলতুবি শাসনতন্ত্র বহাল করার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য সরকার ও জনগণের নিকট পেশ করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সকল রাজনৈতিক দলের প্রধান দাবি হলো, অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান।

সংলাপের শুরুতেই জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সরকারকে জানানো হয় যে, দেশরক্ষায় সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি জামায়াতের পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন রয়েছে। কিন্তু দেশ শাসনে এ বাহিনীকে ব্যবহার করা দেশ, জাতি ও দেশরক্ষা বাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে জামায়াত বিশ্বাস করে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের আসল লক্ষ্য ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং দেশের শাসনতন্ত্র বহাল পূর্বক গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার কায়েমের ব্যবস্থা করা।

সংলাপে জামায়াত প্রতিনিধি দল কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপরেখা, ইসলাম এদেশের স্বাধীনতার রক্ষা কবচ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সার্বজনীন সুবিচারপূর্ণ কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনসহ একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠু রাজনৈতিক পদ্ধতির ধারণা পেশ করে।

বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উপায়

সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি মানা সত্ত্বেও সরকার যদি অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা না করে, তাহলে সংলাপের পরও সংকট নিরসন হবে না। জামায়াতের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায় না। এমন একটি সরকার থেকেই নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা করা যায় যে, সরকারের প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীগণ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য কিংবা নেতা থাকবেন না এবং সরকারি পদে থাকাকালে নির্বাচন প্রার্থী হবেন না।

জামায়াত নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের লক্ষ্যে যে অরাজনৈতিক সরকার গঠনের দাবি করে, তার জন্য দুটো বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারেন, অথবা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিজে অরাজনৈতিক সরকারের নেতৃত্ব দিতে পারেন। এ অবস্থায়

তাঁর সরকারকে অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ মর্যাদার প্রমাণ দিতে হবে কিংবা উন্নীত হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. তিনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না।
২. তাঁর মন্ত্রীসভার কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।
৩. তিনি ও তাঁর মন্ত্রীসভার কোন সদস্য রাজনৈতিক দলের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

সর্বশেষ সরকারের নিকট আমাদের অনুরোধ দেশ ও জাতির স্বার্থের জন্য অচিরেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন, সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, দেশ পরিচালনায় সকল দায়-দায়িত্ব নির্বাচিত জাতীয় সংসদের হাতে তুলে দিয়ে জাতীয় স্বার্থে এক ঐতিহাসিক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করুন।

জনাব আব্বাস আলী খান সরকার পক্ষকে জামায়াতের সবটুকু বক্তব্য পড়ে শোনান, শোনানোর পর তাঁরা দুই জোটের সাথে আলাপের পরে জওয়াব দিবেন বলে জানান। সরকার পক্ষে এ রকম বলাই স্বাভাবিক, সবাই এক সাথে একই রকম বক্তব্য পেশ করলে তাঁরা তাৎক্ষনিক জওয়াব দিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু একসাথে না বসার কারণে সরকার সময় ক্ষেপণের সুযোগ পেয়ে যায়।

সংলাপে সবাই একসাথে না যাবার পরিণাম

০৭ দলীয় জোট ও ১৫ দলীয় জোট পৃথক পৃথকভাবে এরশাদের সাথে এবং মন্ত্রী পর্যায় দফায় দফায় বৈঠকে বসেন। এরশাদ তাদের সাথে বিতর্ক ও বিভেদ সৃষ্টির মহাসুযোগ পেয়ে গেলেন। জামায়াতের সাথে শুরুতেই তিনি বললেন "আপনারা ১৫ দলের সাথে কেমন করে মিলে গেলেন, আমি ইসলামের জন্য এত কিছু করছি, অথচ আপনারা আমার সাথে থাকলেন না।" আবার ১৫ দলের সাথে শুরুতেই বললেন "আপনারা স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতের সাথে মিলে কেমন করে চলছেন?" এর দ্বারা তিনি যুগপৎ আন্দোলনে শরীকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হলেন।

যদি সবাই একত্রে সংলাপে বসতেন, তাহলে এ সুযোগ কিছুতেই পেতেন না। সংলাপ চলাকালেই জামায়াত ক্ষুব্ধ ও সংশয়াপন্ন ছিল যে, দুই জোট কেন এক সাথে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল না। একত্রে না গেলেও লিয়াঁজো পর্যায় সংলাপের মাধ্যমে আন্দোলনের টার্গেট অর্জন করা কর্তব্য ছিল। এ বিষয়ে জামায়াতের পক্ষ থেকে বার বার তাকিদ দেয়া সত্ত্বেও তাঁরা গুরুত্ব দিলেন না। এ অবস্থায় সাফল্যের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও জোট নেতৃবর্গের

দূরদৃষ্টি ও আন্তরিকতার অভাবে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা গেল না। এরশাদ তাদের সাথে সংলাপে বিজয়ী হলেন। অবশেষে ১৯৯০ সালে সকল জোট ও দল কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সাফল্য ১৯৮৪ সালে অর্জন করলে হয়ত আরো ছ'বছর স্বৈরশাসন দীর্ঘায়িত হতনা।

১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রস্তাব

২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সমাপ্তি অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ-

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমমর্যাদার ভিত্তিতে সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রত্যাশী এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। কিন্তু জামায়াতের মজলিসে শূরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত সরকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনাকাংখিত বিগ ব্রাদারসুলভ আচরণ প্রদর্শন করে যাচ্ছে। দক্ষিণ তালপট্টী দ্বীপ জবর দখল, আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম ছিট মহল ও তিন বিঘা করিডোর নিয়ে নানারূপ টাল বাহানা, সীমান্ত সংঘর্ষ, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ প্রশ্নে ভারত সরকারের যে চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তাঁকে সম্প্রসারণবাদী এবং আগ্রাসীবলে আখ্যায়িত করা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

সম্প্রতি আরো দুটো ঘটনায় প্রতিবেশী ভারতের এই আগ্রাসী চরিত্রেরই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঘটনা দুটো হলো (১) রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী পোস্টারে ভারতের মানচিত্রে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ হিসেবে দেখানো। (২) ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ণ কমান্ড দিবস পালন। এক যুগ (১৯৭২-৮৪) পরে ইস্টার্ণ কমান্ড কর্তৃক সাবেক পূর্ব পাকিস্তান দিবস পালন রহস্যপূর্ণ চক্রান্তমূলক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। এসব ঘটনার মাধ্যমে ভারত সরকার একথাই প্রমাণ করলেন যে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনপদ এই বাংলাদেশের জগণের বন্ধুত্বের চেয়ে দেশটির উপর আধিপত্য বিস্তারেই তারা বেশী পছন্দ করেন।

মজলিসে শূরা মনে করে যে, বাংলাদেশের জনসমর্থনহীন সামরিক সরকার ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে প্রতিনিধিত্ব করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে মজলিসে শূরা ইস্টার্ণ কমান্ড দিবস পালন সহ

ভারতের সকল সম্প্রসারণবাদী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। মজলিসে শূরা যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারনবাদ, ও আধিপত্যবাদের মুকাবিলায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে আপোষহীন এবং ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের জন্য দলমত নির্বিশেষে দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

সমকালীন রাজনীতিতে মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৮৮৮-১৯৮৭)

ভারতের পানিপথ মাদরাসায় অল্প সময়ের মধ্যে কোরআন মজিদ হেফজ করার পরে নোয়াখালীর মেধাবী কিশোর মুহাম্মদুল্লাহ 'হাফেজ্জী' বলে সম্মানিত হতে থাকে। অত:পর তিনি সাহারনপুর মাজাহেরপুর উলুম মাদ্রাসায় ইলমে বুৎপত্তি লাভের পর বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস কোর্স শেষ করেন।

১৩৪৪ হিজরী সালে মরহুম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ. ১৮৯৫-১৯৬৮) সহ কুমিল্লা বি.বাড়িয়া মারাসায় অধ্যাপনাকালে মাওলানা ফরিদপুরী হাফেজ্জী নামের সাথে 'হুজুর' শব্দটি যোগ করেন। আর তখন থেকেই তিনি 'হাফেজ্জী হুজুর' নামে দেশ-বিদেশে পরিচিত হন। হিমালয়ান উপমহাদেশের অবিসংবাদিত আলেমে দ্বীন ও পীর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর খেলাফত প্রাপ্ত মরহুম মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর এর নেতৃত্বে গঠিত ফেলাফত আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক সাড়া জাগানো ঘটনা। তিনি কোন শক্তিশালী সংগঠন ও উপযুক্ত নির্বাচনী কর্মকান্ড ব্যতিরেকেই ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে মুফতি ফজলুল হক আমিনী, শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা মহিউদ্দীন খান, চরমোনাই পীর মরহুম ফজলুল করীম প্রমুখ সকলেই সেদিন শরীক হয়েছিলেন ফেলাফত আন্দোলনের পতাকাতলে। ১৯৮৬ সাল থেকে ফেলাফত আন্দোলন যে সব কারণে ভাঙ্গনের পালা শুরু হয়, সে আলোচনার এখানে সুযোগ নেই, সমীচিন ও নয়। আমাদের মূল উল্লেখ্য এদেশের বর্তমান প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, একশ্রেণীর ওলামা ও মাশায়েক রাজনীতি চর্চাকে অত্যন্ত খারাপ ও দুনিয়াবী কাজ বলে মনে করতো। খোদ হাফেজ্জী হুজুরসহ অনেক বিশিষ্ট ওলামাকে আশির দশকের শুরু পর্যন্ত

রাজনীতিতে নামানো যায়নি। অন্যান্য ধর্ম যেমন উপাসনালয়ের মধ্যে সীমিত, দ্বীনে ইসলামকে তেমনি নিছক একটা ধর্ম মনে করা হতো। ইসলাম ও রাজনৈতিক চিন্তধারার ঠিক এমনি একটি প্রেক্ষাপটে হজরত হাফেজ্জীর উপলব্ধি এবং ধূমকেতুর মতো রাজনীতিতে আগমন অনেক ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের রাজনীতি সংক্রান্ত গোমরাহী দূরীকরণে বিরাট সহায়ক হয়েছে। ইসলাম ও রাজনীতি সংক্রান্ত যে ভুল বুঝাবুঝি, তিনি তার অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মাওলানা হাফেজ্জী হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ

এদেশের তৌহিদী জনতা ইসলামী নেতৃবৃন্দকে এক প্লাটফর্মে দেখতে আগ্রহী আর আল্লাহপাকতো ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য আন্দোলন করতে নির্দেশ দিয়েছেন শীষাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। ইসলামী ঐক্যের জন্য জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানী আমলেও যেমনি ছারছিনার পীর সাহেব এবং হজরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছেন তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের ইত্তেহাদুল উম্মাহসহ একাধিক অরাজনৈতিক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিতে ইকামতে দ্বীনের মেহনত করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে ঢাকাস্থ টি এন্ড টি কলোনী মসজিদে অনুষ্ঠিত ইত্তিহাদুল উম্মাহর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনে ছারছিনার পীর মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ এবং হযরত হাফেজ্জী হুজুরকে দাওয়াত দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকার প্রবীন আলেম মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মাসুম সাহেব, জামায়াত নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় সহকারী কমিশনার ক্যাপ্টেন আবদুর রব সাহেবকে নিয়ে চরমোনাই পীর মাওলানা ফজলুল করীম হজরত হাফেজ্জী হুজুরের দরবারে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৮৪ সালে হজরত হাফেজ্জী হুজুরেরএক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মোহাম্মদপুর নিবাসী অশিতিপর বৃদ্ধ আলেম মাওলানা আবদুল হাই তাঁর খালুজানের সাথে জামায়াত নেতাদের এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সাথে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, চরমোনাই পীর মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব এবং সেখানে হাফেজ্জী হুজুরের তিন ছেলে এবং ১০/১২ জন অন্যান্য কতিপয় উৎসাহী লোক বসা ছিলেন। তাঁর দু'জামাতাও ছিলেন এদের

মধ্যে। হাফেজ্জী হুজুরের সাথে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় শেষে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বক্তব্যের সার কথা ছিল-

"ইসলাম বিজয়ের পথে ইসলামী ঐক্যের অভাবই প্রধান বাধা। আপনি ইসলামী খেলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে এ বয়সে নির্বাচন করলেন। সবার মুরুব্বী হিসেবে সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপনার সংগঠন খেলাফত আন্দোলনের নামে আপনি ডাক দিতে পারেন। আপনার ডাকে জামায়াতে ইসলামীও সাড়া দিতে প্রস্তুত।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর তাঁর স্বভাবসূলভ ক্ষীণকণ্ঠে উর্দূভাষায় যা বললেন তার সারমর্ম "আমাদের আকাবিরীন (নেতৃস্থানীয় ওলামা) মাওলানা মওদূদীর খিলাফত তথা চিন্তা ধারাকে সহিহ্ মনে করেন না। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (যিনি তাঁর পীর এবং তিনি যার খলিফা) মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, আমার দিলে এতমিনান হয় না।"

প্রতুত্তরে অধ্যাপক আযম অত্যন্ত আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে বললেন, "মাওলানা মওদূদীকে আমরা নির্ভুল মনে করিনা। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁর লিখিত কিতাবাদিতে কী কী ভুল আছে, তা ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা মেনে নেব। আপনি আপনার পছন্দ মতো কয়েকজন আলেমকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দিলে জামায়াতের কয়েকজন তাদের সাথে বসে ভুলগুলো জেনে নিতে পারবে। আমরা এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।"

চরমোনাই পীর সাহেব এবং হুজুরের মেঝো ছেলে হাফেজ হামীদুল্লাহ অধ্যাপক সাহেবের কথাকে স্বাগত জানিয়ে তাদের মুরুব্বীর সদয় সৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি হাত উঁচিয়ে রাগত কণ্ঠে বললেন "আমি তোমাদের সাথে নেই, বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে আছি।" মাওলানা আব্দুল হাই থেকে পরে জানা যায় যে, জামায়াতকে সংশোধনের এ সুযোগ হাত ছাড়া করা কি ঠিক হলো। এর জবাবে হাফেজ্জী হুজুর নাকি বলেন "ওদের সাথে বসায় অসুবিধায় আছি, আরবের আলেমগণ মাওলানা মওদূদীকে সমর্থন করবে।" আমরা আপত্তি তুললে তারা আরবের আলেমদের অভিমতও তুলে ধরতে পারে। নাছোরবান্দা মাওলানা আব্দুল হাই নাকি বলেছিলেন "আরবের আলেমদের কি ইসলাম সম্পর্কে সহীহ এলেম নেই?" হজরত হাফেজ্জী হুজুর এ কথার আর কোন জওয়াব দেননি।"[৫]

জীবনে যা দেখলাম (সপ্তম খণ্ড), অধ্যাপক গোলাম আযম।

গণতন্ত্র দিবস পালন

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আহূত গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাচন বাতিল পূর্বক সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক তৎপরতার উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ও সংবাদপত্রের নিরংকুশ স্বাধীনতা দাবি করে জামায়াত প্রায় মাসব্যাপী গণসংযোগ অভিযান পরিচালনা করে। গণসংযোগ অভিযানের শেষ পর্যায়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার দিন ছিল গণতন্ত্র দিবস।

গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরী আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের সভাপতিত্বে ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান।

প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব আব্বাস আলী খান, যারা ইতিপূর্বে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন, তাদেরকে উহা প্রত্যাহার পূর্বক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হবার আহ্বান জানান। জেনারেল এরশাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "সংবিধান লংঘন পূর্বক আপনি যে পথে চলছেন তা থেকে সরে আসুন, সামরিক আইন প্রত্যাহার করুন, উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করে সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচন দিয়ে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।"

গণতান্ত্রিক আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে বর্ষিয়ান জননেতা বলেন, আসুন সম্মিলিতভাবে দেশকে বর্তমান সংকটের হাত থেকে উদ্ধার করি। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, শিল্পনগরী টঙ্গী, রংপুর, সিলেট, খুলনা, জামালপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় গণতন্ত্র দিবস পালন উপলক্ষে সভা-সমাবেশ করা হয়। এ সমাবেশ থেকে উপজেলা নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানানো হয় এবং যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়।

১৯৮৬-১৯৮৮ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম

১৯৮৬-১৯৮৮ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম। ১৯৮৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ সদস্য জনাব আব্বাস আলী খান আমীরে জামায়াতের সুস্বাস্থ্য ও সফলতা কামনা করে দোয়া করেন।

অতঃপর নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে **১৯৮৬-১৯৮৮** কার্যকালের জন্য জনাব আব্বাস আলী খান সাহেবকে নায়েবে আমীর ও ভারপ্রাপ্ত আমীর, জনাব শামসুর রহমান সাহেবকে নায়েবে আমীর এবং মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফকে সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত করেন। এ সময়ে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা ও জেলা আমীরগণের মধ্যে সামান্যই রদ বদল হয়।

পরবর্তীতে অধ্যাপক গোলাম আযম কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন তা হলো :

"আবার আমার উপরে দায়িত্ব আসল, নবনির্বাচিত শূরা সদস্য ও জেলা আমীরদের মাধ্যমেই আমি এ দায়িত্ব পালন করব। নামাজে ঈমাম যেমন ভুল করলে বিজ্ঞ মোক্তাদী লোকমার মাধ্যমে ঈমামের ভুল সংশোধন করতে সাহায্য করে, তেমনি আপনারাও অনুরূপভাবে আমার ভুল সংশোধনে আমাকে সাহায্য করবেন।

সংগঠনের কল্যাণে আপনাদের নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে :

১) আমার ভুল দেখলে কালবিলম্ব না করে সময়মত ভুল ধরিয়ে দিবেন, নামাজের ভুল ধরাতে যেমন বিলম্ব করা ঠিক নয় তেমনি এ ব্যাপারেও।

২) পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ হচ্ছে কিনা তার উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

৩) সংগঠনের কল্যাণে নূতন কিছু করা প্রয়োজন কিনা তাও চিন্তা-ভাবনা করবেন।

আমার ২য় কথা হল যে, আপনাদের সাথে আমার যে সম্পর্ক ঐ সম্পর্কের কারণেই আমীরে জামায়াতকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য কোন রকম লজ্জা বা সংকোচ করবেন না, আনুগত্যের দাবী হল যার আনুগত্য করবে তাকে ত্রুটিমুক্ত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। ইসলামে জামায়াতের নেতার আনুগত্যের যে বিধান রয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে আনুগত্য ইসলামে কাম্য তার হক পুরা-পুরি তখনই আদায় করা সম্ভব যখন আমীরকে অনুসারীরা আন্তরিকভাবে ভালবাসবে, নেতার ব্যাপারে কোন খটকা থাকলে তা অবশ্যই দূর করতে হবে।"

অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসায় হামলা ও তার প্রতিবাদ

১৯৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় ১০/১২ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারী ৫টি মোটর সাইকেল যোগে অধ্যাপক গোলাম আযমের ঢাকাস্থ বাসভবনের (১১৯, কাজী অফিস লেন, মগবাজার) দু'ভাগে ভাগ হয়ে প্রাণনাশী হামলা চালায়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হামলাকারীরা পরপর ৪টা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। দুটো বোমা পাশেই তার এক ভাইয়ের বাসায় নিক্ষিপ্ত হয়। বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হলে চারদিকে আতংকের সৃষ্টি হয়। ৩জন অস্ত্রধারী অধ্যাপক আযমের অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকে পড়ে তাঁকে খুঁজতে থাকে। অধ্যাপক সাহেবের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি অধ্যাপক ফজলুর রহমান ও তাঁর সদ্য বিদেশ ফেরত বড় ছেলে মামুন আল আযমী হতভম্ব হয়ে যায়। ছেলের বুকে রিভলভার তাক করে তারা 'গোলাম আযম কোথায়' বলে চিৎকার করতে থাকে। তার মাত্র ০২ মিনিট আগে অধ্যাপক আযম কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাড়ীর বাহিরে যান।

ইতোমধ্যে বোমার শব্দে পাড়া প্রতিবেশীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অনেকে এগিয়ে আসায় আক্রমণকারীরা গালিগালাজ করতে করতে প্রস্থান করে। যাবার সময় ঘরের দেয়ালে কয়েকটা বোমা মেরে যায়। আল্লাহর রহমতে কেউ মারাত্মকভাবে আহত না হলেও বাড়ীর দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে এক রকম অলৌকিকভাবে মহান আল্লাহপাকের ইচ্ছায় প্রাচ্যের ইসলামী আন্দোলনের এই মহান নেতা বেঁচে যান। তাই বলা হয়ে থাকে, 'রাখে আল্লাহ মারে কে' জীবন মৃত্যুর ফয়সালাকারী আল্লাহই তাঁকে তার খাস মেহেরবানিতে একাধিকবার হেফাজত করেছেন।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের এই অবিসংবাদিত প্রবীন নেতার বাসভবনে সশস্ত্র দুর্বৃত্তের কমান্ডো হামলা ও হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা পরদিন তাঁর বাসভবন থেকেই এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। বিক্ষোভ মিছিলটি মগবাজার সড়ক, মৌচাক মার্কেট, মালিবাগ, শান্তিনগর, কাকরাইল, পুরানা পল্টন হয়ে বায়তুল মুকাররম মসজিদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। বিশাল মিছিলে অগ্রভাবে ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, শামসুর রহমান, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ প্রমুখ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। ঐ দিন তাৎক্ষনিকভাবে খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর, বগুড়া, মাগুরা, নবাবগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ সহ দেশের সর্বত্র তৌহিদী জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার প্রাণনাশী চক্রান্ত ও হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রাণনাশের ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতিবাদে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর আলহাজ্ব শামসুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ছাড়াও সাবেক প্রবীন মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, জাতীয় দলের সভানেত্রী আমেনা বেগম, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ২৯২ জন আইনজীবীসহ সর্বস্তরের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় মানুষ তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশপূর্বক সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।

অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার আন্দোলনের পটভূমি

১৯৭৩ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম যখন হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মক্কায় অবস্থান করছিলো, বাংলাদেশ সরকার তখন অধ্যাপক গোলাম আযমসহ ৩৯ জন বাংলাদেশীর নাগরিকত্ব বাতিল করে। ১৯৭৬ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকার এক প্রেসনোটে বলেন, যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নাগরিকত্ব ফিরে পেতে ইচ্ছুক তাদেরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায় বরাবরে আবেদন করতে হবে। উক্ত প্রেসনোট প্রকাশিত হবার পর তিনি লন্ডন থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য বাংলাদেশ সরকার সমীপে বারবার আবেদন করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে একই তালিকায় এবং একই ঘোষণায় যে ৩৯ জনের নাগিরকত্ব বাতিল করা হয় তাদের মধ্যে একমাত্র তিনি ছাড়া আর যারাই নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করেছেন, এমনকি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাদের সবাইকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। জনাব নূরুল আমীন, মুহাম্মদ আলী, এডভোকেট শফিকুল ইসলাম ও রাজা ত্রিদিব রায়, পাকিস্তানে থেকে গেলেন, তাঁরা নাগরিকত্ব ফিরে পাবার জন্য কোন দরখাস্তই করেন নি। নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে পাকিস্তান, সৌদী আরব, বৃটেন, আমেরিকায় তাঁর একাধিক শুভাকাঙ্ক্ষীর নিঃশর্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত অফার পরামর্শ ও অনুরোধ সত্ত্বেও ঐসব দেশের নাগরিকত্ব কিংবা রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের চিন্তাও করেন নি।

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্নে যখন কোন সূরাহা হচ্ছিলনা, তখন তাঁর অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ আম্মা সৈয়দা আশরাফুন্নিসা ১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্রের নাগরিকত্ব বহালের আবেদন করেন, এবারও যখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূল সাড়া মিললনা, তখন অধ্যাপক আযম প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মাত্র তিন মাসের ভিসা নিয়ে পাকিস্তানী

পাসপোর্টেই দেশে ফিরলেন, স্বদেশে ফিরে তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে তাঁর নাগরিকত্ব সমস্যাটি সমাধানের আবেদন জানান।

নাগরিকত্ব বহালের আবেদনে অধ্যাপক গোলাম আযম দ্ব্যর্থহীনভাষায় ঘোষণা করেন-

১. সকল বিচার বিবেচনায় আমি একজন বাংলাদেশী।
২. পাকিস্তানী পাসপোর্টে আমি আসতে বাধ্য হলেও আমি পাকিস্তানী নই। (বলাবাহুল্য, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবসহ এদেশের সকলের পাকিস্তানী পাসপোর্ট ছিল);
৩. গত ছ'বছরের (১৯৭৩-৭৮) আমি একবারও পাকিস্তানে যাইনি।
৪. আমার স্ত্রী ও সন্তানগণ বাংলাদেশেরই নাগরিক।
৫. বাংলাদেশের বাহিরে আমার কোন সহায় সম্পত্তি নেই।
৬. আমার মরহুম পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি সেটাই আমার একমাত্র সম্পত্তি।

১৯৮০ সালের জানুয়ারি থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নির্বাচিত আমীর হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব স্বীকার না করা পর্যন্ত প্রকাশ্য ময়দানে আমীরের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর ছিল না। জামায়াতের জন্য এটা একটা বিরাট সমস্যা ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এ পরিস্থিতিতে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার করার জন্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্মপরিষদে নাগরিকত্ব পূনর্বহাল কমিটি গঠিত হয়। ঐ বছরের জুলাই মাসের কর্মপরিষদে মাওলানা আবদুল জব্বারকে নাগরিকত্ব পূনরুদ্ধার কমিটির সভাপতি ও জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকে সেক্রেটারি করা হয়।

এ দিকে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে ফিরে আসার পরপরই দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও আলেম সমাজ, ছাত্র, কৃষক শ্রমিক সর্বস্তরের নেতৃবর্গ ও জনগণ তাঁর জন্মগত নাগরিকত্ব পূনর্বহালের দাবি জানাতে থাকেন। অধ্যাপক আযমের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকেও তাঁর জন্মগত নাগরিকত্ব অধিকার ফিরিয়ে দেবার জন্য জোর আহ্বান জানান। প্রবীন রাজনীতিবিদদের মধ্যে সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, লে. কর্ণেল (অব.) এ.এস.এ. মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী আবদুল কাদের, কাজী জাফর, শাহ মোয়াজ্জম হোসেন, আমেনা বেগম, মোহাম্মাদ তোয়াহা, সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদ, এনায়েত উল্লাহ খান, গিয়াস

কামাল চৌধুরী, ইকবাল সুবহান চৌধুরী এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর (অব.) এম.এ. জলিল ও জয়নুল আবেদীন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৮৮ সালের ৩০ মে অধ্যাপক গোলাম আযমের নিজ বাসভবনে তার তৎকালীন টিনের চৌচালা ঘরে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১ঘন্টা ৫মিনিটের এ দীর্ঘ সাংবাদিক সম্মেলনে দেশী-বিদেশী সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন, গভীর আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান ৬৬ বছরের বয়স্ক নেতা সহাস্যে সাংবাদিকদের সকল প্রশ্নের জবাব দেন। তাঁর সম্পর্কে বিদেশে বাধ্যতামূলকভাবে প্রবাসী ও দেশে অবস্থানকালীন এক তরফা মিথ্যা প্রচারনার প্রেক্ষিতে যে সব বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ময়দানে ছড়ানো হয়েছিল অধ্যাপক আযম ঐ সব ব্যাপারে বিভ্রান্তির অপনোদন করেন। পাঁচ ঘন্টার নোটিশে আয়োজিত ঐ সংবাদ সম্মলনে ৮০ জনের বেশী সাংবাদিক ও আলোক চিত্র সাংবাদিক অংশগ্রহণ করে ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের বর্ণনা ও তাঁর বক্তব্য পরদিন ৩১ মে (৮৮) সব কাগজে যথাযথ গুরুত্বের সাথে ছাপানো হয় "দেশবাসীর কাছে আমার নাগরিক অধিকার প্রসংগ" শীর্ষক একটি পুস্তিকার লক্ষ লক্ষ কপি দেশবাসীর কাছে বিভিন্নভাবে পৌছিয়ে দেয়া হয়।

একপর্যায়ে দেশবাসীর কাছে প্রশ্নাকারে তিনি বিবেচনার জন্য বলেনঃ

১. আমি জন্মসূত্রে এদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা কি বে-আইনি নয়?

২. আমি যদি বে-আইনি কাজ করে থাকি, তাহলে আইন মুতাবিক আমার বিচার হ'লনা কেন?

৩. ইতঃপূর্বে বিদেশে থাকার দরুন আমার বিচার করা যদি সম্ভবপর না হয়ে থাকে, তাহলে গত দশ বছরে দেশে থাকা সত্ত্বেও বিচার হলো না কেন?

৪. একই অজুহাতে যাদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল (৮৪ জন) তাদের নাগরিকত্ব বহাল হলেও আমার বেলায় হচ্ছে না কেন?

৫. দেশের অগনিত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ওলামা তথা সর্বস্তরের লোক আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেবার দাবিতে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রতিনিয়ত বিবৃতি দেয়া সত্ত্বেও সরকার নীরব কেন?

এ বিষয়ে ১৯৮৮ সালের ৩১ মে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহম্মদ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অধ্যাপক গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থান করা সম্পর্কে সরকারি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম

বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভের জন্য সরকারের নিকট যে আবেদন করেছেন, তা সরকার এখনো বিবেচনা করেনি। ঐ আবেদন এখনো নাকচ করা হয়নি বলে তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন।

জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীর মৃত্যু

জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। জেনারেল ওসমানী 'সাহায্য' ছাড়া অন্য কোন ধরনের হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে চাইতেন না। নিজ দেশের স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে তাঁর যে অহংকার ছিল তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এটা চেয়েছিলেন। তাঁর বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে সংযুক্ত হোক, এটা তিনি কিছুতেই চাইতেন না।

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার একক নেতৃত্বে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথকমান্ড গঠন তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি। তাই দেখা যায় যৌথকমান্ড গঠনের পরও তিনি মুক্তিবাহিনীকে সরাসরি কমান্ড করতেন। এইসব কারণেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পুরো ঘটনা তাঁর নিকট গোপন রাখা হয়।

১৯৮৩ সনের ২৪ নভেম্বর সাপ্তাহিক বিচিত্রার পক্ষ থেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ আপনার নিকট হলো না কেন?' জওয়াবে তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক ঘটনা আমি জানি, যাতে অনেকেরই অসুবিধা হবে। আমি একটা বই লিখছি। তাতে সব ঘটনাই পাবেন। একটা আত্মজীবনী লিখবো। অনেক অজানা ইতিহাস থাকবে তাতে। জেনারেল ওসমানীর জীবনীগ্রন্থ হবে না সেটা, সেটা হবে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস।'

চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাওয়ার প্রাক্কালে সি.এম.এইচ-এ তিনি এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

অনেক কথা, অনেক ইতিহাস বুকে নিয়ে ১৯৮৪ সনের ১৬ জানুয়ারি জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের দেয়া গণভোট ও উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন বর্জন

১৯৮৫ সনের ২১ মার্চ রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য গণভোটের আয়োজন করেন। ভাড়াটে কিছু লোক ছাড়া ভোট কেন্দ্রে কেউ যায়নি। তথাপিও নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, বিশাল সংখ্যক ভোটার রাষ্ট্রপতির প্রতি তাদের আস্থা ব্যক্ত করেছে। অবশ্য যাতে বাধামুক্ত ভাবে গণভোট সম্পন্ন হতে পারে সেই জন্য ১ মার্চ থেকেই রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।

এবার এরশাদ ঘোষণা করলেন যে, ১৯৮৫ সনের ১৬ ও ২০ মে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংলাপে সকলেই সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা সেই দাবির প্রতি বৃদ্ধাংগুলি দেখানোর মতোই ছিলো। ১৫ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন বয়কট করার ঘোষণা দেয়া হয়। নির্বাচনের দিন হরতালও পালিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে মুসলিম নিধন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ভারতের বোম্বাই, আসাম ও অন্যান্যস্থানে পাইকারী হারে মুসলিম হত্যা বন্ধ এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে ২৯ মে, ১৯৮৪ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিবের নিকট একটি টেলেকস্ ও কয়েকটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট তার বার্তা প্রেরণ করেন।

ইতিপূর্বে ১৪ মে ১৯৮৪ এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারী অস্ত্র শস্ত্রসহ ভারত প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং সীমান্তে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের বাড়ীঘর ও মালামাল রেখে প্রাণ ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে ইচ্ছুক এবং আজ পর্যন্ত এদেশের পক্ষ হতে কোন বিরূপ আচরণ প্রদর্শন করা হয়নি। কিন্তু একটি বৃহৎ শক্তিশালী দেশ হিসেবে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে অবন্ধুসুলভ আচরণই দেখিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে লোকজন অনুপ্রবেশ করছে বলে কল্পিত অভিযোগের ভিত্তিতে ভারত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া শুরু করেছে। অথচ বাংলাদেশ বার বার ঐ ধরনের অনুপ্রবেশের কথা অস্বীকার করে আসছে। বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ের পরে ভারত এবারে আসামে বংশানুক্রমে যে সব মুসলমান বসবাস করছে, তাদেরকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রূপে চিহ্নিত করে অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। ভারত যদি একথা মনে করে থাকে যে, এভাবে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে তার একটি ঔপনিবেশীক তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে তাহলে সে ভুলের স্বর্গে বাস করছে। আমরা আশা করি, ভারত এহেন আচরণ পরিহার পূর্বক উদার, অসাম্প্রদায়িক, প্রভুসুলভ নয় বরং বন্ধুসুলভ আচরণই অবলম্বন করবে।

১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের আহমেদাবাদ শহরে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শতাধিক মুসলমান নিহত, অসংখ্য মুসলমান আহত এবং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার খবরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ঐ বছরের ১৫ জুলাই এক যুক্ত বিবৃতীতে কঠোর ভাষায় উক্ত

দাঙ্গার নিন্দা জানান। সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশ, দাঙ্গা পর্যায়ক্রমে গুজরাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং উদ্বেগজনকহারে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা হতাহত হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ গভীর ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠার সাথে বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ভারতে হিন্দু মৌলবাদীদের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা একটি পুরনো ও জটিল সমস্যা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে এমন কোন বছর তো দূরের কথা মাস-দিনও যাচ্ছে না, যে সময়ে সংখ্যলঘু মুসলমানদের রক্তে ভারতীয় ভূমি রঞ্জিত ও কলঙ্কিত হয়নি। জ্যান্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারার মত নির্মম ও পাশবিক ঘটনা বিংশ শতাব্দীতে ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ভারতের প্রতিবেশী মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা যেভাবে শান্তিতে বসবাস করছে, ভারতের উচিত তা থেকে অবিলম্বে শিক্ষা গ্রহণ করা।

যে দেশের মন্ত্রীদের মুখে শান্তির খই ফুঁটে, যে দেশের সরকার সাম্প্রদায়িক দাংগা দমনে বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, তাদের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি হাস্যকর ও বেমানান। সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদে আন্তরিক এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পরধর্মের প্রতি উদারতা ও সহনশীলতার বাস্তব প্রমাণ দেবার জন্য জামায়াত নেতৃবর্গ ভারত সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সার্কের চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যখন ভারত ভ্রমনে রয়েছেন, সেই মুহূর্তে চলছে ভারতের একাধিক স্থানে ভয়াবহ মুসলিম নিধনযজ্ঞ, নেতৃদ্বয় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ মুসলিম হত্যা বন্ধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের নিকট জোর দাবি জানান।

অনশনরত ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ

২০ মার্চ ১৯৮৬ ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীরা তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ, চাকরি স্থায়ীকরণ ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য অনশন করছিলেন। অনশন চলাকালীন সময়ে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ অনশনকারীদের দেখতে জান। তিনি তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারীদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যায় মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন সমূহ সরকারকেই পূরণ করতে হবে। তিনি তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও তাদের চাকরিকে বিধিবদ্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

আওয়ামী জোটের সভায় বোমা হামলার নিন্দা জ্ঞাপন

১৯৮৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বায়তুল মুকাররম চত্বরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের সভায় বোমা হামলা হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ৮ দলীয় জোটের সভায় বোমা হামলার নিন্দাজ্ঞাপন পূর্বক ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন–

"গতকাল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ বায়তুল মোকাররম চত্বরে অনুষ্ঠিত ৮ দলীয় জোটের সভায় বোমা হামলার ঘটনার আমি তীব্র নিন্দাজ্ঞাপন করছি। সভা-সমাবেশ করা গণতান্ত্রিক অধিকার। এ অধিকারে যারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, তারা স্বৈরাচারের এজেন্ট ব্যতীত আর কিছুই নয়। হিংসাত্মক পন্থায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করে তারা দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সন্ত্রাস, দেশ ও জাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। কাজেই হিংসাত্মক পন্থা পরিহারপূর্বক একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আমরা সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এই ঘটনায় আহতদের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং এ ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।"

৩য় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের অংশগ্রহণ এবং প্রতীক সমস্যার সমাধান

১৯৮৬ সালে ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি বাদে বাকি সকল দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালের ৯ই এপ্রিল জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার এক জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বাংলাদেশে জামায়াতের নিজস্ব নামে এটাই প্রথম নির্বাচন, তাই কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দারুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের শুরুতেই প্রতীকের তালিকা ছবিসহ পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অনেক বেশী বলে নির্বাচন কমিশন পত্রিকায় প্রতীকের বিরাট তালিকা প্রকাশ করলো। জামায়াত এ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছিল। অথচ দেখা গেলা ঐ তালিকায় দাঁড়িপাল্লা মার্কা নেই। জামায়াত এ সমস্যার সমাধান করা জরুরী মনে করলো। প্রধান নির্বাচন

কমিশনার বিচারপতি এ.টি.এম মাসউদের স্মরণাপন্ন হতে হলো। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দাঁড়িপাল্লা প্রতীক চায় শুনে তিনি মন্তব্য করেন, "এটা তো হতে পারেনা, দাঁড়িপাল্লা সুপ্রিম কোর্টের প্রতীক, কোন রাজনৈতিক দলের এ প্রতীক কেমন করে হবে?"

জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে বলা হয়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াত এ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছে। তিনি সে কথার প্রমাণ দাবি করলেন, আল্লাহর মেহেরবানীতে ঐ নির্বাচনের সময় প্রকাশিত একটি পোস্টার পাওয়া গেল। এ প্রমাণ দাখিল করার পর নির্বাচন কমিশন আরো কিছু নতুন প্রতীকের সাথে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নাম ও ছবি পত্রিকায় প্রকাশ করলো। শেষ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতীক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল।

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৯টি রাজনৈতিক দল প্রার্থী দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে মাত্র ১১টি দলের প্রার্থী বিজয়ী হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মাত্র ৭৬টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করায়। কিন্তু অনেক ষড়যন্ত্র ও জুলুমের শিকার হয়ে মাত্র ১০টি আসনে জয় লাভ করে। আসন সংখ্যানুযায়ী দলীয় অবস্থা নিম্নরূপ :

১.	জাতীয় পার্টি (সরকারি দল)	- ১৫৩ আসন
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	- ৭৫ আসন
৩.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	- ১০ আসন
৪.	কম্যুনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ	- ৫ আসন
৫.	ন্যাপ (ভাসানী)	- ৫ আসন
৬.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	- ৪ আসন
৭.	জাসদ (রব)	- ৪ আসন
৮.	জাসদ (সিরাজ)	- ৩ আসন
৯	বাকশাল	- ৩ আসন
১০.	ওয়ার্কার্স পার্টি	- ৩ আসন
১১.	ন্যাপ (মুজাফ্ফর)	- ২ আসন
		মোট = ২৬৭ আসন
		স্বতন্ত্র = ৩৩ আসন
		সর্বমোট ৩০০ (তিনশত জন)

নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কিছু তথ্যঃ মোট প্রার্থী ঃ দলীয় ১০৭৪ + স্বতন্ত্র ৪৫৩ = ১৫২৭ জন। ভোটার সংখ্যা, পুরুষ ২,৪৯,৩৫,৯৯৩ + মহিলা

২,২৩,৮৯,৯৩৯ = ৪,৭৩,২৫,৯৩২। প্রদত্ত ভোট প্রদানের হার ৬০.২৮%। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মাথাপিছু জামানত প্রদান ৫,০০০/-।

নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এত কারচুপি করা সত্ত্বেও সরকারের দল কোন রকমে সংসদের মাত্র অর্ধেক আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। যদি যুগপৎ আন্দোলনরত দলগুলো সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত, তাহলে সরকারি দল খুব কম সংখক আসনই পেতো। যদি বিএনপি নির্বাচন করত, তাহলে সরকারি দল কোন মতেই অর্ধেক আসন দখল করতে পারতো না। তাহলে বাধ্য হয়ে এরশাদকে পদত্যাগ করতে হতো। বিএনপি ও জামায়াত যদি সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত, তাহলে হয়তো কমপক্ষে অর্ধেক আসনে এই জোটই বিজয়ী হতো। তবু জামায়াত যে ১০টি আসন পেয়ে পার্লামেন্টারী পার্টি হিসেবে গণ্য হতে পেরেছে তজ্জন্য মহান আল্লাহ পাকের লাখো শোকরিয়া আদায় করে। উল্লেখ্য, জামায়াত অত্র নির্বাচনে নিকটতম প্রার্থী হয়েছে ১৫টি আসনে, ব্যাপক হারে ব্যালট ডাকাতি হয়েছে ২৮টি আসনে। তন্মধ্যে তিনটি আসনে জামায়াত প্রার্থীদের প্রথমে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও পরোক্ষণে সরকারি দলের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

সরকারি দল কর্তৃক ভোট কারচুপির প্রত্যক্ষ প্রমাণ

আশির দশকের মাঝামাঝি জোট বদ্ধ দলগুলো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রণীত কেয়ারটেকার ফর্মুলার সাথে ঐক্যমত পোষণ না করায় তৃতীয় সংসদ নির্বাচনসহ কয়েকটি নির্বাচনই সরকারি দলের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। তারই খেসারত হিসেবে প্রত্যেক দলকেই কমবেশী কারচুপির শিকার হতে হয়। বেশ কয়েকটি আসনে ইতিপূর্বে উল্লেখিত জামায়াতের বিজয়কে অত্যন্ত জঘন্য পন্থায় ছিনতাই করা হয়েছে। এমনকি একটি আসনে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যসূত্র থেকে তৎকালীন সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তির নগ্ন হস্তক্ষেপ ও কারচুপির তথ্য জানা যায়।

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলা (রংপুর-১ আসন) এলাকার জামায়াতে ইসলামীর নমিনী ছিলেন পাকুরিয়া শরিফের পীর মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (১৯৩৩-২০০৮)। ১৯৮৬ সালের ৭ মে ভোট গণনার পর রিটার্নিং অফিসার পীর সাহেবকে স্বাভাবিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ বেতার থেকে এ খবর যথারীতি প্রচারিত হয়, কিন্তু ঊর্ধ্বতন সরকারি নির্দেশে ঐ রাতেই সব ব্যালট পেপার রংপুর সেনানিবাসে নিয়ে পরের দিন প্রেসিডেন্ট এরশাদের দলীয়

প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের ফলাফলে জনাব মোয়েন খান উদ্দীন সরকার পেয়েছেন ২১,০১২ ভোট, (জাপা) এবং শাহ মোহাম্মাদ রুহুল ইসলাম পেয়েছেন ২০,৯৭৭ ভোট। বিষয়টি সম্পর্কে পাঠকদেরকে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের জীবনে যা দেখলাম আত্মজীবনী থেকে তুলে ধরা হল। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বলেন-

"এ খবরের সত্যতার প্রমাণ পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। ১৯৯৬ সালে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের দাওয়াতে আমি ইস্তাম্বুলে যাই। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রাজধানী আংকারা থেকে তুরস্কে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের ফোন এলো। তিনি বললেন, আপনাকে আংকারায় আমার বাসায় দাওয়াত দিচ্ছি, আমি কখন গাড়ী পাঠাবো অনুগ্রহপূর্বক জানান। আমার সাথে তাঁর কোন পূর্ব পরিচিতি না থাকায় বিস্মিত হলাম। আমি তাঁকে জানালাম, আমি আংকারায় যাচ্ছি। আপনার গাড়ি পাঠাতে হবেনা।

ঐ সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারী জনাব আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের আমার সফর সংগী ছিলেন। আমাদের আংকারায় সৌদী কনস্যুলেটের দায়িত্বশীল ড. আলী আল গামেদীর মেহমান হওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য, শেষোক্ত ব্যক্তির সাথে নাসের সাহেব দীর্ঘদিন ঢাকাস্থ সৌদী দূতাবাসে সুনামের সাথে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাসায় যাওয়ার পূর্বে এক বাংলাদেশী আবেগের সাথে আমাকে গ্রহণ করলেন, পরিচয় দিলেন আত্মীয় হিসেবে। বললেন, আপনার ভাই মোঃ গোলাম মুয়াজ্জম আমার খালুশ্বশুর।

প্রাথমিক আপ্যায়নের পর মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আমাকে নিয়ে এক কামরায় একান্তে বসলেন। আমার হাত ধরে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, একটি বিশেষ কথা বলার জন্য আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম। তাঁর একথা শুনে আমি বিস্ময়ের সাথে শুনতে আগ্রহী হলাম। বলে চললেন, 'হায়াত-মউতের কোন ঠিক নেই, অনেক দিন থেকে আপনাকে সেকথাটি বলব ভাবছি, দেশে কখন ফিরতে পারব, বলা যায় না।, আপনি তুরস্কে আসায় আমি সুযোগ নিলাম, আমি কিঞ্চিত অধৈর্য হয়ে বললাম, 'আসল কথাটা বলে ফেলুন না'।

তিনি আবেগের সাথে বললেন, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আপনাদের প্রার্থী পাকুন্দিয়ার পীর সাহেব নির্বাচনে অনেক ভোটে বিজয়ী হন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট

এরশাদের নির্দেশে সেনানিবাসে ব্যালট নিয়ে গিয়ে এরশাদের দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। আমার জীবনে এমন জঘন্য অন্যায় আর কখনো করিনি। আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব, সে কথা ভেবে অনুতপ্ত হয়েছি। এখন আপনি এবং পীর সাহেব যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আখেরাতে মহা বিপদে পড়ব। আপনার নিকট আকুল আবেদন, পীর সাহেবকে আপনি বুঝিয়ে মেহেরবানী পূর্বক আমাকে মাফ করতে বলবেন।

তাঁর চেহারা দেখে আমার করুনা হলো। বুঝতে পারলাম, যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা না পেলে যে উপায় নেই, সে কথা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। দেশে ফিরে এসে প্রথম সাক্ষাতেই শাহ রুহুল ইসলামকে আমি তাঁর বিনীত আবেগের কথা জানালাম। তাকে মাফ করার ব্যাপারে পীর সাহেব একমত হলেন। মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান হার্টের রোগী ছিলেন, তিনি তুরস্কে হৃদরোগে ইন্তেকাল করেছেন।[৫]

[৫] অধ্যাপক গোলাম আযম "জীবনে যা দেখলাম" ৬ ষ্ঠ খণ্ড।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জন

১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং পার্টির চেয়ারম্যান হন। ১৯৮৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ নিজকে লে. জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অতঃপর জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন। জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি উভয় জোটের নেত্রীর সাথে যোগাযোগ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জনের ব্যাপারে সম্মত করার চেষ্টা করে। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাত্র ৩ জন, যাদের নাম ও প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা নিম্নরূপঃ

১. জনাব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ০২ কোটি ১৪ লক্ষ ৬৭ হাজার।
২. মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) ১৪ লাখের কিছু বেশী।
৩. লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান ১১ লাখ ৬৭ হাজার।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেতৃত্বাধীন জোট এবং জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন বর্জন করায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন খুব পানসে হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দ্বারা হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ যেই গৌরব অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা তিনি অর্জন করতে পারেননি। ১৯৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরশাদ সাহেবের গদি আরো মযবুত বলে তিনি নিশ্চিত হলেন। শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সংসদ নির্বাচনে যাবার ফলে শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে আবার যোগাযোগ শুরু করে। দেখা গেলা, বড় দল দুটো আন্দোলনের দুর্দশার জন্য পরস্পর দোষারোপ করছে। আওয়ামী লীগ বলেছে, বিএনপি সংসদ নির্বাচন বর্জনপূর্ব প্রেসিডেন্ট এরশাদকে অনেক আরামে বিজয়ী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। আর বিএনপি বলে, আওয়ামী লীগ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ পূর্বক স্বৈরাচারী এরশাদের গদি মযবুত করলো এবং একক বিরোধীদল হিসেবে সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সুযোগ নিল।

এই সময় ১৫ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়া বামদের গড়া ৫ দলীয় জোট নোংরা রাজনীতিতে লিপ্ত হয়। তারা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কাছে গিয়ে বলে, জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাত করে সংসদ নির্বাচন করেছে, তাই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীকে সাথে নেবেন না। আবার আওয়ামী লীগের কাছে গিয়ে বলে, জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা বিরোধী দল, কাজেই তাদেরকে নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা যাবে না।

৩য় সংসদে জামায়াত এম.পিগণের ভূমিকা

প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন। এটা বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৩ ধারায় ২ ও ৩ নং উপধারায় উল্লেখিত আছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে সংসদে বক্তব্য পেশের সুযোগ পায়।

১৯৮৬ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় দলনেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সংসদে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে যে বক্তব্য পেশ করেন নিম্নে তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো- "মাননীয় স্পীকার, আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে হৃদয় বিদারক দৃশ্য হলো, দেশের তিনজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মধ্যে দুইজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে নির্মর্মভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং অপরজনকে অন্যায়ভাবে উৎখাত করা হয়েছে। এই হত্যার রাজনীতি থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে না পারলে জাতির আগামীদিনের ভবিষ্যত অত্যন্ত অন্ধকার। ক্ষমতা হস্তান্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দেশে চালু করতে হলে গণতন্ত্রকে পূর্ণভাবে বিকাশ করতে হলে, দেশের রাজনীতিকে অবশ্যই অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। আর দেশের রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করতে হলে সেনাবাহিনীকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে অথবা রাজনীতিকে সেনাবাহিনী মুক্ত করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চেয়েছেন, খুব জোরে শোরে। আমিও জোরে শোরে বলতে চাই, যারা বন্ধুক দ্বারা ক্ষমতা দখল করে তাদের পক্ষে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়"। ১৯৮৬ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত জাতীয় সংসদ নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান তাঁর প্রায় ৩০ মিনিটের ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদের অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, সংবিধান মুলতবি, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, ভারতের আধিপত্য ভূমিকার প্রতি নতজানু

পররাষ্ট্রনীতি, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা, চট্টগ্রাম ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছাত্রহত্যা ইত্যাদি সম্পর্কে তুখোর বক্তৃতা দেন।

অতঃপর জামায়াতের সংসদীয় দলের ডেপুটি লীডার ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান জনাব এস,এম, মোজাম্মেল হক, মোঃ লতিফুর রহমান, এডভোকেট নূর হুসাইন, কাজী শামসুর রহমান, মোঃ মকবুল হোসাইন, মাওলানা আবদুর রহমান ফকির, মাওলানা মীম ওবায়দুল্লাহ, জবান উদ্দীন আহমেদ ও আবদুল ওয়াহেদ পর্যায়ক্রমে সংসদে গণতন্ত্র, ইসলাম এবং সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী ভূমিকার জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের সমালোচনা করে গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন।

সংসদ অধিবেশন বর্জনের আহ্বান ১৯৮৬

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ২৫ অক্টোবর ১৯৮৬ আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশন বর্জনের আহবান জানিয়ে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন-

"বিগত সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে সদ্য সমাপ্ত জালিয়াতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত কোন নির্বাচনই জনগণকে যথারীতি ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেয়া হয়নি। পূর্ব নির্ধারিত সাজানো ফলাফলই নির্বাচন কমিশনার রেডিও টিভিতে ঘোষণা দিয়েছে। বিগত ১৫ অক্টোবরের অর্থহীন প্রহসনমূলক প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জালিয়াতির সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

জনগণের রায় তথা অনাস্থা উপেক্ষা করে গত ২৩ অক্টোবর জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ পূর্বক বেসামরিক লেবাস পরিধান করেছেন। দেশবাসী তাঁর অবৈধ শপথের দিনটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করেছে। আজো দেশে সামরিক শাসন বহাল রয়েছে। জনগণ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। জনগণকে এ অবস্থায় রেখে সংসদ অধিবেশন বসতে পারে না। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলের পর আজ পর্যন্ত এ অবৈধ সরকার যা কিছু করেছে বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক তা' সবই অবৈধ। তাই জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সদস্যগণ আসন্ন সংসদ অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নই ওঠেনা। এতদিন পর অবৈধ কার্যকলাপ বৈধ করার বিল সমূহ পাসের উদ্দেশ্যে আহূত জাতীয় সংসদের এ অধিবেশনে যোগদান ঐ বিল পাসের তথা ঐসব অবৈধ কাজে সহযোগিতা দানেরই শামিল। তাই আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশন বর্জন করার জন্য আমি সকল বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।"

১৯৮৬ সালে বিরাজমান দুর্ভিক্ষাবস্থা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জামায়াত নেতৃবর্গের উদ্বেগ প্রকাশ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও সেক্রেটারী জেনারেল আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরাজমান দুর্ভিক্ষাবস্থা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পূর্বক ২৮ অক্টোবর ১৯৮৬ এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন-

"বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহে বিরাজমান দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিতে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। বিগত বর্ষা মওসুমে অতিরিক্ত বর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলের ফলে সৃষ্ট বন্যায় দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহে যথা, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, নবাবাগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুরসহ গোটা উত্তর বঙ্গ এবং কুষ্টিয়া, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরাসহ গোটা পশ্চিমাঞ্চলে ফসলের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দুর্ভিক্ষে লোক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম ইতোমধ্যেই মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে চলে গেছে। সীমাহীন দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি ও কালো টাকার দাপটেই আজ দ্রব্যমূল্যের এ দুর্দশা। ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অনুৎপাদন খাতে অর্থব্যয়ের কারণেই আজ দেশের অর্থনীতির এ ত্রিশংকু অবস্থা। এখন থেকে সতর্ক হয়ে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে দেশে বিরাজমান বর্তমান দুর্ভিক্ষ ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

অবিলম্বে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও রংপুর, কুড়িগ্রামসহ দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল সমূহ চিহ্নিত করে সে সব অঞ্চলের কৃষকদেরকে বিনামূল্যে সার, বীজ ও জরুরি ভিত্তিক বিনামূল্যে ঋণদান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর জন্য আমরা সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি। সেই সাথে দেশের বিভিন্ন সেবা মূলক সংস্থাসমূহ, দেশব্যাপী বিশেষত জামায়াত কর্মীদেরকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের সেবায় এগিয়ে আসার জন্য আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।"

জেলা আমীর সম্মেলন- ১৯৮৭ এর প্রস্তাব

১লা মার্চ, ১৯৮৭ থেকে তিন দিনব্যাপী জেলা আমীর সম্মলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে চরম অবনতি এবং জননিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ পূর্বক জেলা আমীর সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়-

"দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায় জননিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। থানা লুট, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড, বোমা বাজি, অগ্নিসংযোগ, সশস্ত্র সংঘাত সংঘর্ষ নিরীহ শান্তিপ্রিয় জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে। গ্রাম বাংলায় চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবী, রাহাজানী, লুণ্ঠন-ধর্ষণ ইত্যাদি আজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহরূপ নিয়েছে যে, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, বোমা, গ্রেনেড, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ও নাশকতামূলক আগ্নেয়াস্ত্র যত্রতত্র ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। অপরাধী ও সন্ত্রাসী চক্রের মুকাবিলা করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান ক্ষমতাশীন সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

জামায়াতের জেলা আমীর সম্মেলনের অভিমত এই যে, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য রোধে ব্যর্থ সরকারের উচিত অবিলম্বে পদত্যাগপূর্বক দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে সময় থাকতে রক্ষা করা।

সম্মেলনে অপর এক প্রস্তাবে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ যেহেতু অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জাতীয় রাজনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টিপূর্বক গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে, তাই ইতিহাসের এই কলঙ্কিত দিনটি 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে গণ্য করে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এ সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।"

হরিপুরে তৈল ইজারা দেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মজলিসে শূরার এক বৈঠক ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে সকাল ৯টায় বড় মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে দেশের সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতির মুকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করা ছাড়াও সিলেটের হরিপুরের তৈল ইজারা সম্পর্কেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়-

“বাংলাদেশের নিজস্ব বিশেষজ্ঞগণই ৭নং কূপ খননপূর্বক তৈল উৎপাদনে সক্ষম হন এবং যথারীতি উৎপাদন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। কিন্তু সম্প্রতি একটি অখ্যাত বিদেশী কোম্পানীর কাছে তৈল ক্ষেত্র ইজারা দিয়েছে বলে কথা উঠায় জনমনে দারুন সংশয় ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সরকার দলীয় জনৈক সংসদ সদস্য সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে জনমনে শংকা ও বিভ্রান্তি আরো বেড়েছে। অথচ এ ব্যাপারে সরকার এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীও সুস্পষ্টভাবে কিছু বলছেনা। জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সুস্পষ্ট ভাষায় তৈলক্ষেত্র ইজারা দানের বিরোধিতা করছে এবং এ ধরনের জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্তকবানী উচ্চারণ করছে। বিদেশী সাহায্য গ্রহণের নামে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আমাদের তৈল সম্পদকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার মত কোন গণস্বার্থ বিরোধী ব্যবস্থা জনগণ মেনে নিবে না। সুতরাং বিদেশী কোম্পানীকে তৈলক্ষেত্র ইজারা দেয়ার ব্যাপারে কোন চুক্তি সম্পাদিত বা চূড়ান্ত হয়ে থাকলে তা বাতিল ঘোষণা এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়ার জন্য মজলিসে শূরা সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

সবশেষে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা তৈল অনুসন্ধান, আহরন, বাণিজ্যিক উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণসহ যাবতীয় ব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু নীতিমালা সম্বলিত তৈলনীতি ঘোষণা এবং যথা সম্ভব স্বনির্ভরতার মাধ্যমে তৈল অনুসন্ধান ও তৈল উত্তোলনের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে।”

জামায়াতের দু'টি আদর্শিক বিজয়

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। জাতীয় সংসদের ভিতরেও এ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

সংসদে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী করার সুযোগ আসে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে জামায়াত সদস্যগণ সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

প্রথমতঃ সংসদের বৈঠক চলাকালীন আসর নামাজের বিরতি। ঘটনাটি ঘটে ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সাল। বেলা সোয়া তিনটায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় ও তা চলতে থাকে। আসর নামাজের সময় হলে জামায়াত সদস্যগণ নামাজের বিরতি দাবি করতে থাকেন। স্পীকার শামসুল হুদা সাহেব বললেন

“বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে আসরের নামাজের বিরতির নিয়ম নাই, আমি বিরতি দিতে পারব না, নামাজ যারা পড়তে চান তারা নামাজ পড়ে আসুন। জামায়াত সদস্যগণ স্পীকারের জবাবে প্রতিবাদী কণ্ঠ দ্বারা সংসদকে কয়েক মিনিটের জন্য অচল করে দেন। সংসদ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী জবাবে বলেন, “মাননীয় স্পীকার, আমি সিকি শতাব্দী হতে এ সংসদে আছি। আসরে নামাজের বিরতি আমি পাইনি। যদি আপনি মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে নামাজের বিরতি দেন, তবে আমার আপত্তি নেই।” বিরোধী দলীয় নেত্রীও বিষয়টির ব্যাপারে “আপত্তি নাই” বলে জানান। এরপর নামাজের বিরতি চালু হয়। এখন পর্যন্ত আল্লাহর মেহেরবানীতে জামায়াতের প্রচেষ্টার ফলে চালুকৃত নামাজের বিরতি সংসদে চালু আছে। এভাবে আংশিক হলেও সংসদে নামাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ শোক প্রস্তাবে নিরবতা পালনের পরিবর্তে মোনাজাত পদ্ধতি চালু। দীর্ঘদিন ধরে জাহেলী পদ্ধতিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ইন্তেকালে সংসদে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়ে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন এর মত বিদআত চালু ছিল। জামায়াত সদস্যগণ স্পীকারের কাছে জানতে চাইলেন, ‘মৃত ব্যক্তির জন্য নিরবতা পালন করলে তার কি উপকার হবে? যদি কোন উপকার হয় তাহলে আমরা করতে রাজি আছি। দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করার ব্যবস্থা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের শিখিয়ে গেছেন। এটা যদি জনগণের সংসদ হয়ে থাকে তবে মোনাজাত করে তাদের মাগফেরাত কামনা করতে হবে। এটাই সুন্নাহ। বিদআত কে উৎখাত করে সুন্নাহর প্রতিষ্ঠাই আমাদের কর্তব্য।’ অতঃপর জাতীয় সংসদে আর নিরবতা পালন না হয়ে মোনাজাতের পদ্ধতি চালু হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের ইন্তেকাল

জামায়াতে ইসলামীর (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শাখার প্রথম আমীর (১৯৫৬-৬৯) বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং তাফহীমুল কোরআনসহ বহু গ্রন্থের অনুবাদক জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ১৯৮৭ সালের ১লা অক্টোবর দুপুরে ঢাকাস্থ রাশমনো হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর। ২রা অক্টোবর শুক্রবার বায়তুল মুকাররম মসজিদে সালাতুল জানাজার পরে মরহুমকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বিশিষ্ট মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, বিশিষ্ট পন্ডিত ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাংবাদিক আবুল আসাদ, আজিজুল হক বান্নাসহ ছাত্র ইসলামী আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথকভাবে তাঁর জন্যে রক্ষিত শোক বহিতে স্বাক্ষর দান করেন।

ক্ষণজন্মা এ সাধক ১৯১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম হাজী খবির উদ্দিন, মাতার নাম আকলিমুন্নিছা। তিনি ১৯৪৫ সালের শেষভাগে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে রুকনিয়াত লাভ করেন। অতপর বাংলা ও আসাম অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তি স্থাপনে উদ্যোগ নেন। ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর লাহোরস্থ কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ঢাকায় জামায়াতের সেক্রেটারী হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে এ অঞ্চলের প্রথম নির্বাচিত আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সুদীর্ঘ ১৩ বছর এক টানা পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে একটা সময় পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৯ সালের মে মাসে হোটেল ইডেন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-জামায়াতের স্থায়ী ৪-দফা কর্মসূচী অনুযায়ী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি আই. ডি.এল-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

প্রায় দু'মাস পর আই.ডি.এল এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে জামায়াতের ৪র্থ দফা (রাজনৈতিক দফা) আই.ডি.এল-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হোক এবং জামায়াতের কর্মসূচী তিন দফায় সীমাবদ্ধ থাকুক। উল্লেখ যে, ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে জামায়াত তিন দফা ভিত্তিক কাজ করছিল।

এ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কেন্দ্রীয় শূরা ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। মাওলানা আবদুর রহীম শূরার ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে গঠনতন্ত্র মোতাবেক তার রুকনিয়াত বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি ইসলামী ঐক্য আন্দোলন নামে একটি দল গঠন করে আমৃত্যু ইসলামী আন্দোলনের কাজ করে গেছেন।

তাঁর মৃত্যু পরবর্তী মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে আয়োজিত এক স্মরণসভা ও দো'য়ার মাহফিলে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম

আযম বলেন “সংগঠক ও রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুর রহীম ইহজগতে নেই, কিন্তু ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক হিসেবে তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাকে এবং তাঁর সাহিত্যকে কখনো ভুলবেনা। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাই তাঁর সাহিত্যকে বেশী কাজে লাগাবে।”

জামায়াতের দশজন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ ও তৃতীয় জাতীয় সংসদের পরিণতি

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ ও মহা সমাবেশ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহ আগেই সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেন। তার অন্যতম শিকার জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, আওয়ামী লীগের জনাব আবদুল মান্নান ও জনাব জিল্লুর রহমান, বিএনপির কর্ণেল (অব.) অলী আহমদ ও আকবর হোসেন প্রমুখ। জামায়াতের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগপূর্বক প্রেসিডেন্ট এরশাদকে ক্ষমতা ত্যাগের জন্য চাপ দেয়ার প্রস্তাব শেখ হাসিনার নিকট প্রকাশ করা হলে তিনি সম্মত হননি। জেলে বসেও মুজাহিদ সাহেব ঐ প্রস্তাবের পক্ষে লবিং করতে থাকেন। উল্লেখ্য, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে ৮ জন সদস্য কারারুদ্ধ থাকার দরুণ তারা বৈঠকে হাজির হতে পারেননি। ঐ বছরের ৩০ নভেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মান্নান ও ১ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা জনাব মুজাহিদ মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পূর্বে জেলখানায় থেকে মান্নান সাহেব জনাব মুজাহিদকে কথা দেন যে, তার দল যাতে সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়, সে চেষ্টা তিনি করবেন। জেল অফিসে থেকে মুক্তির প্রাক্কালে মুজাহিদ সাহেবের সাথে আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জিল্লুর রহমান জোর দিয়ে বললেন, এ মুহূর্তে সংসদ থেকে পদত্যাগ করাই জরুরি।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তখন গৃহবন্দী ছিলেন। মুজাহিদ সাহেব ২ ডিসেম্বর দিনে ও রাতে দু'বার জনাব জিল্লুর রহমানের সাথে কথা বলায় তিনি পরিষ্কার বললেন, আমরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শুধু নেত্রীর সম্মতির প্রয়োজন, আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিন। পরবর্তী কথা জনাব মুজাহিদের “বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন” শীর্ষক পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি করা হলো -

৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭ আমরা সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। সিদ্ধান্ত হলো, জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। ঐ দিন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দিন। জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা পূর্বক এক নজির স্থাপন করে। গণতন্ত্রের স্বার্থে জনমতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত বিরল দৃষ্টান্ত। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে তদানীন্তন জামায়াত সংসদীয় গ্রুপের নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ১০জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রেসক্লাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু আওয়ামী লীগ পদত্যাগ করলনা। আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলাম। কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা ছাড়া ঐ ঠুঁটো সংসদে থাকার প্রয়োজনীয়তা আজো বুঝতে পারিনি। আওয়ামী লীগকে অবশ্য জোরের সাথেই বলেছিলাম, "পদত্যাগ না করলে আমও যাবে ছালাও যাবে। অর্থাৎ বদনাম কামাবেন, সংসদও ধরে রাখতে পারবেন না। বাস্তবে তাই হয়েছিলো। ৬ ডিসেম্বর রাতে এরশাদ সাহেব আকস্মিকভাবে সংসদ ভেঙ্গে দিলেন বটে, কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হলেন না"। এভাবে তৃতীয় সংসদের অপমৃত্যু ঘটলো।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ, চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। উক্ত নির্বাচন বানচাল করার মতো জোরদার আন্দোলন করা সম্ভবপর না হলেও তিনজোট ও জামায়াত আন্তরিকতার সাথেই নির্বাচন বয়কট করে। শুধু ফ্রিডম পার্টি নির্বাচনে অংশ নেন এবং কর্ণেল (অব.) রশিদ এম.পি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের দিন হরতাল পালন করায় অতি নগণ্যসংখক ভোটার উপস্থিত হয়। অথচ সরকার নির্লজ্জের মতো এ ভোটারবিহীন নির্বাচন সম্পর্কে দাবি করে যে, ৭০% ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ সালের ৪ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ০৩ মার্চের প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন বয়কট করায় দেশবাসীকে মোবারকবাদ জানানো হয়।

বড় বড় দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় এই নির্বাচন দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্য হলো না। কোন না কোন ভাবে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ তখন মরিয়া। ১৯৮৮ সনের ৭ জুন জাতীয় সংসদ তাঁর সিদ্ধান্তে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী পাস করে। 'রাষ্ট্রধর্ম' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে তাতে বলা হয় "ইসলাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম, তবে প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্মও শান্তি ও সম্প্রীতিতে পালন করা যাবে।"

এই সময় মেজর জেনারেল (অব.) সি. আর. দত্তের উদ্যোগে "রাষ্ট্রধর্ম" অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন চালাবার জন্য গঠিত হয় "হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ।"

১৯৮৮ সালের নির্বাচন পরবর্তী মাসগুলোতে দুঃখজনক ও অনাকাংখিত পরিবেশ মুকাবিলা করতে হলো। এরশাদ সাহেবের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল, আন্দোলনের ব্যাপারে জামায়াত সবচেয়ে সিরিয়াস ও আন্তরিক। জামায়াতের কাউকে কিনতে পারা যায় না বা ম্যানেজ করা যায় না। এ জন্য এরশাদ সাহেব জোরে শোরে জামায়াত বিরোধী অভিযানে নেমে পড়লেন। সন্ত্রাসের তাণ্ডব ও বৃদ্ধি পেলো। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এরশাদ বিরোধী বা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন আর হলো না।

১৯৮৯-১৯৯১ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম

১৯৮৯-১৯৯১ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম। ১৯৮৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত জেলা আমীরগণ এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রিত মেহমানগণ উপস্থিত ছিলেন। শপথ গ্রহণের পর অধ্যাপক গোলাম আযম নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন।

প্রথমে তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করেন এবং আল্লাহর নবী, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও অনুসারীদের উদ্দেশ্যে দরুদ ও সালামের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বলেন, "এখানে কেউ দায়িত্ব চেয়ে নেয় না, কিন্তু কারো উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হলে তিনি পালিয়েও যান না।" এবার তাঁর উপর ৫ম বারের মত এমারতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন- যেহেতু তিনি দায়িত্ব চাননি, সেহেতু মেহেরবান আল্লাহর পছন্দ ও সিদ্ধান্ত মনে করেই তিনি এ কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে ভরসা পাচ্ছেন।

তাঁর অসুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এরূপ বাঁধা নেই এমন কারো ওপর দায়িত্ব থাকলে জামায়াতের পক্ষে গণসংগঠনে উত্তোরণ এবং বৃহত্তর সংগঠনে পরিণত হওয়া সহজতর হতো। তবে সম্মানিত রুকনদের (সদস্য) সিদ্ধান্তের পর তিনি আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ নন বলে দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন। তিনি রুকন, কর্মীসহ সকলের নিকট সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে আকুল আবেদন পেশ করেন।

মুহতারাম আমীরে জামায়াত বলেন, "এতায়াতে আমীর এবং সঠিক নিয়মে তানকীদ ও মুহাসাবার মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই; বরং এ দুটো পরস্পর সহায়ক ও পরিপূরক"। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব, পরামর্শ, দৃষ্টি আকর্ষণ ও সময়মতো ভুল সংশোধন করে তাঁকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, "দ্বীনের সকল ব্যাপারেই আমীরের এতায়াত জরুরী, আর এতায়াতের জন্য আমীরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও মহব্বত থাকা আবশ্যক এবং শ্রদ্ধা ও মহাব্বতের জন্যে আমীরের মধ্যে আকর্ষণীয় গুণাবলী

থাকা অপরিহার্য।" এসব আকর্ষণীয় গুণ থাকলে সাহায্য করার জন্যও তিনি সকলের প্রতি আবেদন রাখেন। শুধু মজলিসের বৈঠকেই নয়, বরং বৈঠকের বাইরেও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এবং চিঠি পত্রের মাধ্যমেও এসব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সকলের প্রতি তিনি অনুরোধ করেন। কারো মনে কোন খটকা বা প্রশ্ন সৃষ্টি হলে, তিনি যেন উক্ত খটকা বা প্রশ্ন মনে নিয়ে বসে না থাকেন; বরং খোলা মনে নিজের দ্বীনি ভাই মনে করে সে বিষয়ে তাঁকে জানান এবং খটকা দূর করতে তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সবশেষে, তিনি অনুপস্থিত সকল ভাই-বোনদের কাছে তাঁর এ কথাগুলো পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ রেখে আবারও সকলের দোয়া ও সহাযোগিতা কামনা এবং মেহেরবান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত প্রার্থনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আমীরে জামায়াতের শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণের পর এ উপলক্ষে মজলিসে শূরায় নির্বাচিত প্রবীণ সদস্য মুহতারাম আব্বাস আলী খান এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং দোওয়া করেন।

মুহতারাম আব্বাস আলী খান তাঁর বক্তব্যে জামায়াতকে একটি প্রগতিশীল বিপ্লবী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করেন এবং ধাপে ধাপে সামনে অগ্রসর হয়ে এক স্তর অতিক্রম করে সামনের স্তরে পা বাড়ানোই এর কাজ বলে তিনি উল্লেখ করেন। নির্বাচন এবং বর্তমান কঠিন ও সিদ্ধান্তকারী অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে একমাত্র আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে বলে তিনি আহ্বান জানান। ১৯৭১ এর ঝড়-ঝঞ্ঝার পর বর্তমান স্তরে উন্নীত হতে পারা আল্লাহর রহমতের ফলেই সম্ভব হয়েছে এবং যথার্থ মানে উন্নীত হয়ে ত্যাগ ও কুরবানী করতে পারলে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করবেন বলে তিনি দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন। তিনি নবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণ এবং সকল প্রকার ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করে সকল পর্যায়ে ব্যাপকভাবে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। যা কিছু করার বাকী রয়েছে তা সব যথাযথভাবে করার জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর আল্লাহর সাহায্য ও ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে দোওয়া করা হয়। দোওয়া পরিচালনা করেন মুহতারাম আব্বাস আলী খান। দোওয়া শেষে আমীরে জামায়াতের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মূলতবী অধিবেশনে নবনির্বাচিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে ১৯৮৯-১৯৯১ সেশনের জন্য নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বন্টন করেন।

নায়েবে আমীর

১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ

সেক্রেটারী জেনারেল

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

১। অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
২। জনাব মকবুল আহমাদ
৩। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

* অধ্যাপক গোলাম আযম- আমীরে জামায়াত

১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
৪। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
৫। অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
৬। জনাব মকবুল আহমাদ
৭। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
৮। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
৯। মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী
১০। জনাব বদরে আলম
১১। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ
১২। অধ্যক্ষ মু. আব্দুর রব
১৩। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
১৪। মাওলানা সরদার আব্দুস সালাম
১৫। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান
১৬। জনাব আবু নাসের মোঃ আব্দুজ্জাহের
১৭। জনাব মীর কাসেম আলী
১৮। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা
১৯। জনাব আব্দুল গাফফার
২০। জনাব আবুল আসাদ
২১। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

সপ্তম অধ্যায়

রুশদীর "দি স্যাটানিক ভার্সেস" এর প্রতিবাদে হরতাল পালন

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক সালমান রুশদীর লেখা কুখ্যাত বই 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' এর প্রতিবাদে ১৯৮৯ সালে ২১ মার্চ বাংলাদেশে নজির বিহীন সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। ইতঃপূর্বে কোন রাজনৈতিক ইস্যুতেও এমন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়নি। উক্ত বইয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও বিশ্বনবীর (সা.) বিরুদ্ধে এমন জঘন্য কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হয়, যা কোন অমুসলিম কাফেরও করেনি। ইরানের অবিসংবাদিত নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি মোর্তাদ লেখকের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করায় বৃটেন ও পাশ্চাত্য জগত ঐ ঘৃণ্য লেখকের জীবন রক্ষার জন্য নজীর বিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তারা মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে বিশ্বের প্রায় দেড়শ কোটি মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেয়ার মতো জঘন্য অপরাধীর পৃষ্ঠপোষকতা করে। অথচ বাইবেল কিংবা তাদের যীশুখৃষ্টের বিরুদ্ধে কেউ এ জাতীয় অপরাধ করলে তাদের আইনেই ধর্মদ্রোহী শাস্তির বিধান আছে (ব্লাশফেমী আইন)।

দেশ বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখদের পক্ষ থেকে রূশদীর বিরুদ্ধে হরতাল পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়। জামায়াত ঐ হরতালকে সমর্থন দিয়ে এর সাফল্যের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সেদিন ছোট বড় কোন দোকানই খোলা হয়নি। বলতে গেলে একটি রিকশাও রাস্তায় দেখা যায় নি। অভূতপূর্ব সফল এ হরতাল প্রমাণ করে যে, এদেশের জনগণ মহান আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও কুরআনের বিরুদ্ধে বিষোদগার কোন কিছুই বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। জামায়াতসহ সেদিন দলমত নির্বিশেষে এদেশের তৌহিদী জনতা স্বার্থক ভূমিকা পালন করে। প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে জনগণের ক্ষোভ জামায়াত নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

শ্রীলংকায় ভারতীয় বাহিনীর অভিযানে উদ্বেগ প্রকাশ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী শ্রীলংকায় ভারতীয় বাহিনীর অভিযানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশপূর্বক ৩ জুলাই ১৯৮৯ নিম্নোক্ত যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন-

“সার্কভুক্ত একটি দেশ শ্রীলংকায় বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের আগ্রাসী ভূমিকায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। শ্রীলংকা সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মি. রাজীব গান্ধীর গড়িমসি এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জঙ্গি বিমানের সহযোগিতায় নতুন করে কমান্ডোবাহিনী প্রেরণের ঘটনা থেকে সম্প্রসারণবাদী ভারতের আগ্রাসী ভূমিকার মুখোশ আরেকবার উন্মোচিত হলো। এতদাঞ্চলে শান্তিকামী দেশ শ্রীলংকার উপর ভারতের এ অন্যায় হস্তক্ষেপের আমরা তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

শ্রীলংকায় ভারতের অতিরিক্ত সৈন্যপ্রেরণ প্রমাণ করে যে, ভারত সরকারের উদ্দেশ্য সৎ ও স্বচ্ছ নয়। ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট রানাসিংগে প্রেমাদাশার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান পূর্বক শ্রীলংকার স্বাধীন অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছেন, আমরা গভীর উৎকণ্ঠা ও আশংকা প্রকাশ করছি। শ্রীলংকায় ভারতের অভিযান এই অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত করবে।

আমরা অবিলম্বে সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে শান্তি শৃংখলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রীলংকা থেকে অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিহারী মুসলমানদের পূনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন প্রশ্নে জামায়াত

১৯৭২ সাল থেকে প্রায় তিন লাখ বিহারী মুসলমান বাংলাদেশের ৬৬টি ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দীক্ষার সুযোগদানতো দূরের কথা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ও চিকিৎসার ন্যায় মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন থেকে তারা বঞ্চিত। তারা সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন। ইতোমধ্যেই অনাহার ও অপুষ্টিতে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে বহু নারী ও শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। রাবেতা আলমে আল ইসলামীর মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারকে উক্ত ছিন্নমূল জনগোষ্ঠিকে গ্রহণ ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য ২৭ মার্চ ১৯৮৮ পর্যন্ত জামায়াত নেতৃবৃন্দ রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেলকে একাধিকবার জরুরি তারবর্তা প্রেরণ করেছেন। এ সমস্যা সমাধানে ০৮ জুলাই ১৯৮৯ তারিখে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম যে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন তা হলো-

“আটকে পড়া পাকিস্তানীদের সমস্যা দীর্ঘ দেড় যুগেও কোন সুরাহা না হওয়ায় আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। মুসলিম উম্মাহর এ ক্ষুদ্র অংশটি চরম উদ্বেগ

ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে তারা যে মানবেতর জীবনযাপন করছে তা উম্মাহর জন্য দুঃখ ও লজ্জাজনক।

পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের আশায় একটি প্রজন্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে আরেকটি প্রজন্মও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আমরা মনে করি কথিত বিহারীদের প্রত্যাবাসনের বিষয়টি স্বীকৃত হবার পরেও তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের টালবাহানা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

এ প্রসংগে উল্লেখ করতে চাই যে, মক্কাভিত্তিক রাবেতার প্রচেষ্টায় বিষয়টি সুরাহা করার জন্য পাকিস্তান সরকার এবং রাবেতার যৌথ চুক্তি অনুযায়ী একটি ট্রাস্ট গঠনের পরেও বিষয়টির ব্যাপারে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এটা সুস্পষ্ট যে বিষয়টি নিয়ে অহেতুক বিলম্ব করা হচ্ছে।

বিহারীদের প্রত্যাবাসনের বিষয়টিকে কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ না করে শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনাপূর্বক তাদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।"

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে মজলিসে শূরা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক সম্মেলন ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ রাতে শেষ হয়। পাঁচদিন ব্যাপী বিভিন্ন অধিবেশনে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা ছাড়াও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমাপনী দিবসে বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বৈরিতামূলক আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ পূর্বক নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতা মূলক হবার পরিবর্তে আধিপত্যবাদী মানসিকতারই পরিচায়ক হয়েছে। উভয়দেশের দ্বি-পাক্ষিক বহু বিষয় অমীমাংসিত রেখে বাংলাদেশকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। যেমন বাংলাদেশের জীবনমরন সমস্যা ফারাক্কা বাঁধ ছাড়াও আরো বহু বাঁধ ও গ্রোয়েন নির্মাণ করে একদিকে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করা এবং অপরদিকে বর্ষাকালে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের জনগণের জানমাল খাদ্য ও পশু সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের ন্যায্য প্রাপ্ত দক্ষিণ তালপট্টি, তিনবিঘা করিডোর প্রভৃতি বিষয়গুলো বছরের পর বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের কতিপয় লোককে বিভ্রান্ত করে তাদেরকে ভারতে ডেকে নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি কিছুকাল যাবত ভারতের স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন পুনরায় জোরে শোরে চালানো হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশের জন্য বহুমুখী সমস্যা ভারত সৃষ্টি করে চলেছে। শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও নেপালের প্রতি ভারত সরকারের আচরণ থেকে তার সম্প্রসারণবাদী মানসিকতাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। যা' প্রতিবেশী দেশেগুলোর বিশেষকরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বিরাট হুমকি সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রী ভি.পি.সিং ইতোমধ্যেই প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মজলিসে শূরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর এ সদিচ্ছাকে স্বাগত জানাচ্ছে। মজলিসে শূরা আশা করে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে অবনতির ঘটতে পারে এমন বিষয়গুলোর সন্তোষজনক ও সুবিচারপূর্ণ মীমাংশার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মানবতার দৃষ্টিকোন থেকে আর একটি বিষয়ের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তার নৈতিক দায়িত্ব মনে করছে। তাহলো ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি সংখ্যাগুরু বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের শতাব্দীলালিত অমানবিক আচরণ। একটি বিশেষমহল পরিকল্পিত উপায়ে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের জানমাল ইজ্জত আবরু সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন এবং তাদেরকে সকল মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ভারতের অতীতের সরকারগুলো এ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

উপরুন্ত স্বাধীনতার (১৯৪৭) পর থেকে এ যাবত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সাথে সাথে বহু মসজিদ থেকে মুসলমানদেরকে বেদখল করা হয়েছে। দীর্ঘকাল থেকে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদকে অন্যায়ভাবে বিতর্কিত বিস্ময় পরিণত করে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার ইন্ধন যোগানো হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের এবং সে সাথে ভারতের সংখ্যালঘুদেরকে পূর্ণ নাগরিক মর্যাদা দানের জন্য ভারত সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।"

ইসলামী ঐক্যের জন্য জামায়াতের সর্বাত্মক প্রয়াস

যে কোন দেশের তৌহিদী জনতা ইসলামী ঐক্যের জন্য পাগলপরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, কায়েমী স্বার্থবাদী ও সংকীর্ণমনা কতিপয় ওলামা-মাশায়েখ এবং ওলামায়ে ছু' এর জন্য অনেক দেশে কোন কোন যুগে জনতার প্রত্যাশানুযায়ী এ ঐক্য প্রচেষ্টা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য যার আজীবন স্বপ্ন ও সাধনা ছিল, সেই উদারচেতা বর্ষিয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম বিরচিত দু'একটা পুস্তিকা পাঠ করলে এ সংক্রান্ত সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভবপর।[৬] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সব সময়েই উপলব্ধি করেছে, বাংলাদেশে বিরাট ইসলামী শক্তি রয়েছে, কিন্তু সে সব শক্তি যথাযথ সংগঠিত নয়। যে কয়টি সংগঠন সক্রিয় রয়েছে, তাদের মধ্যে ও ঐক্য এবং আন্তরিকতা না থাকায় ইসলামী শক্তি রাজনৈতিক ময়দানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না।

বাংলাদেশে ইশয়াতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনের সফল রূপকার বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পূরোধা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ঐকান্তিক উদ্যোগে ১৯৭৯ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সকল দ্বীনি মহলের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৮১ সালে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রমুখের নেতৃত্বে ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ নামে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্যমঞ্চ গঠিত হবার পর তা অনেক দূর অগ্রসর হলেও কাংখিত মনযিলে পৌছতে পারেনি। তাই বলে ইত্তেহাদুল উম্মাহর ভূমিকা ও অর্জনকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। আরো একটি ঐক্য প্রচেষ্টা সন্তোষজনক সফলতা লাভ না করলেও আশির দশকে ইসলামী খিলাফত আন্দোলন ও শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে নতুন কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের উন্মেষ ঘটেছে। এতে অবশ্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হলেও দ্বিধাগ্রস্ত আলেম সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সাংগঠনিক তৎপরতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করে।

---

[৬] বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস (১৯৭৮-২০০৫) * ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা/ ইসলামী ঐক্য মঞ্চ চাই–১৯৯৪/১৯৯৮ সাল।

ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াতের নীতি

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর (রহ.) (১৯০৩-৭৯) সময় থেকেই সকল ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াত নিষ্ঠার সাথে এ নীতি মেনে চলছে যে:

১. জামায়াত কোনো ইসলামী দল ও নেতা সম্পর্কে সাধারণত: কখনো কোন রকম বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে না।
২. ইসলামের নামে কর্মরত কোনো দলের বা নেতার পক্ষ থেকে জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক মন্তব্য করা হলেও জামায়াতের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমন করা হয়না। অবশ্য মন্তব্যে কোন ভুল বা তোহমত থাকলে অত্যন্ত শালীন ভাষায় তা' প্রকাশ করা হয় কিংবা প্রতিবাদ জানোনা হয়।
৩. যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করেন তাদের ব্যাপারে জামায়াত চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে। ঐ ফতোয়ার উদ্দেশ্য যেহেতু ভুল ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করা নয়, বরং জনগণকে বিভ্রান্ত করে জামায়াতে ইসলামী থেকে দূরে রাখার হীন প্রয়াস।
৪. জামায়াত কোনো ইসলামী দল ও নেতার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়না। কেউ বৈঠক করতে চাইলেও জামায়াত তাতে সাড়া দেয়না। কারণ বাহাস বিতর্ক দ্বারা কোনো বিরোধই মীমাংসা হয় না, তাতে ঝগড়া বাড়ে মাত্র।
৫. কেউ যদি যুক্তি সহকারে জামায়াতের কোন ভুল ধরিয়ে দেন, তাহলে জামায়াত সেজন্য তার শোকরিয়া জানায়। অত:পর হয় ভুলটা সংশোধন করে নেয়া হয়, নয়ত যুক্তিপ্রমাণ সহকারে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় যে ওটা প্রকৃতপক্ষে ভুল নয়।

প্রসংগতঃ একথা উল্লেখ করা যায় যে, জামায়াতে ইসলামী শুধু তার দলীয় কর্মী সম্মেলন নয়, সাধারণ সভা ও উপস্থিত শ্রোতাদেরকে যে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়, এবং এজন্য কাগজ সরবরাহ পূর্বক জবাবদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেয়া হয়।

১. জামায়াত কোন ইসলামী দলকেই দুশমন মনে করে না। বরং দ্বীনের পক্ষে সহযোগী হিসেবেই সকলকে পেতে চায়।
২. ইসলামের নামে প্রকাশ্যে বির্তক ও ঝগড়া হলে তাতে ইসলামের দুশমন মহলই খুশী হয় এবং তাতে ইসলামের মর্যাদার হানি হয়।
৩. জামায়াত সকল ইসলামী শক্তির মধ্যে মযবুত ঐক্য চায়, তাই কোন ইসলামী দলের সাথেই জামায়াত সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না।
৪. কোন ইসলামী দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করাকে জামায়াত সময় ও শ্রমের অপচয় বলে মনে করে। জামায়াত ইসলামের পক্ষে সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে চয়।

ছারছীনার পীর মাওলানা আবু জাফর সাহেবের ইন্তেকালে জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযমের শোক প্রকাশ

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ছারছীনার পীর হযরত মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ পূর্বক ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ সালে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন-

"ছারছীনার খ্যাতনামা পীর হযরত মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ এর ইন্তেকালে আমি গভীরভাবে শোকাহত (ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তেকালে আমরা ইসলামের এক মহান খাদেমকে হারালাম। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ক্ষেত্রে মরহুম যে অবদান রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। মরহুমের সাথে যতবারই সাক্ষাৎ হয়েছে, দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে তাঁর পেরেশানী গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি। ইকামতে দ্বীনের ব্যাপারে আলেম-ওলামাদের প্রতি ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে আহবান তিনি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিভিন্ন মাহফিলে জানিয়েছেন তার মাধ্যমেই স্পষ্ট বুঝা যায় আল্লাহর দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে তিনি কতটা আন্তরিক ও পেরেশান ছিলেন।

মরহুম শুধু একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বুজুর্গই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান সমতুল্য। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অগনিত মানুষ আল্লাহর দ্বীনের আলো পেয়েছে। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলীয়া কামিল মাদরাসা ছাড়াও সারাদেশে তাঁর আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত শতাধিক মাদরাসা মক্তব ও মসজিদ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার আলেম তৈরী হচ্ছে। এভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি যে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, সে জন্য জাতি তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আমি অন্তরদিয়ে দোয়া করছি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাঁকে আনাইন্নীনে স্থান দান করেন"।

সবশেষে আমীরে জামায়াত মরহুম পীর সাহেব কেবলার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও মুরীদান এবং ভক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেমে দ্বীন ও মোফাসরিরে কুরআন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রমুখ পৃথক বিবৃতিতে মরহুম পীর সাহেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

কওমী মাদরাসার উস্তাদগণের প্রতি অধ্যাপক গোলাম আযমের মাওলানা মওদূদী (রহ.) রচিত সাহিত্য অধ্যয়নের আহ্বান

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম ইকামাতে দ্বীন ও ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে বহু ওলামা সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন এবং বহু পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। নিম্নে তাঁর এ ধরনের একটি লেখনি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া গেল:

'আপনারা আল্লাহর রহমতে আলেম হওয়ার কারণে কুরআন সুন্নাহর আলোকে যে কোন কিতাব পড়ে তা যাচাই বাছাই করার যোগ্যতা রাখেন। কোন কিতাবে কোন কথাটি সহীহ সনদ পূর্ণ তা বিচার করার তাওফীক আল্লাহ আপনাদেরকে দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী প্রণীত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন ও ইসলামী সাহিত্য পড়লেই আপনাদের গোমরাহ হয়ে যাবার কোন ভয় নেই। আপনাদের কয়েকজন আকারিনের কিছু বিরূপ মন্তব্যের দরুন আপনারা মাওলানা মওদূদীর রচিত বই কিতাবাদি সতর্কতার সাথে এড়িয়ে চলছেন জেনে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

দেশ-বিদেশে আলেমে দ্বীন হিসেবে পরিচিত ও নন্দিত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন প্রমুখ আলিয়া নেসারে শিক্ষিত ওলামাদের এ বিরাট সংখ্যা জামায়াতে ইসলামীতে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করছে। (বলা বাহুল্য মাওলানা মওদূদী রচিত সাহিত্য তাদেরকে এ পর্যায়ে উন্নীত হতে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করেছে) তাদের সুযোগ্য অধ্যাপনায় কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি শিক্ষালাভ পূর্বক সংশ্লিষ্ট মাদরাসার ছাত্রছাত্রীরা সর্বোচ্চ মেধায় উত্তীর্ণ হচ্ছে।

'আমার স্থির বিশ্বাস, আপনারা যদি মাওলানা মওদূদী রচিত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তাহলে এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। আধুনিক যুগে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মোকাবিলায় ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে সমাজকে শান্তি, মুক্তি তথা উন্নত করতে পারে, সুদবিহীন ব্যাংক কিভাবে চলতে পারে, সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ না পেলে সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান আর কোথায় পাবেন'?

আমাদের মতো লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিত লোক ইসলামের সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞানার্জনের যে মহা সুযোগ লাভ করেছে, মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ ছাড়া তা সম্ভব হতনা। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ইসলামী জ্ঞান চর্চা করছে। বাস্তবজীবনে

ইসলামকে অনুসরণ করছে এবং দেশে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে গিয়ে আল্লাহর পথে শহীদও হচ্ছে। ইসলামের চিহ্নিত দুশমনদের শত বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মওদূদীর (রহ.) সাহিত্যই তাদেরকে আল্লাহর পথে শহীদ হবার এ জযবা যুগিয়েছে।

কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে আবার যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৯ সনের অক্টোবর মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, বামদের ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চাংগা হয়ে ওঠে। অনেক বিলম্বে হলেও জামায়াতে ইসলামীর কেয়ারটেকার সরকারের দাবি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়।

১৯৯০ সনের ১৯ নভেম্বর বিকেলে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক সমাবেশ থেকে ৮ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট, ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা প্রকাশ করে। ১৯৯০ সনের ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কারফিউ জারি করা হয়। ছাত্র-জনতা কারফিউ ভেংগে মিছিল করতে থাকে।

১৯৯০ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশার অগণিত লোক ঢাকা মহানগরীর রাজপথগুলো মিছিলে মিছিলে ভরে দেয়। ১৯৯০ সনের ৫ ডিসেম্বর বিরোধী দলগুলো সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে কেয়ারটেকার প্রধান করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঐদিনই জাতীয় সংসদ ভেংগে দেন।

১৯৯০ সনের ৬ ডিসেম্বর ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে, তাঁকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বানিয়ে নিজে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন।

জেনারেল এরশাদের পতন ও পদত্যাগ প্রসঙ্গ- ১৯৯০

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চালান এবং দেশে বহু দলীয় রাজনীতি চালু করার পদক্ষেপ নেন। গণতন্ত্র অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এগুতে থাকে। ১৯৮২সালে মার্চ মাসে ক্ষমতা লিপ্সু সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সুকৌশলে সামরিক শাসন

জারি করে শিশু গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যাপূর্বক ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে আসীন হন।

জেনারেল এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলোর মতপার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করেন। নির্বাচনী প্রহসনের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট বিরোধী নেতা-নেত্রীর সাথে সুক্ষ্ম আতাঁত করে ধর্মের নামে রাজনীতি চর্চা করে এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠ পোষকতার জোরে তিনি নয় বছর (১৯৮২-৯০) স্বৈরশাসন অনেকটা দাপটের সাথে চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

অবশেষে ১৯৯০ সালে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচনের ফর্মুলায় জামায়াতসহ সকল দল ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় প্রবল গণ-অভ্যূত্থান ঘটে। ৫ ডিসেম্বর (১৯৯০) তিন জোট ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সারা দিন কাটে একজন অস্থায়ী ও তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রপতির নাম ঠিক করতে। সমকালীণ ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। সর্বসম্মতিক্রমে কেয়ারটেকার সরকার প্রধান হিসেবে দেশের প্রধান বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদের নাম ঠিক হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য: জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৮০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্রদের ওপর গুলীবর্ষনের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশন এবং ১৯৮২ ঘঠিত জাতীয় পে- কমিশনের তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে দেশের বিক্ষুব্ধ জনতার আপোষহীন সংগ্রামে এরশাদের যখন ত্রিশংকু অবস্থা, সেনাবাহিনী তখন একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল নূরুদ্দিন খান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়াল এডমিরাল আমীর আহমদ মোস্তফা ও বিমান বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এয়ার কমোডর ইরফান উদ্দিনসহ সশস্ত্রবাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতায় ভূমিকা পালন করে। গুজব ছিল, শেষ চেষ্টা হিসেবে সামরিক আইন জারী করে আরো কয়েক দিন ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিলেন জেনারেল এরশাদ। কিন্তু পূর্ববর্তী রাত থেকে স্বৈরাচারের পদত্যাগ বি.বি.সি'র সংবাদ শুনেই উৎফুল্ল জনতা তখন রাজপথে তাজা প্রাণ ও উদ্বেগাকুল হৃদয় মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সশস্ত্র বাহিনী রাজী হয়নি এরশাদের শেষ খায়েশ পূরন করতে।

০৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে অনেকটা বাধ্য হয়ে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করেন জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তিনি ক্যান্টনমেন্ট থেকে গাড়ীতে পতাকা উড়িয়ে এলেন, গেলেন পতাকা নামিয়ে, বিকেল তখন পৌনে তিনটা।

অষ্টম অধ্যায়

ইরাকের কুয়েত দখলে জামায়াতের প্রতিক্রিয়া

১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন রাতের আঁধারে তাঁর ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশ কুয়েত বিনা বাধায় দখল করে নেয়। আমেরিকা কুয়েত উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত কৌশলের সাথে সকল মুসলিম দেশ থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তা চেয়ে সাদ্দামকে মুসলিম উম্মাহর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলেন। সাদ্দাম হোসেনও অত্যন্ত চালাকির সাথে ইসরাইলের প্রতি কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্রে নিক্ষেপ পূর্বক প্রমান করতে চাইলেন, তিনি ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চান বলেই পুঁজিবাদী আমেরিকা মুসলিম উম্মাহর কট্টর দুশমন ইহুদী রাষ্ট্রটিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সাদ্দামের কুয়েত দখলকে জঘন্য হঠকারী ও আত্মঘাতী বিবেচনায় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে করলো। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট জামায়াতের তৎকালীন নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের নেতৃত্বে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে মহানগরী আমীর জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার সভাপতিত্বে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত এক বিরাট প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক সমূহ প্রদক্ষিণ করে এবং কুয়েত থেকে অবিলম্বে ইরাকী বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ১২ আগস্ট বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ১৫ আগস্ট মহানগরী জামায়াত এবং পরবর্তীকালে আরো বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারণলিপি পেশ করা হয়।

ঢাকাস্থ তৎকালীন কুয়েতী রাষ্ট্রদূত শায়েখ মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল নাজয়ানের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তৎকালীন আমীরে জামায়াত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সৌদী আরবের জেদ্দায় প্রবাসী কুয়েতী আমীর আশ-শায়েখ জাবের আল আহমদ আল সাবাহকে সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি দেন। জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও কুয়েতী আমীর ও সৌদী সরকারকে চিঠি দেন। ঐ সকল চিঠি ও জামায়াত-শিবিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভা ও বিবৃতির এক সংকলন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বৈদেশিক বিভাগ থেকে আরবী ভাষায় উপসাগরীর সংকট জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে প্রকাশিত হয়। কুয়েতী ও সৌদীরা উহা পাঠ করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সঠিক ও সময়োচিত ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে।

৫ম সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠনে জামায়াতের ঐতিহাসিক ভূমিকা

১৯৯১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৭৬টি রাজনৈতিক দলের ২৩৬৩ জন প্রার্থী ছাড়াও ৪২৪জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ঐ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি ১৪০টি, আওয়ামীলীগ ৮৮টি, এরশাদের জাতীয় পার্টি ৩৫টি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন লাভ করে। অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বাকী ১৯টি আসনে জয়ী হয়।

জামায়াত ২২২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ১৮টি আসন পায়; কিন্তু মহান আল্লাহ এ ১৮টি আসনেই ৩০০ আসন বিশিষ্ট সংসদে এমন ব্যালেন্স অব পাওয়ার এর মর্যাদা দিলেন যে, সরকার গঠন করার জন্য বিএনপি ও আওয়ামীলীগ এর মত বড় দলকে জামায়াতের কাছে ধর্না দিতে হয়েছে।

বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব

বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব সংক্রান্ত ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত লেখা "জীবনে যা দেখলাম" বইয়ে যা বলেছেন- "১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দিবাগত সারারাতই নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল টেলিভিশনে ঘোষণা হতে থাকায় কোন দল কত আসন পেলো, তা' জানা হয়ে গেল। পরেরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি আমার পূরনো বন্ধু (সাবেক মন্ত্রী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর) ড. জি. ডব্লিউ চৌধূরী বিনা খবরে হাজির হয়ে গেলেন। আমি বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, আমার ছাত্র সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরুদ্দীন খানের পক্ষ থেকে আসতে হলো। ব্যাপার কী জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, নির্বাচনের ফলাফল আপনাদের হাতে সরকার গঠনের ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। আপনারা সমর্থন দিলেই বিএনপি সরকার গঠন করতে পারে। আরো বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেনাপ্রধান কেন এ বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে চান? তিনি বললেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন সফল করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই জনগণ যে দলকে সবচেয়ে বেশী আসনে বিজয়ী করেছে, সে দলেরই ক্ষমতাশীল হওয়া উচিত বলে সেনাপ্রধান মনে করেন। আমি বললাম, বিএনপি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসুক, তিনি বললেন, সেনাপ্রধান আপনার সাথে আজই দেখা করতে চান। বললাম তিনি কেমন করে আমার সাথে দেখা করবেন? ড. চৌধুরী বললেন! আপনাকে আমি সেনাপ্রধানের বাসায় নিয়ে যাব। বললাম আমার

গাড়ীতে আমি সেনানিবাসে যাব না। তিনি বললেন আমার গাড়ীতেই নিয়ে যাব। সেদিনই সন্ধ্যার পর সেনাপ্রধানের সরকারি বাসবভনে পৌছলাম। আমার সাথে এর পূর্বে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। হাত মিলিয়ে প্রথমেই তিনি বললেন, আপনি আমার মুরুব্বী স্থানীয়, আপনার ভাই ডা. গোলাম মুয়াজ্জাম আমার বিয়েতে কনেপক্ষের উকিল ছিলেন। তিনি আমার উকিল বাবা। তিনি আপনার ছোট না বড় জানি না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. বুরহান উদ্দীন আমার শ্বশুর। আমি খুশি হয়ে বললাম বেশ, আত্মীয়তার সম্পর্কও পাওয়া গেল।

সেনাপ্রধান ধীরেসুস্থে বলে চললেন, দেশে এবারই প্রথম চমৎকার নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনের পূর্ব থেকেই ভারতের 'র' প্রধান বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। আমার ভয় হয় যে, সরকার গঠনে বিলম্ব হলে স্বতন্ত্রভাবে ও ক্ষুদ্র দলের নির্বাচিত এমপিদের অর্থের বিনিময়ে প্রলুব্ধ করে তারা তাদের পছন্দনীয় সরকার কায়েম করতে পারে। যদি সরকার গঠন করা না যায়, তাহলে সশস্ত্রবাহিনীকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হতে হবে। যারা এমপি হয়েছেন এবং যারা মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন, তারা সেনা শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষিপ্ত করবেন। তখন লাখ খানেক বাহিনী নিয়ে ১০/১১ কোটি মানুষকে সামলানো সম্ভব হবে না। দেশও ধ্বংস হবে, সেনাবাহিনী গণরোষের শিকার হবে। এই অরাজকতা পূর্ণ ও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঠেকাতে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনের অধিকারী দলকে যদি আপনি সরকার গঠনে সহযোগিতা করেন, তাহলে গণতন্ত্র বহাল থাকবে, এবং দেশ সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে বেঁচে যাবে। আমি বললাম, যদি ঐ দলটি আমাদের সহযোগিতা চান, তাহলে তারা যোগাযোগ করতে পারে। তাদেরকে ফরমালি লিখিতভাবে সহযোগিতা চাইতে বলুন। আমরা বিবেচনা করব। আমার দলের সাথে পরামর্শ ছাড়া আমি এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না। তিনি বললেন, আপনি চাইলে আজই বেগম জিয়ার সাথে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হতে পারে। বিদায়ের সময় বার বার তিনি অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করলেন, আর আমি তাদের পক্ষ থেকে লিখিত অনুরোধের কথাই বললাম।[৭]

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, আমাদের দেশে জামায়াতের বিরুদ্ধে অন্যতম মুখরোচক অভিযোগ এই যে, জামায়াত একবার বিএনপি এর সাথে ও আরেকবার আওয়ামীলীগ এর সহযোগিতায় যায়। প্রকৃত পক্ষে যে কথাটি উল্টো করে বললে কিছুটা ঠিক হয়। ক্ষমতায় যাবার প্রয়োজনে নব্বই এর দশকে বিএনপি ও আওয়ামীলীগ জামায়াতের কাছে এসেছে। ইতঃপূর্বে স্বৈরাচার হঠাতে

---

[৭] অধ্যাপক গোলাম আযম 'জীবনে যা দেখলাম'।

আওয়ামী-বিএনপি জামায়াত সমান্তরালে থেকে জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আবার কেয়ারটেকার সরকারকে সংবিধানভূক্ত করতে আওয়ামীলীগ-জামায়াত ও জাতীয় পার্টি বিএনপি'র বিরুদ্ধে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছে।

আওয়ামী লীগ-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব

১৯৯১ সালের মার্চ মাসের শুরুতে কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বিবৃতি দিলেন, কোন রাজনৈতিক দলই জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ট আসন লাভ করেনি। এ অবস্থায় সরকার গঠনে সমস্যা রয়েছে। কোন দল সংখ্যা গরিষ্ঠ এম.পি'র সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত সরকার গঠনের জন্য তিনি কাউকে আহ্বান জানাতে পারছেন না।

জাতীয় সংসদে ব্যালেন্স অব পাওয়ার জামায়াতের হাতে আসায় সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনের অধিকারী বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াতের সমর্থন লাভের আশা করা স্বাভাবিক। জামায়াতের সমর্থনই বিএনপি'র নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আওয়ামীলীগ ও জামায়াতের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে আগ্রহী হয়ে গেল। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ ১৯৯১ এর পার্লামেন্ট নির্বাচনের পরে জাতীয় পার্টির একজন প্রবীন নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। জামায়াত, জাতীয় পার্টি এবং গণতন্ত্রী পার্টি থেকে নির্বাচিত সুরঞ্জিত সেন গুপ্তসহ আরো ১৭ জন নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে। কিন্তু বিএনপি'কে ছাড়া জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কোয়ালীশন সরকার গঠনে কোন সাড়া দেয়নি। এই সময়ে আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আমির হোসেন আমু, জামায়াত নেতা আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে বড় মগবাজার দৈনিক সংগ্রাম ভবনে আসেন। তিনি মুজাহিদ সাহেব থেকে জানতে চাইলেন "আপনারা কয়টা মন্ত্রীত্ব ও কয়টা মহিলা আসন পেতে চান? আমরা আপনাদের সাথে মিলে সরকার গঠনে আগ্রহী"। মুজাহিদ সাহেব বললেন, আমরা সম্মত হলেও সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বললেন আমরা জাতীয় পার্টিকে ম্যানেজ করে ফেলেছি। মুজাহিদ সাহেব ঠাট্টা করে বললেন 'আগে তারা আপনাদের ম্যানেজ করত, এখন আপনারা করছেন'। কিন্তু তার পরেও সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়না। তিন দল (আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত) মিলে ১৪১ আসন হয়। তারা কতক ছোট দল ও স্বতন্ত্র থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা যোগাড় করতে পারবেন বলে জানালেন আমু সাহেব। জামায়াতের সম্মতি না পেলে এ জাতীয় কোয়ালীশন

সম্ভবপর নয়। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুজাহিদ সাহেব দলের সাথে আলোচনা না করে কোনো মতামত দিতে অক্ষম বলে জানিয়ে দিয়ে আমু সাহেবকে বিদায় করলেন। পরবর্তীকালে আওয়ামীলীগের অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক তুখোর ছাত্রনেতা জনাব তোফায়েল আহমদ অনেক সময়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে বন্ধুত্বের (সতীর্থ) খাতিরে কথা প্রসংগে বলতেন, নিজামী সাহেব, আপনারা ভুল করেছেন, আমাদের সাথে এলে ৭টি মহিলা সিট পেতেন।[৮]

জামায়াত কর্তৃক ক্ষমতার রাজনীতি বর্জনের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত

ওদিকে আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি প্রভাবশালী মহল জামায়াতের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করেই বিএনপি'র নিকট জামায়াতের জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয় দাবি করলেন। তাঁরা অধ্যাপক গোলাম আযমকে জানান, তিনটি মন্ত্রণালয়ের বেশী দিতে সম্মত করা গেল না।

জামায়াত কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় আদৌ শরীক হবে কিনা, সে বিষয়ে তাদের মতামত না জেনেই তারা বিএনপি'র সাথে মন্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে দর কষাকষি পর্যন্ত করে ফেললেন। এতবড় সুযোগ কোন রাজনৈতিক দল ছেড়ে দিতে পারে না বলে ধারনাই স্বাভাবিক। ক্ষমতায় শরীক হবার এ মহাসুযোগে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বেশী সংখ্যায় মন্ত্রীত্ব ও সংসদে মহিলা আসন দাবি করতে পারত এবং তা' আদায় করাও সম্ভবপর ছিল। এ দাবি মোটেই অযৌক্তিক ও অগ্রাহ্য করার মত ছিল না। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার রাজনীতি করে না। যদিও রাজনৈতিক ঈর্ষা-বিদ্বেষ অজ্ঞতা বশতঃ কেউ কেউ জামায়াত সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করে বসে। মহানবী (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যেই জামায়াত তৎপর।

১৯৯১ সালে ক্ষমতায় শরীক হবার এতবড় সুযোগকে গ্রহণ না করায় জামায়াতের কোন কোন শুভাকাঙ্ক্ষী এটা জামায়াতের মস্তবড় ভুল ও বোকামী বলেও মন্তব্য করতে ছাড়েনি। তাদের ধারণা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সহজেই বহাল হতো এবং এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে প্রায় বছর দেড়েক জেল খাটতে হতো না। গণ আদালতীরা এতটা প্রশ্রয় পেতো না এবং জমায়াত - শিবিরের অতগুলো তাজাপ্রাণ এই সময়ে (১৯৯১-৯৬) শহীদ হতো না। প্রকৃত পক্ষে জামায়াতের হিসাব নিকাশ অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা। জামায়াত নীতি নৈতিকতা এবং আদর্শের রাজনীতি করে। স্বার্থ বা প্রলোভনের রাজনীতি করে না।

---

[৮] মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী'র সংসদীয় ভাষণঃ ৯ মার্চ, ২০০৩।

একটি অনানুষ্ঠানিক ঐতিহাসিক সমঝোতা বৈঠক

১৯৯১ সালের ৮ মার্চ রাত ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. গোলাম ওয়াহিদ চৌধূরীর বাসায় এক অনানুষ্ঠানিক ও ব্যতিক্রমধর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ও সেনাপ্রধান জেনারেল নূরুদ্দীন খান ড. চৌধূরীর প্রাক্তন ছাত্র বিধায় বেগম জিয়ার সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের তিনিই এভাবে সাক্ষাতের দায়িত্ব নিলেন। উক্ত রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও জামায়াতের ১৮ জন এমপির প্রতিনিধি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। অধ্যাপক চৌধুরী বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও আলোচনায় শরীক ছিলেন না। মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালনের জন্য জেনারেল নূরুদ্দীন খান আলোচনায় অংশ নেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কাছে সরকার গঠনে সম্ভাব্য সহযোগিতার জবাবে তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বেগম জিয়াকে জানিয়ে দিলেন। আপনি এককভাবে সরকার গঠন করুন, মন্ত্রীত্বের প্রতি, ক্ষমতার প্রতি, আমাদের লোভ নেই। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমরা আপনাকে সরকার গঠনে নিঃশর্ত সমর্থন জানাচ্ছি। আমাদের দলীয় কোন স্বার্থই দাবি করা হচ্ছে না। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মধ্যে আনুপাতিকহারে জামায়াতে কমপক্ষে ৩টি প্রাপ্য ছিল। এ ক্ষেত্রেও জেনারেল খানের মধ্যস্থতায় জামায়াত মাত্র দুটো আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ১১ সেপ্টেম্বর (৯১) অনুষ্ঠিতব্য সংসদের ১০টি আসনের উপনির্বাচনে মাত্র দুটি আসনে বিএনটি যেন প্রার্থী দাঁড় না করায় এ প্রস্তাবে বেগম জিয়া সম্মতি দিলেন। অতঃপর পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করে সবাই স্ব-স্ব বাসায় চলে যান।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের সাথে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার

সেনাপ্রধানের উপস্থিতিতে বেগম জিয়ার সাথে জামায়াত প্রধানের সাক্ষাতের পরদিন ৯ মার্চ' ৯১ ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে বঙ্গবভনে সাক্ষাৎ করতে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সর্বজনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি. আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, এডভোকেট শেখ আনসার আলী এমপি. ও আব্দুল কাদের মোল্লা।

প্রেসিডেন্ট বললেন, জানতে পারলাম আপনারা নাকি বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দিচ্ছেন। খান সাহেব ইতিবাচক জবাব দিলে প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনারা লিখিতভাবে আমাকে জানান। খান সাহেব বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামিকালই আমরা আপনাকে লিখিতভাবে জানাব। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে এসেছি। জামায়াতের নির্বাচিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। অন্যায়ভাবে হরনকৃত তাঁর নাগরিক অধিকার বহাল করার জন্য বিগত ১৫ বছর (১৯৭৬-৯১) ধরে দাবি জানানো হচ্ছে। আশা করি, বিচারপতি হিসেবে আপনি সুবিচার করবেন। রাজনৈতিক সরকারের নিকট সুবিচার আশা করা যায় না।

প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি অধ্যাপক আযম সাহেবের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ফাইলটি ভালভাবে দেখেছি। আমার বুঝেই আসে না যে, তাঁর নাগরিকত্ব এত দিন পর্যন্ত কেন বহাল হল না। আমি ওয়াদা করছি, সরকার গঠনপূর্বক জাতীয় সংসদকে চালু করার আসল দায়িত্ব পালন করার পরে আমি এ কাজ অবশ্যই করব। আমি কখনো ওয়াদা খেলাফ করি না। যে ওয়াদা খেলাফ করে সে মুনাফিক, আর মুনাফিক কাফেরের চেয়েও খারাপ, ঘৃণ্য। এ বিষয়ে আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকুন।

অতঃপর ১১ মার্চ '৯১ প্রেসিডেন্টের সাথে পরবর্তী সাক্ষাৎকারে জামায়াত সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আশংকা প্রকাশ করে ছিলেন যে, সরকার গঠন হয়ে গেলে জামায়াত প্রধানের নাগরিকত্ব বহাল করার ব্যাপারে বিএনপি বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এটা আমার দায়িত্ব, যদি তারা আপত্তি করেন তাহলে আমি বলতে বাধ্য হব, "It is not your business".

সরকার পদ্ধতি নিয়ে সমস্যা ও তার সমাধান

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও আওয়ামীলীগ পার্লামেন্টারী সরকারের পক্ষে ছিল, কিন্তু বিএনপি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির পক্ষে। সরকার পদ্ধতি নিয়ে এই মত পার্থক্যের দরুন নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে এক রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকারের বিধানই ছিল। ১৯৭৫ সালে তৎকালীণ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত এ পদ্ধতিই চালু ছিল। ঐ বছর সংসদ

নির্বাচনের পরে নির্বাচিত দলগুলোর মধ্যে সরকার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

বিএনপি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির পক্ষে থাকায় সরকার পদ্ধতি নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হলো। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর আবার প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাবার কোন বিধান সংবিধানে নেই। তাই সংবিধান সংশোধন করে ইহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম জিয়াকে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সম্মত করার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়।[৯] এ ব্যাপারে জনাব আলী আহসান মুজাহিদ তাঁর লেখা বই "বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে" যা বলেন-

"এ বিষয়ে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে অনেকবার আলোচনা হলো। আমি বিএনপির চেয়ারপার্সন ও প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কয়েক দফা বৈঠক করলাম। টেলিফোনে আলাপ করলাম অনেক বার। এ দিকে আওয়ামীলীগ সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে। আমরা বিএনপিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, বিল তাদের পক্ষ থেকে আনা হলেই কল্যাণ বেশি। অত:পর এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া টেলিফোন করলেন। বললেন, জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরসহ আপনাদের সাথে বসতে চাই। পরের দিন অতিথী ভবন 'সুগন্ধ্যায়' সন্ধ্যা ৭ টায় বসার জন্য সময় চূড়ান্ত হলো। যথা সময়ে জামায়াত বিএনপি বৈঠক হলো। বৈঠক সফল হয়েছে বলে পরস্পর আশাবাদ ব্যক্ত করলাম। ঐ রাতেই বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং জাতীয় সংসদে বিল পেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বিএনপি'র পক্ষ থেকে বিল পেশ করার পরে আবারো নতুন করে জটিলতা দেখা দেয়। ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীর পদ ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে বিএনপি ও আওয়ামীলীগের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রেও আমাদেরকে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে হবে। বহুবার উভয় নেত্রীর সাথে আলাপ আলোচনা করতে হয়েছে। অবশেষে ঐক্যমতে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। তৎকালীন পারস্পরিক সম্পর্ক কতখানি নাজুক ছিল তা উভয় নেত্রীতো জানেনেই জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ডা. বি. চৌধূরী এবং কর্ণেল মুস্তাফিজুর রহমান ও ভাল করেই জানেন।

---

[৯] জামায়াতের লিয়াঁজো কমিটির আহ্বায়ক জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের লেখা বই "বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন" থেকে এ বিষয়ে নিম্নরূপ উদ্বৃতি :

তাঁরা আমাকে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনে অনেক উৎসাহ দিয়েছে।"

পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১০ আগস্ট ১৯৯১ সকল দলের ঐক্যের ফলে সকল সংসদ সদস্যের সমর্থনে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। একাদশ সংশোধনীতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তার পূর্ব পদে বহাল এবং দ্বাদশ সংশোধনীতে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের বিধান সমূহকে সংবিধান থেকে উৎখাত করে সংসদীয় পদ্ধতির বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়।[১০]

প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না

১০ মার্চ ১৯৯১ বিএনপি'র মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বরাবর সরকার গঠনের জন্য বিএনপিকে সহযোগিতা দানের জন্য জামায়াতকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি অনুরোধপত্র পাঠালেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঐ দিনই জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন বসে। সরকার গঠনে জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দেবে কিনা এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ক্ষমতার অংশীদার না হয়ে সরকার গঠনে সহযোগিতা করা হবে, যাতে দেশে গণতান্ত্রীক পরিবেশ উন্নত হয়। তবে এ সুযোগে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল করার শর্ত আরোপ করতে হবে।

পরের দিন ১১ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টায় মাওলানা নিজামী ঐ দিন দুপুরে ৪ সদস্যের এক ডেলিগেশন নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের পত্রটি পেশ করেন। মজলিসে শূরার সমাপনী অধিবেশনে জামায়াত পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা মজলিসে শূরাকে অবহিত করেণ যে, প্রেসিডেন্টের দৃঢ়তাব্যঞ্জক আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গঠনে জামায়াতে ইসলামী বিএনপিকে সমর্থন দিবে মর্মে পত্রটি প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ওয়াদা পালন সম্পর্কে যত হলফই করুন, শেষ পর্যন্ত তিনি তা রক্ষা করতে পারলেন না। কারণ স্বরূপ, তিনি বলেছেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ফাইলটা নাকি বার বার চেয়েও তিনি পাননি। যে ফাইলটি দায়িত্ব আসার আগে কিংবা পরে পাকা পোক্ত

---

[১০] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন (১) অধ্যাপক গোলাম আযম- জীবনে যা দেখলাম, (২) আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ- বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন।

ওয়াদা করার পূর্বে তিনি ভাল করে দেখেছিলেন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে) বলে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে বার বার আশ্বস্থ করলেন, সেই ফাইলটা কার অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে কিভাবে গায়েব হলো, তা হয়ত আর কোন দিন জানা যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওয়াদা রক্ষা করলেন না

১৯৯১ সালের ৮ মার্চ খালেদা জিয়ার সাথে আমীরে জামায়াতের চুক্তি মোতাবেক সংসদীয় উপ-নির্বাচনে এরশাদ সাহেবের পরিত্যক্ত রংপুরের ৪টি আসন থেকে দুটো আসন জামায়াতকে ছেড়ে দেয়ার কথা। আসন দুটো হলো রংপুরের মিঠাপুকুর ও গংগাচড়া। এ দুটো আসনে বিএনপি প্রার্থী তুলনায় জামায়াত প্রার্থী বহুগুণ বেশী ভোট পায়। কিন্তু বিস্ময় ও দু:খের বিষয়, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ওয়াদা ভঙ্গ করে ঐ দুটো আসনেও বিএনপি থেকে প্রার্থী দাঁড় করায়। সংসদে ২৮টি মহিলা আসন পাওয়ার ফলে বিএনপির আসন সমস্যা মিটে যায়। আসন সমস্যা কেটে যাওয়ায় বিএনপি জামায়াতের সাথে করা মাত্র দুটি আসন ছেড়ে দেয়ার চুক্তিও ভঙ্গ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। বিষয়টি জামায়াতকে যেমন বেদনাহত করেছে তেমনি অন্যদেরও বিস্মিত করেছে।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান এবং সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মি. রাজীব গান্ধীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ২২ মে ১৯৯১ ভারতের রাষ্ট্রপতি স্বামী ভেংকট রমন ও কংগ্রেসনেত্রী মিসেস সোনিয়া গান্ধীর নিকট পৃথক পৃথক শোক বার্তা পাঠান এবং নিম্নোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন-

"গত রাতে বোমা বিস্ফোরনে কংগ্রেস (আই) সভাপতি ও ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। কাপুরুষোচিত পন্থায় সন্ত্রাসের মাধ্যমে একজন খ্যাতিমান নেতাকে এভাবে হত্যা করার নিন্দাজ্ঞাপনের ভাষা আমাদের নেই। হত্যা ও সন্ত্রাসে কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সহিংস ও সন্ত্রাস অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

আমরা মনে করি রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতের জনগণ তাদের একজন বিশিষ্ট নেতাকেই শুধু হারাননি বরং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট

হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমরা আশা করি, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে ভারতের রাজনীতিকে সহিংসতা, সন্ত্রাস ও উগ্রবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। আমরা শোকাহত ভারতীয় জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করি, ভারত সরকার ও জনগণ ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন"।

প্রসংগত উল্লেখ, জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সকালে ভারতীয় হাইকমিশনে যান এবং শোক বইতে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপরে হামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অভিমত

১৯৯১ সালের ২৭ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মনিরুজ্জামান মিঞার আহ্বানে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ভি.সির পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানকে দাওয়াত দেয়া হয়। খান সাহেব অনিবার্যকারণবশতঃ থাকতে পারবেন না বলে তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল ও জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে পাঠাবেন বলে ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে টেলিফোনে জানিয়ে দেন।

ভি.সির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ মিলে ৫০ থেকে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক চলাকালে ছাত্রলীগের একটি মিছিল নিজামী সাহেবের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে সম্মেলন কক্ষে ঢুকে নিজামী সাহেবকে বৈঠক থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানায়। ভি.সি তাদেরকে বললেন, তিনি একজন এম.পি. এবং পার্লামেন্টে তিনি তোমাদের নেতাদের সাথেই একসাথে বসেন। পার্লামেন্টের রাজনীতি আলাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ এবং এখানকার রাজনীতিও আলাদা বলে তারা উল্লেখ করে । ভি.সি সহ কয়েকজন ওদেরকে বুঝিয়ে বলার পরে ওরা চলে যায়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বৈঠক আবার শুরু করার সাথে সাথেই জাসদ ছাত্রলীগ, মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্রইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে এবং সশস্ত্রভাবে সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করে নিজামী সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় নিজামী সাহেব যখন অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন তখন আক্রমনকারীরা হয়তবা তাঁকে নিহত মনে করে চলে যায়। উল্লেখ্য, পংকজ

দেবনাথ নামে জনৈক বাকশালপন্থী ছাত্রলীগ নেতা এই নারকীয় হামলার নেতৃত্ব দেয়। পরে ঐ দুর্ঘটনার ছবি থেকে বুঝাগেল ঘটনার সময় ভি.সি হাত জোড় করে হামলাকারীর প্রতি চেয়ে আছেন এবং ধ্বস্তাধ্বস্তিতে প্রক্টরসহ কয়েকজন মাওলানা নিজামীকে ঘিরে আছেন। কিন্তু চিহ্নিত গুন্ডাদের প্রতি কার্যকরী ভূমিকা নিতে ভাইস চ্যান্সেলর অপেক্ষমান পুলিশকে অনুমতি দিতে সাহসী হননি।

পুলিশ মেঝেতে অজ্ঞান ও গুরুতর আহত নিজামী সাহেবকে উঠিয়ে চিকিৎসার জন্য ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁকে দুই মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও মন্ত্রীদের অনেকে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান। এ কাপুরুষোচিত হিংস্রতার প্রতিবাদে আওয়ামীলীগ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিপক্ষের নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দেন। মাওলানা নিজামীর উপরে বর্বরোচিত হামলার সচিত্র সংবাদ পরদিন ২৮ মে ব্যানার হেডিংএ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৭ মে ১৯৯১ এক বিবৃতিতে জনাব আব্বাস আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভি.সি এর নিস্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে তাঁর পদত্যাগ এবং সংশ্লিষ্ট দূর্বৃত্তদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জোর দাবি জানান। সন্ত্রাসীদের শায়েস্তা করতে না পারলে আইনের শাসনের কথা বলার কোন অধিকার সরকারের থাকেনা এবং তাদের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় যথারীতি চলতে পারে না। স্মরণ যোগ্য, এই ঘটনার অনধিক এক বছরের মধ্যে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের ন্যায় শ্রদ্ধেয় ও বর্ষিয়ান আলেমে দ্বীন জগন্নাথ হলের ছাত্রদের কর্তৃক শরীকিভাবে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হন।

মজলিসে শূরার অভিমত ঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবে বলা হয়-

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মধ্যবর্ষ মজলিসে শূরার অধিবেশন ১৯৯১ এর সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, মাওলানা নিজামীকে হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের পাকড়াও এবং শাস্তিদানের ব্যবস্থা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের পরবর্তী পদচারণা ও অস্ত্রের ঝনঝনানী বন্ধ হতো। রাজশাহী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীরা ঘন্টার পর ঘন্টা লড়াই করতে সাহস পেতনা। প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসীদের দমনে সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা কিংবা অপারগতা আমাদের সকল শিক্ষাংগনকে ক্রমশ: সন্ত্রাসকবলিত ও মেধাহীন করে তুলছে।

১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের জামায়াত প্রধানের কাছে ধরনা

ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু ছিলো বিধায় সংবিধানে জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিলো। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ায় সংসদ সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বিধান প্রতিস্থাপিত হয়।

১৯৯১ সালের ৮ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস মনোনীত হন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মনোনীত হন সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী।

জাতীয় সংসদে দুইজন মহিলাসহ জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য ছিলেন ২০ জন। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদ্বয় তাঁদের ভোট পাওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এসে তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের মগবাজারস্থ বাসায় সাক্ষাৎ করেন। তারা আমীরে জামায়াতের দোয়া ও তাঁর দলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অবশ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ভোট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নমিনির এমনিতেই সংখ্যাধিক্য ভোট পাওয়া নিশ্চিত ছিলো। জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন না জেনে জাতীয় পার্টির (এরশাদ) ৩৫ জন সদস্যও ভোটদানে বিরত থাকেন। এতে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর ভোট সংখ্যা আরো কমে যায়। সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পেয়ে জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণ

সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধান সংশোধনী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং আওয়ামী লীগের সাথে যোগাযোগ করে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে মতপার্থক্য দূর হয়।

সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ছিলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সুপ্রিম কোর্টে ফিরে যাওয়ার বিধান সংক্রান্ত। আর দ্বাদশ সংশোধনী

ছিলো প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার বিষয়ক বিধানগুলোর স্থলে সংসদীয় সরকার বিষয়ক বিধানগুলোর প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত।

১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, অন্যান্য দল এবং স্বতন্ত্র সদস্যগণ সর্বসম্মতভাবে সংশোধনী দুইটি পাস করে অনুপম ঐক্যের উদাহরণ স্থাপন করেন। এই ঐক্যের উদাহরণ গোটা জাতিকে বিপুলভাবে পুলকিত করে।

বর্মী সৈন্যদের হামলার নিন্দায় জামায়াত

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এবং সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বর্মী সৈন্যদের হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং তারিখে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিটি নিম্নরূপ-

"সম্প্রতি বর্মী সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রেবশে এবং কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও বান্দবানের নাইখংছড়িতে অবস্থিত বি.ডি.আর ক্যাম্পের উপর ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে অতর্কিত গুলীবর্ষণ, বি.ডি.আর জোয়ান হত্যা, বি.ডি.আর ক্যাম্প থেকে ২৫টি রাইফেলসহ বিপুল পরিমান অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বার্মা সীমান্ত এলাকায় বিপুল সংখক বর্মী সৈন্যের সমাবেশ এবং বর্মী সেনা কর্তৃক আরাকানের মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর আমানুষিক অত্যাচার, বর্মী সেনা কর্তৃক মুসলিম তরুনীদের পাইকারীহারে ধর্ষণ এবং মুসলমানদের ঘর বাড়ী, ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র এমনকি মসজিদ মাদরাসা গুঁড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি বর্বরোচিত ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, ব্যথিত এবং কঠোর ক্ষোভ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

ইতোমধ্যেই নানা প্রতিরোধ উপেক্ষা করে বর্মী সেনাদের অমানবিক অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য অসংখ্য নারী পুরুষ বার্মা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। এসব শরনার্থী কক্সবাজার, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ এলাকার পথেঘাটে ও গাছতলায় অন্ন বস্ত্র ও চিকিৎসার অভাবে কনকনে শীতে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের অনেকেই মৃত্যুর প্রহর গুণছে। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট এ বিষয়ে তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

অন্যদিকে কক্সবাজার জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে অন্নবস্ত্রসহ জরুরি ত্রান সামগ্রী বিতরণের প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নবম অধ্যায়

জামায়াতের ত্রি-বার্ষিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন ১৯৮১-৮৯

স্বাধীনতা উত্তর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ মে তারিখে। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম, সেক্রেটারী জেনারেল জনাব শামসুর রহমান, নায়েবে আমীর জনাব মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, সাবেক প্রাদেশিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ আবদুল খালেক প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ দারসে কুরআন, দারসে হাদীস ছাড়া বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন।

মতিঝিল শাপলা চত্বরের বিপরীতে হোটেল ইডেনের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনটা ছিল প্রায় এক দশক পরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে জামায়াতে ইসলামীর একটি বড় মাপের সাংগঠনিক প্রোগ্রাম। তাই পরবর্তী তিন বছরের অপেক্ষায় না থেকে উক্ত স্থানে ১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর মাত্র একদিনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই আনুষ্ঠানিক প্রথম সদস্য সম্মেলনে উপস্থিতি সংখ্যা ছিল ৭০৪ তন্মধ্যে মহিলা রুকন সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১৮ জন। ১৯৮৩ সালের ১৪-১৭ অক্টোবর লালবাগ রহমাতুল্লাহ মডেল স্কুলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শতাধিক কর্মী স্বেচ্ছাসেবক ব্যতীত সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ৯৩৬ জন তন্মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯ জন।

১৯৮৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চারদিনব্যাপী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক সদস্য (রুকন) সম্মেলন টংগীর নিকটস্থ জামেয়া ইসলামীয়া প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সমস্যার দরুন উদ্বোধনী ভাষণ দেন ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান। সম্মেলনে সভাপতি, কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ ও আগত অতিথিমণ্ডলীসহ রুকনদের আসন গ্রহণের পরে স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন থেকে তরজমাসহ তেলাওয়াত করেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা সরদার আবদুস সালাম। প্রায় দু'হাজার সদস্যের (রুকন) মধ্যে ১৯৪২ জন পুরুষ ও ৬৩ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। টংগীস্থ জামেয়া ইসলামিয়া (মাদরাসা) প্রাঙ্গণে চতুর্থ কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯

সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর খানিকটা ব্যতিক্রমী ভাবে। ইতিপূর্বে সকল সদস্য (রুকন) সম্মেলনেই পুরুষ ও মহিলা রুকনদেরকে একই তারিখে পৃথক প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। এবারে রুকন সংখ্যা বিগত সম্মেলনের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী প্রায় পাঁচ হাজার। জামেয়া প্রাঙ্গণে এত লোকের ৩/৪ দিন ব্যাপী প্রোগ্রাম চালানোর জন্য যথেষ্ট স্থান সংকুলান না হওয়ার আশংকায় ১৫ দিন পরে ১৯৯০ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি কেবলমাত্র মহিলাদের নিয়ে (৪৭০ জন) মহিলা রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় আমীর ও মজলিসে শূরার নির্বাচন পদ্ধতি

জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর, মজলিসে শূরা, কর্মপরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) ও নির্বাহী পরিষদ- তিন বছর পর পর নির্বাচিত হয়। জেলা আমীর, জেলা মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ দু'বছর পর পর নির্বাচিত হয়। স্থানীয় জামায়াত, ইউনিয়ন জামায়াত ও উপজেলা জামায়াত প্রতি বছরেই নির্বাচন হয়। সংগঠনের সর্বস্তরেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশন নির্দিষ্ট দিনে রুকনগণকে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমবেত করে। কমিশনার গঠনতন্ত্র থেকে ঐ ধারাটি পড়ে শোনান, যেখানে আমীর পদের জন্য প্রয়োজনীয় গুনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে ব্যালট পেপার বিতরণ করে গোপনে একজনের নাম লিখে ব্যালট বাক্সে তখনি জমা দিতে বলেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ ভোট গণনাপূর্বক যিনি সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়েছেন তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। আমীর পদের জন্য কেউ পদ প্রার্থী হন না। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেউ তার আচরণে পদের জন্য আকাঙ্ক্ষী প্রমাণিত হলে তার সদস্য পদই বাতিল হয়ে যায়। রাসূল (স.) বলেছেন "যে পদ চায়, তাকে আমি দেইনা।"

জামায়াতে ইসলামীতে কখনো নেতৃত্বের কোন্দল হয় না। নেতৃত্বের লোভের কারণে দলে ভাঙ্গনের আশংকা থাকে না। নেতা নির্বাচনে প্রার্থীতা নেই বলে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে জনশক্তি বিভক্ত হয় না। তাই দলীয় ঐক্যস্থায়ী থাকে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট কিংবা ঐতিহ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের এই শরীয়ত সম্মত প্রক্রিয়া। সর্বস্তরেই শূরার সদস্যগণ রুকনদের গোপন ভোটে নির্বাচিত হন। সেখানেও প্রার্থীতা নেই, প্রচারনাও নেই।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের ফলাফল পর্যালোচনা

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল একটি ব্যাপক ও বড় ধরনের উদ্যোগ। জামায়াত প্রথমত ৩০০ আসনেই প্রার্থী মনোনয়ন ঘোষণা দেয়। পরবর্তীকালে ৭৮ টি আসন থেকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার পূর্বক ২২২টি আসনে প্রতিদ্বন্দীতা করে। নির্বাচনে জামায়াত মোট ১৮টি আসন লাভ করলেও ভোট পেয়েছে ৪১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৬১ যা মোট প্রদত্ত ভোটের ১২.১৩% জামায়াতের ৩১ জন প্রার্থী নির্বাচনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দী তথা দ্বিতীয়স্থানে এবং ৯৮ জন ছিল তৃতীয় স্থানে, যা স্পষ্টত ভবিষ্যতে সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

জামায়াতের তিনজন বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি প্রার্থীকে হারিয়ে, ১৩ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ও দু'জন বাকশাল প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। নির্বাচনে জামায়াত মাত্র ১৪ টি জেলায় উক্ত ১৮টি আসন লাভ করে। সাতক্ষীরা জেলায় ৫টি আসনের মধ্যে ৪টিতে জামায়াত প্রার্থীরা জয়লাভ করে। জামায়াতের দুজন কেন্দ্রীয় নেতা জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও মাওলানা আব্দুস সোবহান সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়ে পাবনা জেলার দুটো আসন থেকে নির্বাচিত হন।

৫ম সংসদে জামায়াত এমপিদের ভূমিকা প্রসংগ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিশজন এমপি পঞ্চম জাতীয় সংসদে যে গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছিল তা সকল মহলেই প্রশংসনীয় হয়েছে। কোন কোন দলের এমপি এমনকি উচুঁপদের নেতার নীচুমানের ও অশালীন বক্তব্যের কাছে জামায়াতে এমপিদের বক্তব্য সবটুকুই উল্লেখযোগ্য, পঠনীয় ও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, জামায়াতে ইসলামীর এমপিগণ সংসদে বরাবরই অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। জামায়াতের সবচেয়ে বর্ষিয়ান এমপি জনাব মাওলানা আবদুর রহমান ফকির (বগুড়া) একবার হৃদয়-নিড়ানো ভাষায় সংসদে বললেন "সর্বশেষ কথা হচ্ছে, আমরা যা কিছু করি তার জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিহি করতে হবে। আমাদের এই জবাব দিহির কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। অনেকে ভুলে গেছি, তাই আমি বলতে চাই, আসুন আমরা সকলে আল্লাহর গোলাম ও তার সাহায্যকারী হয়ে যাই।" কুলু আনছারালল্লাহ (সূরা আস-সাফ)।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৯১ সালে খুব সহজে এবং নিঃস্বার্থভাবে বি এনপিকে সরকার গঠনে সাহায্য করে দেশ ও জাতিকে এক মহা সংকট উত্তরণে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কৃতঘ্নতা স্বরূপ জামায়াতের সাহায্যে গঠিত সরকার জামায়াতে ইসলামীর আমীর সত্তর (৭০) বছরের বয়োবৃদ্ধ জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে পবিত্র রমজানের শেষার্ধে মসজিদে ইতেকাফের প্রস্তুতিকালে জেলে আটকায়। নিরীহ ও নিরস্ত্র এমনকি ঘুমন্ত ও মসজিদে অবস্থিত জামায়াতে শিবির নেতাদেরকে হামলা করে হতাহত করে।

জামায়াতে ইসলামীর দু'জন মনোনীত মহিলা এমপি যথাক্রমে হাফেজা আসমা খাতুন ও রাশিদা খাতুন, বোরখা পরিহিতা অবস্থায় শরয়ী পর্দা রক্ষা করে অন্যান্য নির্বাচিত পুরুষ এমপিদের ন্যায় শুধু বক্তৃতা বিবৃতিতে অংশগ্রহণ করেনি, তারা অন্যদলের মহিলা এমপিদের মধ্যে কুরআন-হাদীস, ইসলামী সাহিত্য বিতরণের মাধ্যমে সংসদের ভিতরে ও বাইরে দাওয়াতী কাজ চালিয়েছেন।

১৯৯২-১৯৯৪ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম

১৯৯২-১৯৯৪ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। অতঃপর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ সদস্য জনাব আব্বাস আলী খান সকলকে নিয়ে দোয়া করেন। দোয়ায় আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম যেন সঠিকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা হয় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে তাঁর প্রতি যে যুলুম করা হচ্ছে এবং ইসলামী আন্দোলনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে করুনাময় আল্লাহর কাছে তার অবসান কামনা করেন।

অতঃপর নবনির্বাচিত মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ শেষ হবার পর আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের প্রথমেই আমীরে জামায়াত আমীরের দায়িত্ব এবং শপথনামায় উল্লেখিত কথাসমূহের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং সকলের দোয়া ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। এরপর এ সম্পর্কে তিনি কতিপয় দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি বলেন যে, জামায়াতে ইসলামীর এটাই ঐতিহ্য যে, দায়িত্ব কেউ চেয়ে নেয় না, আর দায়িত্ব এলে কেউ পালিয়েও যায় না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, ময়দানে যাওয়ার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপর এমারতের দায়িত্ব এলো। জামায়াত এতে অসুবিধা মনে করেনি বলে তিনিও তা মনে করেননি। তবে অসুবিধা সেই এমন কারও কাছে দায়িত্ব এলে কাজ ভাল হতো। তিনি বলেন- দায়িত্ব পালনের জন্য সঠিক মান কারও নেই; অথচ দায়িত্ব দিতে হবে এবং তা পালনও করতে হবে। এই চেতনা মানোন্নয়নে সাহায্য করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আবারও বলেন যে, দায়িত্ব চেয়ে নেয়া হয় না; আল্লাহই দায়িত্ব দেন এবং তিনিই দায়িত্ব পালনে সাহায্য করবেন এটাই একমাত্র ভরসা। দায়িত্ব পালনে তিনি সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নামাজে 'লোকমা' দানের শিক্ষার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সঠিক সময়ে ভুল সংশোধন করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। অপরদিকে মা'রূফ কাজে বিনা দ্বিধায় আনুগত্য করার জন্যও তিনি আবেদন করেন। এতায়াত এবং

মুহাসাবা সমন্বয় দেখিয়ে তিনি বলেন মুহাসাবার এতায়াতের বিরোধী নয়। তিনি বলেন, এতায়াতের বুনিয়াদ হচ্ছে শ্রদ্ধা আর শ্রদ্ধা আসে মহব্বত থেকে। কোন গুণের অভাব থাকলে পরামর্শ দিয়ে সে গুণ সৃষ্টি করা হলে মহব্বতের পথে কোন বাধা থাকে না। তাই তিনি বলেন, অধিবেশনে এবং অধিবেশনের বাইরেও ব্যক্তি সাক্ষাৎ বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে ক্রটি সংশোধন করার লক্ষ্যে পরামর্শ দেয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। আমীরের ব্যাপারে মনে কোন খটকা দেখা দিলে সে খটকা দূর করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। অন্যথায় মহব্বতে ভাটা পড়বে, শ্রদ্ধা নষ্ট হবে এবং সঠিক আনুগত্য সম্ভব হবে না।

অতঃপর নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নের ০৬টি কথা পেশ করেন-

১। প্রথমে তিনি মজলিসে শূরার হায়সিয়াত সম্পর্কে বলেন যে, মজলিসে শুরাই হচ্ছে জামায়াতের পরিচালক সংস্থা। বস্তুতঃ "এই শুরাই হচ্ছে সংগঠনের আসল নেতা।"

২। এমন একটি সংস্থায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি সদস্যদের মোবারকবাদ জানান এবং রুকনগণ তাদের উপর যে আস্থা রেখেছেন তার মর্যাদা রক্ষা করে দায়িত্ব পালনের জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

৩। শপথ নামায় উল্লেখিত ওয়াদার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, এই ওয়াদা পালন করলেই শ্রম-প্রচেষ্টা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

৪। গঠনতন্ত্রের ৫৪ ধারায় উল্লেখিত মতবিরোধের সীমা উল্লেখ করে আমীরে জামায়াত এ বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকার অনুরোধ জানান। নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত হলে তাকে জামায়াতের সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেয়া এবং দ্বিমতের বিষয় ফোরামের বাইরে প্রকাশ না করার জন্য তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার লক্ষ্যে যথাযথ ফোরামে চেষ্টা করা যাবে বলে তিনি বলেন।

৫। শুরার মর্যাদার কথা আবারও তিনি তুলে ধরেন এবং বলেন যে, অন্যান্য দলের কাউন্সিলের চেয়েও এই শুরার ক্ষমতা বেশী। তবে শুরার অনুপস্থিতিতে কর্মপরিষদের উপর উক্ত ক্ষমতা ডেলিগেট করা থাকে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৬। পরিচালনা বিধির প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই বিধি পালন করে চললে উত্তম সংসদীয় প্র্যাকটিস গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সবশেষে অধিবেশনের আলোচ্য সূচীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে আমীরে জামায়াত তার বক্তব্য শেষ করেন এবং আল্লাহর সাহায্য ও রহমত কামনা করে মোনাজাত করেন।

পরবর্তীতে নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে ১৯৯২-১৯৯৪ সেশনের জন্য নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বন্টন করেন।

নায়েবে আমীর

১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

সেক্রেটারী জেনারেল

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

* অধ্যাপক গোলাম আযম- আমীরে জামায়াত
১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
৪। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
৫। অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
৬। জনাব মকবুল আহমাদ
৭। জনাব আলী আহসান মুজাহিদ
৮। জনাব বদরে আলম
৯। মাওলানা রফি উদ্দীন আহমাদ
১০। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
১১। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা
১২। অধ্যাপক শরিফ হোসাইন
১৩। অধ্যাপক মাহমুদ হুসাইন আল মামুন
১৪। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
১৫। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ

১৬। জনাব আবুল আসাদ
১৭। এডভোকেট শেখ আনসার আলী
১৮। এডভোকেট নজরুল ইসলাম
১৯। জনাব মীর কাসেম আলী
২০। অধ্যক্ষ আব্দুর রব
২১। জনাব আবু নাসের মোঃ আব্দুসজ্জাহের
২২। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
২৩। জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম
২৪। মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী

বিদেশী নাগরিক অজুহাতে অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রেফতার

২৩ মার্চ, ১৯৯২ রাত ৩ টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে শো-কোজ নোটিশ পেয়েই অধ্যাপক গোলাম আযম ও জামায়াতের নেতৃবর্গ আঁচ করতে পারেন যে, ১৪ বছর পরে জামায়াত প্রধানকে বিদেশী নাগরিক অজুহাতে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী যে বক্তব্য পেশ করেন, তা থেকে উক্ত গ্রেফতারী যে কত অযৌক্তিক ও অন্যায় তা সম্যক পরিষ্ফূট হয়েছে। ২৫ মার্চ '৯২ দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত উক্ত প্রেস কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কাছে সরকারের নতি স্বীকার

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সংগঠনের আমীর জনাব অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি কারণদর্শাও নোটিশ জারীকে একটি গুরুতর অন্যায় কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জামায়াতের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব আব্বাস আলী খান অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের ঘোষণা দিয়ে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটানোর জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

জনাব আব্বাস আলী খান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক এবং তাঁর পূর্ব পুরুষগণ শত শত বছর ধরে বাংলাদেশের ভূ-সীমার মধ্যে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম যেহেতু কখনো তাঁর নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেননি কিংবা অন্য কোন দেশের নাগরিকত্ব নেননি। সেহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর

হবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের ইহা পরিপন্থী নয়।

অধ্যাপক গোলাম আযম বিগত প্রায় ১৪/১৫ বছর (১৯৭৮-৯২) যাবৎ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে রমনা থানার পার্শ্বে মগবাজারের বাসায় বসবাস করে আসছেন। এতে করে সরকার 'ল'অব একুইসেন্স' মোতাবেক স্বীকার করে নিয়েছে যে, অধ্যাপক গোলাম আযম এদেশের বৈধ নাগরিক। এখন আইনগত সরকার এটা অস্বীকার করতে পারে না। অধ্যাপক আযমকে দলের আমীর করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে জনাব খান বলেন, ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সরকার অনুরূপ একটি নোটিশে জানতে চেয়েছিলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম বিনা ভিসায় দীর্ঘদিন কীভাবে আছেন? তার জবাবে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আমি জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। জন্মগত নাগরিক অধিকার হরণ করার ইখতিয়ার কোনো সরকারের নেই।" তাঁর এই জবাবের পরে বিগত ২২ মার্চ ১৯৯২ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পাল্টা বক্তব্য না আসায় আমরা আশ্বস্থ হয়েছি। অধ্যাপক আযম দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক আমীর নির্বাচিত হয়েছেন এবং আমরা গত ডিসেম্বরেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের বক্তব্য দিয়েছি।

জনাব খান তাঁর লিখিত বক্তব্যে সরকারী হস্তক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশপূর্বক বলেন, যারা ঘোষণা দিয়ে নিজেরা আইন হাতে তুলে নিল, দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির পাঁয়তারা করলো, তাদের ব্যাপারে সরকার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারণদর্শানো নোটিশ প্রদান করল। যারা (তথাকথিত গণআদালত) সংবিধান লঙ্গন করলো আদালত অবমাননা করলো, প্রকারান্তরে সরকার তাদের কাছে নতিস্বীকারের এক কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। অধ্যাপক গোলাম আযমকে ইস্যু বানানোর রাজনীতি কিংবা অধ্যাপক গোলাম আযমের কথা তুলে নিজেদের নিদারুন ব্যর্থতা ঢাকার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযমের ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও পরিচিতি এবং জামায়াতের গঠনমূলক রাজনৈতিক ভূমিকা উল্লেখপূর্বক জনাব খান বর্তমান পরিস্থিতিতে ধৈর্যের সাথে সবকিছু মোকাবেলা করার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব খান বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর আরোপিত অভিযোগ, ভিত্তিহীন, মিথ্যা। আওয়ামী লীগ পূর্ণ দাপটের সাথে সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দাঁড় করাতে

পারেনি। অভিযোগকারীরা নিজেদের আয়নায় আমাদের দেখে এ ধরনের কথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ব্যতীত সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব মকবুল আহমাদ, জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুস সুবহান এমপি, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা ও জামায়াতের সংসদলীয় দলের সচিব এডভোকেট শেখ আনসার আলী উপস্থিত ছিলেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ও রাজনৈতিক উভয় ধরনের ব্যবস্থা নেবো।

সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, ১৯৮১ সালে এমনি ধরনের স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি হিসেবে জাতিকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল, যার পরিনাম জিয়া হত্যার মাধ্যমে শেষ হয়। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ১৯৯২ সালের এই সময়ে আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। যারা ঐ সময়ে এ কাজটি করেছিল, এবারের ষড়যন্ত্রে তারাই সক্রিয় ও উদ্যোগী। এবারের ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জিয়া হত্যার আসামীও রয়েছে।

তথাকথিত গণআদালত ওয়ালাদের কথিত সুসাইড স্কোয়াড ও মৃত্যুঞ্জয় স্কোয়াড গঠনের মাধ্যমে হুমকি প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, গত ১০ মার্চ '৯২ সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের দ্বারা নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে গৃহযুদ্ধ বাধানোর যে শংকা ব্যক্ত করেছিলেন তা অমূলক হয়নি। তিনি বলেন, সর্বসম্মতভাবে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ঐতিহাসিক শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল, তা যেন আজ গুটি কতক সন্ত্রাসী, সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নিত এজেন্ট ও স্বেচ্ছাচারীর হাতে বন্দী।

ইসলামী শক্তির সময়োপযোগী সমাবেশ

১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে তথাকথিত গণ-আদালতের অজ্ঞ ও অবৈধ প্রেতাত্মারা অধ্যাপক গোলাম আযমের ফাঁসির রায় ঘোষণা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইসলামী শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা অনুভব করে ইসলাম বিরোধী শক্তি একজোট হয়ে একটি ইসলামী দলের শীর্ষনেতার বিরুদ্ধে যে মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর তাৎক্ষণিক ও জোরালো প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। তাদের আশংকা, ইসলামের চিহ্নিত শত্রুরা দেশের বৃহত্তম

ইসলামী দল ও এর নেতাকে নির্মূল করতে সক্ষম হলে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দলও নেতাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযান চালাতে প্রয়াসী হবে।

অধ্যাপক আযমকে গ্রেফতারের ঠিক চারদিন পূর্বে ২০ মার্চ '৯২ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের উদ্যোগে বায়তুল মুকাররমের উত্তরগেটে ইসলামী শক্তির একটি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পরের দিন ২১ মার্চ '৯২ দৈনিক সংগ্রামে 'বায়তুল মুকাররমের বিশাল সমাবেশে দেশবরেণ্য আলমবৃন্দ' শোল্ডার দিয়ে বড় অক্ষরে চার কলামের হেডিং লেখা হয়েছে, 'যারা উৎখাত ও নির্মূলের কথা বলছে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে।'

বক্তারা বলেন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে উৎখাত করা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তারা এদেশ থেকে টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা তথা ইসলাম অনুসারীদের উৎখাতের তৎপরতা চালাচ্ছে। তাঁরা আরো বলেন, ইসলামকে পদদলিত করার জন্য আজ মৌলবাদ উৎখাতের কথা বলা হচ্ছে। আর কয়েকদিন পরে বলবে, মৌলভীদের ধর। বিদেশী অপশক্তি এ অশুভ তৎপরতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। ঈমানী মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদেরকে আজ প্রতিটি মসজিদ থেকে আওয়াজ তুলতে হবে। ঈমান বিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধু নয়, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নিম্নে মূল সংবাদের আংশিক উদ্ধৃতি দেয়া গেল ঃ

'গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা এ মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। জুমার নামাজের পর বায়তুল মুকাররম উত্তর গেট জনতার ঢল নামে। প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক লোকের এ মহাসমাবেশে মুহুর্মুহু স্লোগানে ওঠে, 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবর' দেশব্যাপী এক আওয়াজ। কায়েম কর খোদার রাজ 'ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না, মানব না'।

বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব মাওলানা উবায়দুল হকের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, শায়খুল হাদীস আনিসুল হক, মাসিক মদীনা সম্পাদক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহর যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন খান, শাহী চকবাজার মসজিদের খতীব মাওলানা ক্বারী উবায়দুল্লাহ, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার প্রিন্সিপাল মুফতি ফজলুল হক আমিনী, নওয়াব বাড়ী জামে মসজিদের খতীব মাওলানা রেজাউল করিম ইসলামাবাদী প্রমুখ। মাওলানা হাফেজ এ টি এম হেমায়েত উদ্দীন উক্ত সমাবেশ পরিচালনা করেন। পবিত্র রমজানে মধ্যাহ্নের প্রখর রোদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ধরে সুশৃঙ্খলভাবে

দেশ বরেণ্য আলেমদের বক্তৃতা শোনেন। সমাবেশ চলাকালে ক্রীড়া ভবন গেট থেকে শুরু করে হাউজবিল্ডিং ফিন্যান্স ভবন পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।'

দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মুফতি উবায়দুল হক সমাবেশের শুরুতে ইসলামী সমাবেশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, এ সমাবেশ কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নয়। ইসলামের আবেদন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য এ সমাবেশ। কুরআন-হাদীসের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের কী করতে হবে, বিশিষ্ট আলেমগণ এর উপর তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন।

সমাবেশ শেষে যখন তিনি আবার সভাপতির বক্তৃতা করতে দাঁড়ান, তখন সমাবেশের অর্ধ-লক্ষাধিক শ্রোতা তাঁর দিকনির্দেশিকা শোনার জন্য প্রখর রোদের মধ্যেও উদগ্রীব হয়ে থাকেন। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে মাওলানা ফজলুল হক আমিনী বলেন, ইসলামকে যারা উৎখাত করতে চায়, তারা আফগানিস্তানের দিকে চেয়ে দেখুন, সোভিয়েত রাশিয়া একদিন আফগানিস্তানকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, পরিনামে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

সম্ভবত: শেষ বক্তা মাওলানা রেজাউল করিম ইসলামবাদী তথাকথিত গণ আদালতের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, গণ আদালত দেশের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। একদলের বিরুদ্ধে গণআদালত গঠন করা হলে, অন্যদল চাইবে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি কারীদের বিরুদ্ধে গণ-আদালত গঠন করতে হবে। গণ-আদালতে বিচার হবে, রক্ষীবাহিনীর নির্বিচারে মানুষ হত্যার। দেশ ও জাতির স্বার্থে এসব হানাহানি বন্ধ হওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, ঐ সমাবেশের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এতদিনের নেপথ্য ভূমিকা তথা ঘোমটা উন্মোচনপূর্বক প্রকাশ্যে গণ-আদালতীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

তথাকথিত গণ-আদালত সম্পর্কে জামায়াত

ঘাদানী কমিটি গণ-আদালতে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার করা হবে বলে ঘোষণা করার পর পরই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল ও জামায়াত সংসদীয় দলনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এক সাংবাদিক সম্মেলনে গণ-আদালতের বৈধতাকে বলিষ্ঠ যুক্তিসহকারে চ্যালেঞ্জ করেন। উক্ত ঐতিহাসিক বক্তব্যে অংশবিশেষ নিম্নরূপ-

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভূমিকা কতটা আন্তরিক ও বলিষ্ঠ ছিল তা আপনাদের অজানা নেই। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন দল নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ না করায় সরকার গঠনে যখন সংকট সৃষ্টি হতে যাচ্ছিলো, তখন ক্ষমতার অংশীদার হবার সুযোগে থাকা সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনে সহযোগিতা করেছে।

গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলে জামায়াত আশা করেছিল সকল রাজনৈতিক মহল দেশ গড়ায় অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ লাভ করবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের সময় রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে দেশগড়ার ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

দেশের জনগণ বর্তমানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস, দূর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় সহ যে সব সমস্যায় জর্জরিত, তাতে রাজনৈতিক অংগনে সত্যিকার ঐক্যসৃষ্টি করা সম্ভবপর না হলে দেশের উন্নয়ন তো দূরের কথা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। দেশের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে দেশের প্রধান সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ মত বিনিময় ও ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য। গণতন্ত্র বহাল রাখা ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এটাই সময়ের দাবি, জাতীয় কর্তব্য ও জনগণের কামনা।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিস্ময় ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করছে যে, একটি মহল জনগণের মূল সমস্যা আড়াল করে যা কোন সমস্যা নয় সেটাকে ইস্যু বানিয়ে দেশকে একটা সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। বেশ কিছুদিন যাবত পত্র-পত্রিকায় চরম উস্কানিমূলক ও দায়িত্বহীন বক্তব্য দিয়ে দেশে হিংসা বিদ্বেষ জনিত এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ দেশের শান্তিকামী মানুষ এসব পছন্দ করে না। নয়টি বছর সংগ্রামের পর দেশবাসী চায় গণতন্ত্র বহাল থাকুক, তাদের অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান হোক ও তাদের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার সুষ্ঠু সমাধান হোক।

জামায়াতে ইসলামী মনে করে, অধ্যাপক গোলাম আযমের ১৯৭১ সালের ভূমিকাকে অজুহাত বানিয়ে যারা গণ-আদালতের নামে হৈ-চৈ করছে, তারা সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে রাজনৈতিক পরিবেশ ঘোলাটে করছে।

১) **প্রথমত:** যেখানে রাষ্ট্র ও সরকার আছে, সেখানে আইনানুগ আদালতের বদলে কোন গণ-আদালতের প্রশ্নই ওঠেনা। এ ধরনের উদ্যোগ সরকারের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। জামায়াত মনে করে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা ব্যাহত করার জন্যই এই জঘন্য রকমের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

২) **দ্বিতীয়ত:** তারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে দেশে সরকারের বিকল্পশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের অপচেষ্টা চলাচ্ছে।

৩) **তৃতীয়তঃ** দেশে আইন, আদালত ও সরকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার পূর্বক স্বেচ্ছাচারীভাবে গণ-আদালত গঠনের অপচেষ্টাকে সরকার আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই প্রতিহত করবে। এটা সরকারে দায়িত্ব। কোনো অবস্থাতেই সরকার নীরবতা পালন করতে পারে না।

৪) **চতুর্থতঃ** জামায়াত আরো মনে করে, এ ধরনের স্বেচ্ছাচার ও বেআইনী তৎপরতার প্রশ্রয় দেয়া হলে তা দেশ ও সরকারের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

৫) **পঞ্চমতঃ** যে কয়জন আইনবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি সেবীর দাবিদার ব্যক্তি এ উদ্যোগে অংশীদার হয়েছেন তারা কোন দিক দিয়েই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন না।

৬) **ষষ্ঠত:** এমন কতক বাম রাজনীতিক প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন, যারা দেশের জনগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে চরম হতাশায় ভুগছেন। তাদের পুরনো সব রাজনৈতিক স্লোগান অচল হয়ে পড়ল। তাদের নিকট এমন কোন ইস্যু নেই, যা নিয়ে ময়দান উত্তপ্ত করা যায়। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো দল ও নেতার পক্ষে তাদের এ অবাঞ্ছিত উদ্যোগে সাড়া দেয়া স্বাভাবিক নয়।

গণ-আদালতের উদ্যোক্তারা সবাই রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী, কতক নাস্তিক্যতাবাদী, আর সংস্কৃতির নামে অপ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাদের নিকট ইসলাম হলো সাম্প্রদায়িকতা ও তথাকথিত মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ।

তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো- এদেশের জনগণের ঈমান-আকীদা, আদর্শিক চেতনা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ নির্মূল করা। তারা জামায়াতে ইসলামীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও অগ্রগতির মধ্যে তাদের পরাজয় দেখতে পায়। আর প্রখ্যাত

ভাষা সৈনিক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা, কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলার রূপকার অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন যোগ্য, বলিষ্ঠ ও বর্ষিয়ান নেতা তাদের নিকট অসহ্য। ষড়যন্ত্রকারীরা যদি দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে সক্ষম হয় তাহলে শুধু সরকারের অস্তিত্বের সংকট নয়, দেশের অস্তিত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বই সংকটাপন্ন হবার সমূহ আশংকা।

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার চালানো বিভিন্ন মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকার মজ্জাগত, এসব অভিযোগ সঠিক নয় জেনেই রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে তারা গণ-আদালতের নামে আইন হাতে তুলে নিয়েছিল। অধ্যাপক আযম ও জামায়াতকে স্বাধীনতাবিরোধী বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কাদের উস্কানিতে কোন দেশ থেকে বিপন্ন হতে পারে এ বিষয়ে সবারই জানা। দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শুধু আশ্রয় নয়, জামাই আদর পান, (আর অন্যেরা হয় লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, বিতাড়িত নতুবা নিগৃহীত-বন্দী) তারা জীবন দিয়ে এদেশকে রক্ষা করার ঝুঁকি নিবে কেন? কিন্তু দেশে তেমন কোন সংকট দেখা দিলে জামায়াত কর্মীরাই ইনশাআল্লাহ্ শাহাদতের পবিত্র জযবা নিয়ে এদেশের আযাদী হিফাজত করবে, কারণ তাদের এদেশের বাইরে কোথাও আশ্রয় নেই, বাঁচলেও এদেশেই মরলেও এমাটিতেই তাদের একমাত্র স্থান, জামায়াতকে এদেশবাসী স্বাধীনতার শত্রু নয়, হেফাজতকারী বলেই মনে করে। তাই জামায়াতের বিরুদ্ধে জনগণকে খেপানোর ব্যর্থ চেষ্টা কারো জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

দশম অধ্যায়

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ১৯৯২

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান প্রোস্টেট গ্লান্ডের অপারেশনের কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় অন্যতম নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অধিবেশন বসে।

উদ্বোধনী ভাষণে জনাব রহমান বলেন, বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আন্দোলন যে সংকটের মোকাবিলা করছে তার সাথে বর্তমান সংকটের তুলনা হয় না। আজ ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায় রেল স্টেশনে, লঞ্চঘাটে, বিমান বন্দরে, কোর্ট কাচারীতে, হাট বাজারে সর্বত্র বহুমুখী সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে। অতীতে সংকট এতটা তীব্র কখনো ছিল না। তিনি সকলকে ধৈর্য ধারণ ও অধিকতর কর্মতৎপর হয়ে পরিস্থিতি মুকাবিলা করার আহ্বান জানান।

সরকারের বিরুদ্ধে আমীরে জামায়াতের দায়েরকৃত মামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে মামলা স্থগিত আছে। জানুয়ারি ১৯৯৩ থেকে শুনানি হতে পারে।

অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় প্রস্তাব গ্রহণ

ঘটনাক্রমে মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরুর দিনেই ভারতের উগ্রহিন্দুদের দ্বারা পাঁচশো বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মত ঘটনা ঘটে। ঐ দিনেই সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরের দিন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করবে। মজলিসে শূরার বৈঠকে সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কর্মপরিষদ বৈঠকে গৃহীত নিম্নরূপ প্রস্তাব পেশ করেন।

১. কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ;
২. আজ ৭ ডিসেম্বর থেকেই সারা দেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন;
৩. আগামীকাল ৮ তারিখ সারা দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালন।

৮ ডিসেম্বর ১৯৯২ সন্ধ্যায় বৈঠকে সেক্রেটারী জেনারেল হরতাল সম্পর্কে রিপোর্ট দেন যে, জনগণের মধ্য থেকে সফল হরতালের পক্ষে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। জামায়াত এককভাবে ঘাদানীক কমিটিকে ঘরে তোলার এক অনন্য

ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যদিও সরকার ভোলায় কার্ফু ও কয়েক স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় সমাবেশে যাবার পথে ঘাদানীকরা গুলি করেছে। রাজশাহীসহ কয়েক জায়গায় ঘাদানীকদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে।
তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনাব নিজামী বলেন, সরকার আওয়ামীলগকে ম্যানেজ করে চলতে চায়। সরকারের একাংশের উদ্যোগেই ঘাদানিক কমিটি গঠিত হয়েছে, যাতে জামায়াতকে চাপে রাখা যায়। ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের সাথে ঐক্য প্রসংগে তিনি বলেন তাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন হচ্ছে তবে এক প্লাটফর্মে যাবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হতে এখনো সময় লাগবে।

পঞ্চম কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন ১৯৯২

২৯ ডিসেম্বর ১৯৯২ মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় টঙ্গীর অদূরে তৎকালীন জামেয়া ইসলামীয়া (বর্তমানে তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা) ময়দানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তিনদিনব্যাপী ত্রি-বার্ষিক রুকন সম্মেলন ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। শুরুতে কালামে পাক থেকে তরজমাসহ তেলাওয়াত করেন জামায়াতের প্রবীন কর্মপরিষদ সদস্য (মরহুম) মাওলানা সরদার আবদুস সালাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার পুরুষ ও মহিলা রুকন ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ, সুধীবৃন্দ ও বেশ কয়েকজন বিদেশী মেহমান অংশ গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে জনাব আব্বাস আলী খান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, জামায়াতে ইসলামী এদেশের ১২ কোটি মানুষকে নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমিক নেতৃত্বের পরিচালনায় সংগঠিত করে কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে চায়। আল্লাহর কিতাব ও আইন, রাসূলে খোদার আদর্শ ও খেলাফতে রাশেদার পদাঙক অনুকরণে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করাই জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য। তিনি অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন যে, এই উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করার কথা ছিল জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, তাঁরই একান্ত সমর্থনে গঠিত সরকারের হাতে তিনি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে এক নিঃসঙ্গ দুঃসহজীবন যাপনে বাধ্য হলেন।

জনাব খান সংক্ষেপে অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারের পটভূমি বর্ণনাপূর্বক বলেন, সকল দিক বিবেচনাপূর্বক জামায়াত জাতীয় স্বার্থেই বিএনপিকে সমর্থনের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অধাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের সমস্যাটি পূর্ববর্তী সকল সরকার জিইয়ে রাখলে আমরা আশা করেছিলাম এবারে বিএনপি সরকার কৃতজ্ঞতার নির্দশন স্বরূপ সমস্যাটির সমাধান করবেন। কিন্তু এ সরকার অকৃতজ্ঞতার (কৃতঘ্নতা ও প্রতিশ্রুতি ভংগের) পরিচয় দিয়েছে।

তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার বিনা অপরাধে ও বিনা বিচারে কারাজীবন, নির্মূল কমিটি ও তার মুরুব্বী দলের জামায়াত শিবির নির্মূল অভিযান এবং সেই সাথে সরকারের দুর্বলতা ও ইসলাম বিমুখতা, এসব কিছুই ইসলামী আন্দোলনের পথে অতি স্বাভাবিক। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যেই তার শীর্ষ নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে জেলে আটক রাখা হয়েছে।

জনাব খান তাঁর দীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণে ইসলামী আন্দোলনের বন্ধুর পথে ত্যাগ-কুরবানীর ইতিহাস, ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্তির প্রেক্ষাপট এবং ১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র বানাতে রাম রাজত্বের দাবীদারদের আধিপত্য ও সম্প্রসারনমূলক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশীদেরকে সদাসর্তক এবং ঐকবদ্ধ থাকার গুরুত্বারোপ করেন।

সবশেষে খান সাহেব, জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের উদ্দেশ্যে বলেন, লাখ লাখ সহযোগী সদস্য ও কর্মীর মধ্য থেকে এক আন্দোলনের দায়িত্বশীল হিসেবে আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন। আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার জন্য জানমাল ইত্যাদি ত্যাগ করার যে শপথ নিয়েছেন তা যাতে সার্থক হয় সে ব্যাপারে আরো বলিষ্ঠতা অর্জনের জন্যই এ সম্মেলন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, মজলিসে শূরা, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও তাদের যাবতীয় কার্যাবলীর সমালোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষমতা এ সম্মেলনের রয়েছে। তিনি সম্মেলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অনেক কষ্ট করে সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে বিশেষত আমন্ত্রিত সম্মানিত মেহমানদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান।

*** দ্বিতীয় দিনের কার্যাবলী–** ৩০ ডিসেম্বর- ১৯৯২, বুধবার সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান। অধিবেশনের প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে দারস পেশ করেন সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

অধিবেশনে মুহতারাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তি এবং ভারতের কংগ্রেস বিজেপীর আতাঁতের মাধ্যমে ধ্বংস প্রাপ্ত বাবরী মসজিদ পুনঃ নির্মাণ, মুসলমানদের জানমাল ও ধর্মীয় অধিকারের স্থায়ী নিরাপত্তার দাবী জানিয়ে দুটো প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শেষোক্ত নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের সাথে উক্ত প্রস্তাব 'ও আই সি' এবং জাতি সংঘসহ বিশ্বের শান্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের প্রতি ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টির আহবান জানানো হয়। যাতে ভারত সরকার অবিলম্বে যথাস্থানে বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণ করে দেণ। বাংলাদেশ সরকার এ জঘন্য ঘটনার নিন্দা না করায় প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং দেশে শান্তি শৃংখলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদ্দাত্ত আহবান জানান।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিদেশী মেহমানদের বক্তব্য। বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে বৃটেনের লেস্টারে অবস্থিত ইসলামীক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মানাযীর আহসান, ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাসিম, মালয়েশীয় ইসলামিক পার্টির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সচিব জনাব সুফি আবদুল লতিফ এবং অন্যতম নেতা ড. হারুন বিন তাইয়েব, ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মোসলেহ উদ্দীন এবং বৃটেনের ইসলামী যুব সংগঠনের শূরার সদস্য জনাব সিরাজুস সালেহীন।

বক্তাগণ নিজেদেরকে মেহমান নয়, বরং ইসলামী আন্দোলনের সদস্য বিবেচনায় আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশপূর্বক বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম শুধু জামায়াতে ইসলামীর নেতা নন, তিনি বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতা, তিনি আমাদেরও নেতা, আমরা অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবি করছি। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর মেহেরবানীতে অবশ্যই মুক্তি লাভ করবেন এবং ইসলামী উম্মাহকে বিশ্ব মানতার মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করবেন, ইনশাল্লাহ।"

বাংলাদেশী মেহমানদের মধ্যে নাগরিকত্ব মামলার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার এ. আর. ইউসুফ অধ্যাপক গোলাম আযমের ভূয়সী প্রশংসাপূর্বক তাঁর মুক্তির ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন।

*** ৫ম রুকন সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন**– ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯২, সকাল ৯ টায় জনাব শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে দরসে হাদীস পেশ করেন জনাব মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ। সম্মেলনের

মূল ব্যবস্থাপক হিসেবে সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বক্তব্য দেন। এই অধিবেশনে দেশে বিরাজমান বিশৃংখলাপূর্ণ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপরে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ইসলামের সুমহান বানী পৌছানো আর আল্লাহর পথে শাহাদাতের তামান্নার মধ্য দিয়ে এই দিন দুপুর ১টায় তিন দিনের কর্মসূচি শেষ হয়। আখেরী মুনাজাতে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান যখন আবেগ আপ্লুত হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আকুল আবেদন করতে থাকেন, তখন সম্মেলন প্যান্ডেলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণ হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিদেশী মেহমানবর্গ, সকল রুকন ও স্বেচ্ছাসেবকগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

মুনাজাতে নির্যাতিত-নিপীড়িত বিশ্বমুসলিম বিশেষ করে বসনিয়া-হারজেগোভেনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীরসহ ভারতের সংখ্যালঘু কোটি কোটি মুসলমানদের জানমাল ইজ্জতের হেফাজত কামনা করার সময় প্রায় সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে আল্লাহর দরবারে শিশুর মতো কান্নাকাটি করেন।

পরিশেষে জনাব খান বলেন, এ সম্মেলনের তিনদিনের সমস্ত কর্মসূচির একটাই লক্ষ্য সামষ্টিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ঘরে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব নিয়ে ফিরে যাওয়া। সম্মেলনে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা জীবন্ত নমুনা তুলে ধরা হয়।

আফগান মুজাহিদদের শান্তি চুক্তিকে মোবারকবাদ ও মজলুম বিশ্ব মুসলিমের পাশে জামায়াত নেতৃবর্গ

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের শুরুতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত আফগান মুজাহিদদের বিভিন্ন বিবাদমান গ্রুপের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকে মোবারকবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান বিগত ৮ মার্চ' ৯৩ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

"সম্প্রতি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে মুজাহিদদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। অতএব শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে শুভসূচনা হল, তাতে সারা দুনিয়ার মুসলমানগণের ন্যায় বাংলাদেশের জনগণও আনন্দিত। আমরা

আশা করি আফগানিস্তান পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শান্তি চুক্তি একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে। এই চুক্তি সম্পাদনের পেছনে বাদশাহ ফাহাদ, পাকিস্তান ও ইরানের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল বলে তাদেরকেও মোবারকবাদ জানানো হলো।

সকল বিভেদ ও অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে আফগানিস্তানে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জেহাদে আমরা চূড়ান্ত সাফল্য কামনা করছি এবং আফগান সরকার ও মুজাহিদদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।”

জামায়াতে ইসলামী বিশ্বের যে কোন স্থানে নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতা বিশেষতঃ মজলুম মুসলমানদের সুখ দুঃখ সমবেদনা জানাতে এবং সম্ভাব্য প্রতিকার করতে বদ্ধ পরিকর। ইতিপূর্বে ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইরাক-ইরান-কুয়েত হামলার সময়োচিত নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে, তৎপূর্বে রুশ ভাল্লুক কর্তৃক চেচনিয়া-বসনিয়া-আফগানিস্তান ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্র জবর দখলের দ্ব্যর্থহীন প্রতিবাদ জানিয়েছে। ২৮ নভেম্বর ১৯৯৩ সুদানের রাজধানী খার্তুমে অনুষ্ঠিত পপুলার আরব ও ইসলামিক কনফারেন্সে জামায়াতের নায়েবে আমীর ও মুসলিম বিশ্বে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন জামায়াতের মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারী রাশিদা খাতুন, এম.পি। ১৯৯৪ সালে ২৮ ও ২৯ এপ্রিল বসনিয়া ও হারজিগোভিনায় গণ হত্যার প্রতিবাদে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস-এ ইউরোপিয় পার্লামেন্টের উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় উপনেতা ও প্রবীন পার্লামেন্টারিয়ান মাওলানা আবদুস সুবহান সাহেব জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্বের অন্যূন ৪০টি দেশের সংসদীয় প্রতিনিধি উক্ত শান্তি ও ন্যায় বিচার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরামে যোগ দেন।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও ধর্মদ্রোহী রুশদীর মধ্যকার বৈঠকের নিন্দা জ্ঞাপনে জামায়াত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ও কুখ্যাত ধর্মদ্রোহী সালমান রুশদীর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক এবং পরবর্তীতে প্রদত্ত মি. ক্লিন্টনের ব্যাখ্যার পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ৪ডিসেম্বর ১৯৯৩ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

"সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট মি. বিল ক্লিন্টন ও ধর্মদ্রোহী সালমান রুশদীর মধ্যকার বৈঠকের আমি তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সালমান রুশদীর মতো একজন বিশ্বনিন্দিত ব্যক্তির সাথে বৈঠকের যে কৈফিয়ত তিনি দিয়েছেন তা নিছক খোঁড়া যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্লিন্টনের স্বদেশ আমেরিকারসহ সবদেশে ব্লাশফেমী ল' চালু রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা, ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থকে বিদ্রুপ করা এবং যীষুখৃষ্টের চরিত্রে কলংক লেপন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ জাতীয় কোন ঘৃন্য লেখককে কি মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কি. ক্লিন্টন ক্ষমা করতে পারবেন। স্মরণযোগ্য, ভারতীয় বংশোভূত কুলাংগার সালমান রুশদী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিরুদ্ধে তার বিশ্ব নিন্দিত পুস্তকে (সাটানিক ভার্সেস) চরম জঘন্য আচরণ করেছে।

রুশদীর মতো ধর্মদ্রোহী লেখকের সাথে সাক্ষাৎকারপূর্বক তার মত প্রকাশের অধিকার রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে এবং তার নিরাপত্তার পক্ষে মত প্রকাশ পূর্বক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছেন। এ কারণে যদি মুসলিম বিশ্ব তাকে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী মনে করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাদেরকে কি দোষী সাব্যস্ত করা যায়?

প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন যদি বিশ্বের প্রায় দেড় শত কোটি মুসলিমের নিকট তাঁর মর্যাদা বহাল করার প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে রুশদী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পুনর্বিবেচনা করতে হবে। রুশদীর লেখা বই সম্পর্কে সঠিক ধারণা মি. ক্লিন্টনের আছে কিনা জানিনা। ইতোমধ্যে না থেকে থাকলে তা অর্জন করা ক্লিন্টনের পক্ষে কোন কঠিন ব্যাপারই নয়, প্রকৃত ব্যাপার হলো তাঁর আন্তরিকতা, উদারতা ও সদিচ্ছা।

প্রসংগত, উল্লেখ ১৯৯৪ সালের ৯ জুলাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উদ্যোগে ধর্মদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, নাস্তিক ও মুরতাদের শাস্তি ও এদেশে ব্লাশফেমী আইন প্রবর্তনের দাবিতে দেশের সকল জেলা সদরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও জেলা প্রশাসনের নিকট স্মারকলিপি পেশ ও পরের দিন ১০ জুলাই ঢাকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বিশেষ অধিবেশন ১৯৯৩

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে মজলিসে শূরার এক বিশেষ অধিবেশন ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, ১৯৯৩ সালের শুরুতে নির্মূল কমিটির কাজ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। তাদের একাংশ ছলে বলে কৌশলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার অপচেষ্টা করছে।

আওয়ামী লীগের একাংশ ও বাম মহল সরকারকে তথা বিএনপিকে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অঘটন-ঘটিয়ে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে তথা কথিত মৌলবাদীদেরকে দায়ী করা হচ্ছে। এ অপশক্তি হাসিনা-খালেদাকে ঐক্যবদ্ধপূর্বক জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে বলে মাওলানা নিজামী আশংকা প্রকাশ করেন।

সমাপনী ভাষণে জনাব আব্বাস আলী খান বর্তমান সংকটমুহূর্তে আত্মসংশোধন ও আল্লাহর সাহায্য কামনার আহ্বান জানান। সালাত ও সওমকে (রমজান) এ উদ্দেশ্যে বড় সুযোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন-১৯৯৩

১৯৯৩ সালের ৭-৯ জুলাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মধ্য বর্ষ অধিবেশন সম্পন্ন হয়। ১৫ জুলাই আমীরে জামায়াত জেল থেকে মুক্তি পাওয়ায় ১৮ জুলাই মজলিসে শূরার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হয়। শূরার কার্যবিবরণীর অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষনে খান সাহেব বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে অন্যায়ভাবে ১৬ মাস

জেলে আটক রাখার পর সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে তিনি সসম্মানে আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। আমরা সবাই এ জন্য সানন্দে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি।

অতঃপর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সভাপতিত্বে মজলিসে শূরার অধিবেশনে আমীরে জামায়াত হিসেবে তাঁর নাম প্রকাশ করার সিদ্ধান্তের পরে গত দেড় বছরে ইসলামী আন্দোলনের কী লাভ হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে প্রায় দু'ঘন্টা আলোচনা করেন।

আমীরে জামায়াত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, সাহসী সিদ্ধান্ত না নিলে নাগরিকত্ব কখনো বহাল হতো না। সর্বদা আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকতে হতো, কোর্টে যাবার জন্য Cause of Action দরকার ছিল। সবশেষ তিনি ১০টি সুফলের কথা উল্লেখ করেন।

১. আদালতের রায়ে নাগরিকত্ব বহালের ফলে জনতার মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কারো করুনার পাত্র কিংবা দান গ্রহণ করতে হয়নি।
২. ফলে বাতিল শক্তির অপপ্রচারের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে।
৩. ইসলামী আন্দোলনে সার্বিকভাবে গতিসঞ্চার হয়েছে।
৪. জামায়াতে ইসলামী ও তাঁর প্রধান সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছে।
৫. কর্মীদের মাঝে সন্ত্রাসের মুকাবিলার সাহস ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।
৬. ইসলাম বিরোধীরা ভালভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইসলাম প্রিয় বহু নতুন লোক জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।
৭. সকল পেশার লোকদের মধ্যে পক্ষে ও বিপক্ষে মেরুকরণ হয়েছে।
৮. জামায়াত বিরোধীরা ইসলাম বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হবার ফলে কারো পক্ষে জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করা কঠিন হয়ে গেছে।
৯. কারা জীবনের অগাধ অভিজ্ঞার পাশাপাশি ২০টি পুস্তক পুস্তিকা রচিত হয়েছে যা আন্দোলনের জন্য খুবই সহায়ক।
১০. এ সময়ে ইসলাম তৃতীয় বিকল্প শক্তি ও জামায়াত এর পতাকাবাহী দল হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ১৯৯৩

১৯৯৩ সালের ৭-৯ ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন চলে। এক সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম, আম্বিয়া (আ.) ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সকল নবী রাসূল একই উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন এবং তা হলো -

১. সৎ লোক তৈরি এবং
২. তাদের দ্বারা দ্বীন কায়েম করা। তাদের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন, তাঁরা সকলেই পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক বিধিবিধান মেনে চলেছেন এবং আল্লাহর আইন তখনি কায়েম হয়েছে, যখন জনগণ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

এদিক থেকে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে তিনি বলেন, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। কারণ ইসলামে সকল লোক, চাইলেও আল্লাহর আইন বদলানো যায় না। প্রকৃতভাবে ইসলামই হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক, জামায়াত আন্তরিকভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এ প্রসংগে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস, ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আশা ছিল এরপর বিনা বাধায় গণতন্ত্র বিকশিত হবে। গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে জনগণের সে আশা এখনো পূরণ হয়নি। তিনি দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ক্ষমতাশীন বিএনপি প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ এবং অন্য সব দলের প্রতি নিম্নলিখিত আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন জানান:

১. অপরের আহূত সভা-সম্মেলনে বাঁধা প্রদান ও হামলা করা।
২. অন্যের আহূত সভাস্থলে অন্যায়ভাবে সভা ডাকা এবং সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে সন্ত্রাসের সহায়তা করা।
৩. কোন রাজনৈতিক দলকে বেআইনী ঘোষণা দাবি করা।
৪. জাতীয় সংসদে পর্যন্ত অন্যকে কথা বলার সুযোগ না দেয়া এবং অরুচিকর কথা ও কাজ করা।

পরিশেষে তিনি বলেন, সত্যিকার দেশ গড়ার জন্য আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমে জামায়াত সংগ্রামরত। জামায়াতের এ আন্দোলনের ঐতিহ্যকে আরো সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়ে এবং আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করেন।

একাদশ অধ্যায়

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলা

১৯৯২ সালের জুলাই মাসের ১৯ থেকে ৩০ তারিখ ও আগস্ট মাসের ২ থেকে ৫ তারিখ সর্বমোট ১৪দিন ঢাকা হাইকোর্টে বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার ও বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর আদালতে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আগস্টের ৬ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত দু'জন বিচারপতি মোট পাঁচদিনে মামলার রায় দেন। সিনিয়র বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্তকে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী অবৈধ ঘোষণা করেছেন। ফলে মামলার চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য প্রধান বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। উক্ত আদালতে মোট ১৭দিন শুনানি চলে। তিনি ১৯৯৩ সালে ২১ ও ২২ এপ্রিল অধ্যাপক আযম সাহেবের নাগরিকত্বের পক্ষে রায় দেবার ফলে এ রায়ই হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু আমীরে জামায়াতের প্রতি কৃতজ্ঞতার বদলে অকৃতজ্ঞ সরকার, রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল করায় মামলাটির শুনানি আবার অনুষ্ঠিত হতে হয়েছে।

সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে কমপক্ষে পাঁচজন বিচারপতি থাকেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যত আপীল করা হয় এর ফয়সালাই এ বিভাগে হয়ে থাকে, দুজন বা তিনজনের বেঞ্চ গঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ মামলায় প্রধান বিচারপতিসহ পূর্ণ বেঞ্চ বসেন। ১৯৯৪ সালে যখন আপীল বিভাগ নাগরিকত্ব মামলার শুনানি চলছিল, তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আপীল বিভাগের অপর চারজন বিচারপতি জ্যেষ্টতার ভিত্তিতে জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিচারপতি এ.বি.এম আফজাল, বিচারপতি মুস্তফা কামাল ও বিচারপতি লতিফুর রহমান ছিলেন। সুপ্রিমকোর্ট নাগরিকত্ব মামলাটিকে যে গুরুত্ব দিয়েছে তাতে প্রধান বিচারপতিসহ ফুলবেঞ্চ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিশেষ সংগত কারণবশত: তা হয়নি। স্মর্তব্য, প্রধানবিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ কেয়ার টেকার সরকার প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান থাকা কালে নাগরকিত্ব ফাইলটি ভালভাবে স্টাডি করেছিলেন। জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠন ও জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসানোর ব্যবস্থা করার পরে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল করার ওয়াদা দিয়ে ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর শিক্ষক ও অধ্যাপক গোলাম আযমের বন্ধু ড.জি. ডাব্লিউ

চৌধুরীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করে তার একান্ত অনিচ্ছাকৃত ওয়াদা খেলাফীর কারণ জানিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি মামলার আগেই নাগরিকত্ব বহালের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, সেহেতু এ মামলায় বিচারকের ভূমিকা পালন করা তাঁর জন্য সমীচীন ছিল না। তাই তিনি উক্ত বেঞ্চে শামীল হননি।

আপীল বিভাগের চারজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ছিলেন প্রিজাইডিং জজ। মামলায় অধ্যাপক আযম সাহেবের পক্ষ থেকে নিয়োজিত আইনজীবীর চারজনের প্রধান ছিলেন ব্যারিস্টার এ.আর. ইউসুফ। তাঁর প্রধান সহকারি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, অপর দু'জন সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন এডভোকেট শেখ আনসার আলী, এম.পি ও এডভোকেট নোয়াব আলী।

সরকারের পক্ষে এটর্নি জেনারেল ছিলেন জনাব আমিনুল হক। হাইকোর্টে নাগরিকত্ব মামলার রায় ঘোষনার এক বছর পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ১৯৯৪ সালের মে মাসের ৪ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে ৭ দিন এটর্নি জেনারেল যুক্তিতর্ক পেশ করেছেন। ব্যারিস্টার এ.আর.ইউসুফ ১৭, ৩০ ও ৩১ মে এবং ১ জুন এটর্নি জেনারেলের যুক্তির জবাব দিয়েছেন। আদালত এটর্নি জেনারেলকে সর্বশেষ যুক্তি পেশ করার জন্য সুযোগ দিলে তিনি ৪ ও ৫ জুন ১৯৯৪ এ দু'দিনে বক্তব্য রেখেছেন।

উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার এ.আর. ইউসুফ যে দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সরকারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন এর স্বীকৃতি জ্ঞাপন ও তাঁকে মুবারকবাদ জানিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সাদর আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতরে সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অফিসে সকল শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রদত্ত প্রাণঢালা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার এ.আর. ইউসুফ তাঁর আবেগাপ্লুত বক্তব্যে বলেন "এ মামলায় আল্লাহ তায়ালার খাস সাহায্য পেয়েছি বলে গভীরভাবে অনুভব করেছি। ... আর এ সাহায্য পাবার বড় কারণ হলো দেশ বিদেশের অগনিত লোকের আন্তরিক দুআ'। মক্কা ও মদীনা শরীফে আমার উপস্থিতিতেই শত শত মানুষকে দুআ'য় ক্রন্দনরত আবেগাপ্লুত দেখেছি।"

সর্বোচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায়

এটর্নি জেনারেলের পেশ করা যুক্তিসমূহের প্রত্যুত্তরে ব্যারিস্টার এ.আর. ইউসুফ ৪ দিন ব্যাপী যুক্তি ও তথ্যনির্ভর জ্ঞানগর্ভ দীর্ঘ বক্তব্যে এটর্নি জেনারেলের প্রতিটি যুক্তি এমন চমৎকারভাবে খণ্ডন করেছিলেন যে, বিচারপতিগণ সর্বসম্মত হয়ে

১৯৯৪ সালের ২২ জুন মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে একটি ঐতিহাসকি রায় প্রদান করেন।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চারজন বিচারপতি সর্বসম্মতভাবে রায় দিয়েছেন যে, গোলাম আযম জন্ম সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৭৩ সালে সরকার যে নির্বাহী আদেশ বলে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হবার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেছেন তা বেআইনি ও অবৈধ।

নাগরিকত্ব পুনর্বহাল আন্দোলনে শহীদ যারা

অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল আন্দোলনের সময় একশ্রেণির সন্ত্রাসী ও দুর্বৃত্তরা কাপুরুষের মতো হামলা করে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আন্দোলনের চার জন ভাইকে শহীদ করেছিল তাদের পরিচয়:

(১) মুন্সীগঞ্জ নিবাসী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মদ আতিকুল ইসলাম দুলাল ও

(২) পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মদ সাইজুদ্দীন শহীদ।

(৩) একই বছরে ২৫ মার্চ খুলনায় চোরাগোপ্তা হামলায় শহীদ হন এম.এ শেষ পর্বের ছাত্র আমিনুল ইসলাম ও

(৪) ১৬ অক্টোবর নরসিংদীতে শহীদ হন জনাব মাওলানা আবদুল মতিন মৃধা।

বায়তুল মুকাররমে শুকরিয়া সমাবেশ

সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর জামায়াতে ইসলামীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ জুন ১৯৯৪ তারিখে বায়তুল মুকাররমের উত্তর পাশের সড়কে শুকরিয়া স্বরূপ এক মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এজন্য জামায়াতের ঢাকা মহানগরী এক বিশাল মঞ্চ নির্মাণ করে। সে সমাবেশে নন্দিত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক গোলাম আযম যেভাবে মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা হলো :

> *“আমার জীবনে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যাকে সরকার ও বিরোধীদল এদেশে থাকতে দিতেই নারাজ এবং জন্মসূত্রে নগরিক হওয়া সত্ত্বেও যার নাগরিকত্ব ২৩ বছর পর্যন্ত বহাল হয়নি, সেই অবাঞ্চিত ব্যক্তির রাজধানীতে বিরাট সমাবেশে বক্তব্য রাখা, ছোট ঘটনা নয়। দীর্ঘ ২৩ বছর পর প্রকাশ্যে জনসভায় দেশবাসীকে সম্বোধন করার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে আমি মহান মা'বুদের প্রতি শুকরিয়ার জযবায় আপ্লুত।”*

তিনি তার বক্তব্যে বলেন-

> *“আমি মনে করি, দেশ গড়ার চিন্তা-ভাবনা যাদের আছে, তারাই রাজনীতি করেন। আর রাজনৈতিক ময়দানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের চেষ্টা-সাধনার উপরই জনগণের ঐক্য নির্ভর করে। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কোনো নেতৃত্ব*

সফল হবে না। জনগণের মধ্যে ঐক্য করেই সত্যিকারভাবে দেশের কল্যাণ করা সম্ভব। এ ঐক্যের জন্য আসুন, আমরা সকলে চেষ্টা করি।

আসুন! আমরা একসাথে মিলে দেশ গড়ার চেষ্টা করি। আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে- ইচ্ছাকৃতভাবে দেশ ও জনগণের ক্ষতির কোনো চেষ্টা আল্লাহর রহমতে কোনো দিন আমি করিনি; যা ভালো বুঝেছি, দেশ ও জনগণের কল্যাণের জন্য তা করেছি। এর পরেও মানুষের ভুল হয়, ভুল হতে পারে। কেউ আমার কাজকে ভুল মনে করতে পারেন। তার জন্য তাদেরকে আমি দোষী বলব না। নবী ছাড়া কে দোষী নয়? দোষ কম-বেশি সবারই আছে। তাই যারা আমার কোনো কাজকে ভুল মনে করেছেন, আমার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমার কোনো কাজে ব্যথিত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, তাদের সবার কাছে জানাচ্ছি, আপনাদের এ বেদনার সাথে আমি শরিক, আমিও দুঃখিত। আমি আল্লাহর কাছে দুআ' করি, কারো মনে দুঃখ না দিয়ে এবং কারো মনে দুঃখ না আসে এমনভাবে যেন কাজ করতে পারি- আপনারাও এ দুআ' করবেন।....."[১২]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর জনাব এটিএম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের পূর্বে যারা বক্তৃতা করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, জননেতা জনাব আব্বাস আলী খান, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ। দীর্ঘ ১৬ বছর পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত আমীর, অশিতিপর বৃদ্ধ জননেতা জনাব আব্বাস আলী খান তাঁর বক্তৃতায় আমীরে জামায়াতের নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান হওয়ায় তিনি ভারমুক্ত হলেন বলে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জানান। অধ্যাপক গোলাম আযমের কারাজীবনে নাগরিকত্ব বহাল করার দাবিতে আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তৃতায় বিজয়ী বীরের অনুভূতির প্রকাশ ঘটছিল। জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের ভাষণে শোকরিয়া ও আনন্দের সীমা ছিল না।

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের উক্ত সমাবেশের ভাষণ– জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের তৎকালীণ কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি ও সাংবাদিক আবদুল কাদের মোল্লা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে ব্যাপকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

উক্ত ঐতিহাসিক ভাষণে সম্বোধন ও শোকরিয়া জ্ঞাপনান্তে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম গত ২৩ বছরে যাদের হারিয়ে বেদনার্ত হয়েছেন শ্রদ্ধার সাথে তাদের স্মরণ করেন। তিনি স্মরণ করেন সর্বজনাব (১) মাওলানা আবদুল

---

১২ জীবনে যা দেখলাম (সপ্তম খণ্ড), অধ্যাপক গোলাম আযম।

হামিদ খান ভাসানী (১৮৯০-১৯৭৬), (২) শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), (৩) বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণী ওসমানী (১৯১৮-১৯৮৪), (৪) প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১), (৫) মাওলানা আতাহার আলী (১৮৯১-১৯৭৬), (৬) মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (১৮৮৮-১৯৮৭), (৭) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭), (৮) মাওলানা আবুজাফর মুহাম্মদ সালেহ (১৯১৫-১৯৯০)।

মাত্র ২০ মিনিটের ভাষণে প্রখ্যাত ভাষাসৈনিক ও রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম ১২ কোটি মানুষের সুখ শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা, জাতীয় ঐক্যের গুরুত্ব রাজনৈতিক ও আদর্শিক ঐক্যের পথ ও বিরোধীদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করেন। অত:পর বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ জননেতা আব্বাস আলী খান (১৯১৪-১৯৯৯) কর্তৃক আবেগাপ্লুত মোনাজাতের মাধ্যমে সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন জুলাই ১৯৯৪

১৯৯৪ সালের ২৪ জুন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের পরে ১৫ থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জুলাই সকাল ৯টায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে সম্মানিত আমীরে জামায়াত শূরার অধিবেশন উদ্বোধন করেন। ভাষণের শুরুতেই অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে তাঁর নাগরিকত্বের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর তিনি ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ও কর্মসূচির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম জোর দিয়ে বলেন, দ্বীনের এ পরিচয় দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা তাদেরই দায়িত্ব যারা এটা জানতে ও বুঝতে পেরেছেন, আর জামায়াতে ইসলামী এ কাজই করে যাচ্ছে। জামায়াত পূর্ণাংগ ইসলামের দাওয়াতই পেশ করে থাকে। অতঃপর যারা এ দাওয়াতে সাড়া দেন, তাদেরকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যেমন সহিশুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াত, বৈঠক পরিচালনা, রিপোর্টিং ইত্যাদি। সাথে সাথে জামায়াত সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কারের কাজও করে থাকে। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় জামায়াতের রাজনৈতিক তৎপরতার খবরই কেবল প্রকাশিত হয়। ফলে জামায়াতের ৪র্থ দফা ব্যতীত বাকী তিন দফার অন্যান্য কাজের খবর জনগণের কাছে পৌছেনা।

অতঃপর আমীরে জামায়াত দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবীতে সংসদ অধিবেশন বর্জন এবং এ ব্যাপারে সরকারের অযৌক্তিক ও অনমনীয় ভূমিকার ফলে সৃষ্ঠ সংকট ও অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

আমীরে জামায়াত কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি মেনে নিয়ে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার সুনাম অর্জনের জন্য তৎকালীণ ক্ষমতাশীলদেরকে উদাত্ত আহবান জানিয়ে তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করেন।

তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও জামায়াত সংসদীয় দলনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক জটিলতা মূলত দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে (১) অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি, (২) ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন'।

কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ দাবি মূলত জামায়াতেরই দাবি এবং জামায়াতই সর্ব প্রথম বর্তমান সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল জমা দিয়েছে। প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এ বিল সমর্থন করেনি। কিন্তু বর্তমান এ দাবিতে তারাও আন্দোলন করছে।

সংসদ বয়কট দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেয়া প্রেক্ষাপট প্রসংগে জামায়াত নেতা বলেন যে, সরকারি দলের মহাসচিব সহ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে তাদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি বিধায় বিষয়টি জটিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতি জন্মদিতে যাচ্ছে।

মাওলানা নিজামী বলেন, সরকার কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি মেনে না নিলে জামায়াতের জন্য আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এ আন্দোলনের ফলে তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে বলে জামায়াত নেতা মনে করেন– (১) সরকারের সুমতি হলে সমঝোতায় আসতে পারে, (২) সরকার সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন দিতে পারে, (৩) তৃতীয় কোন শক্তি ক্ষমতায় চলে আসতে পারে যা কেউ কামনা করে না। কেয়ারটেকার কায়েমের আন্দোলনে জামায়াতকে তার নিজস্ব অবস্থান থেকেই কর্মসূচি দিতে হবে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য জামায়াতের কোন দায় দায়িত্ব নেই, বরং পুরো দায়িত্ব হচ্ছে বিএনপি'র।

লালদিঘীর রক্তস্নাত ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভা

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ঢাকায় যেমন আমীরে জামায়াতকে নিয়ে জনসভা করা হয়েছে, সারা দেশেই তেমনি জনসভা হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের রায় পাবার পরদিনই রাজধানীতে বিরাট সমাবেশ করা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মহানগরীর তৎকালীন আমীর মাওলানা আবু তাহের জুলাই মাসেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে জনসমাবেশের কথা জানালেন। তারিখ নির্ধারিত হলো ২৬ জুলাই ১৯৯৪।

ইসলাম বিরোধী শক্তি জনসভার সংবাদ পেয়ে নির্মূল কমিটির ব্যানারে সভাকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। প্রকাশ্যে হুমকি দিল, তারা জামায়াতকে জনসভা করতে দেবে না। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা আগের দিনই মাঠ দখল করবে। আরো ঘোষণা দিল, তারা গোলাম আযম মুক্ত বাংলাদেশ কায়েম করবে। তারা দেয়ালে সাঁটানো জনসভার পোস্টার ছিঁড়ে, মাইক পাবলিসিটিতে কোথাও কোথাও বাধা দিয়ে তাদের দৃঢ় সংকল্পের হিংস্র পরিচয় দিল। সর্বত্র আতংক সৃষ্টি করলো, যাতে হাঙ্গামার ভয়ে বেশী লোক সভায় না আসে।

জামায়াত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে ২৬ জুলাই জনসভার অনুমতি নিয়ে নেয়। চট্টগ্রাম মহানগরী পুলিশ কমিশনার মাওলানা আবু তাহেরকে বার বার ফোন করে এবং পরে সাক্ষাৎ করে বার বার বিবেচনা করতে অনুরোধ করেন যে, আহূত জনসভা মুলতবি করা যায় কিনা। বিরোধী সন্ত্রাসী শক্তির আক্রমনাত্মক সশস্ত্র তৎপতায় তিনি বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা ব্যক্ত করেন। সন্ত্রাসীরা যাতে পূর্বঘোষণানুযায়ী আগেরদিন ময়দান দখল করতে না পারে সে জন্য জনসভার পূর্বদিন ২৫ জুলাই দুপুর থেকে জামায়াতের দু'হাজার স্বেচ্ছাসেবক ময়দান দখল নিয়ে প্রহরারত থাকে। সারারাত ময়দানে অবস্থান পূর্বক তারা শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে ধরনা দেন।

চট্টগ্রাম মহানগীরর অধিবাসীদের মধ্যে দারুন উৎসুক সৃষ্টি হয়। দুশমনদের অপতৎপরতার খবরে সংঘর্ষের আশংকায় সভায় হাজির না হবার বদলে জামায়াতের সমর্থকগণ বিরাট সংখ্যায় লালদিঘীতে জমায়েত হলো। যথা সময়ে বিকাল ৩ টায় সুউচ্চ বিশাল মঞ্চ থেকে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াতের মাধ্যমে

জনসভা শুরু হয়ে গেল। ময়দানের তিনদিকে জনসমুদ্রের ঢেউ। অপরদিকে নিউমার্কেটের দিক থেকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা পুলিশের বেষ্টনী অতিক্রম করে জনসভায় হামলা করার জন্য এগিয়ে এলো। স্বেচ্ছাসেবকগণ শাহাদাতের জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খালি হাতেই আক্রমনকারীদের মুকাবিলা পূর্বক জনসভাকে সাফল্যমন্ডিত করার সিদ্ধান্ত নিল।

লালদিঘী ময়দানে অধ্যাপক আযমের বক্তৃতা চলাকালে কোতোয়ালী থানার সামনে জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকদের উপর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন যে, মঞ্চে দায়িত্বশীলগণ এ বিষয়ে অবহিত হলেও তিনি মোটেই টেরপাননি যে, তাঁর পিছনে তাঁকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে। কিছু গোলমালের আওয়াজ পাচ্ছিলেন মাত্র। পেছনে স্বেচ্ছাসেবকগণ জীবনবাজি রেখে জনসভাকে নির্বিঘ্নে চলার ব্যবস্থা করেছেন। জনসভা শেষে জানা গেল। জামায়াতের দু'জন নিহত ও অজ্ঞাত সংখক আহত হয়েছে। শহীদ দু'জনের নাম আব্দুল খায়ের ও জাফর আহমদ।

লালদিঘির জনসভায় জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবকদের এ আত্মত্যাগ সারা দেশের জনশক্তির মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করলো। চট্টগ্রামের এ জনসভা জামায়াতের জন্য একটা টেস্টকেস ছিল। যদি ইসলামের চিহ্নিত দুশমনেরা সভা পণ্ড করতে সক্ষমহতো, তাহলে সারাদেশে এর দারুন প্রভাব পড়তো। আল্লাহর রহমতে চট্টগ্রামের জনসভায় সফলতার পর সারাদেশে কোথাও দুশমনেরা প্রকাশ্যে হামলার হিম্মত করেনি।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ১৯৯৪

১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র দু'মাস পর ডিসেম্বরেই বার্ষিক অধিবেশন হবার কথা। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছিল বিধায় এ বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়।

ইতঃপূর্বে বহুল আলোচিত কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধান অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে খানিকটা বিলম্বে হলেও আওয়ামী লীগ যে ডাক দিয়েছে তাতে জামায়াতের শরীক হওয়া না হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। অত্র অধিবেশন আহবানের প্রেক্ষাপট। এ দাবির মূল উদ্ভাবক ও প্রস্তাবক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিধায় ময়দানে জামায়াতের পক্ষে চুপ থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। জামায়াতের নির্বাহী ও কর্মপরিষদ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতো,

এর জন্য মজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আন্দোলনে প্রধান বিরোধীদল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য থাকায় এ পরিস্থিতিতে জামায়াতের পক্ষে এ আন্দোলনে শরীক হওয়া সমীচীন কিনা সে বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়ার তাগিদে মজলিসে শূরার এ জরুরি অধিবেশন ডাকতে হয়েছে।

উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামায়াত দীর্ঘ পটভূমি উল্লেখ পূর্বক বলেন, এখন কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে শরীক না হলে আমরা রাজনৈতিক ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। মজলিসে শূরার সদস্যগণ এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করার পরে সর্বসম্মতিক্রমে যুগপৎভাবে আন্দোলনে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ অধিবেশনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সরকারের নিকট ব্লাশফেমী আইন পাস করার দাবি জানানো হয়। উল্লেখ্য, ভারতীয় বংশোদ্ভুত বৃটিশ নাগরিক মুসলিম নামধারী মুরতাদ সালমান রুশদী ও বাংলাদেশের ভ্রষ্টাচরিত্রের মুসলিম নামের কলংক তাসলিমা নাসরিনের রচিত পুস্তকে বিশ্বনবী (সা.) সম্পর্কে জঘন্য কটু ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ঐ আইন পাস ও তা' কার্যকরী করার দাবি জানানো হয়।

১৫

১৯৯৫-১৯৯৭ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম

১৯৯৫-১৯৯৭ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম। ১৯৯৪ সালের ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে সারাদেশের রুকনদের সরাসরি গোপন ভোটে নির্বাচিত আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ।

শপথের মাধ্যমে পুনরায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এমারতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের শুরুতেই তিনি হামদ ও দরূদ পাঠ করেন এবং তাঁর উপর অর্পিত এমারতের কঠিন দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে পরম করুণাময় আল্লাহ-তায়ালার রহমত ও সাহায্য এবং সকল পর্যায়ের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন।

এরপর আমীরে জামায়াত দেশে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এ সংকটের জন্য সরকারি দল বিএনপির হঠকারিতা ও একগুয়েমীকে দায়ী করেন। কেয়ারটেকার সরকারের কথা সংবিধানে নেই বলে বিএনপি নেতৃবৃন্দ যে যুক্তি দেন অধ্যাপক গোলাম আযম তাকে অত্যন্ত হাস্যকর যুক্তি বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সংবিধানে নেই বলে তো কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজন করার দাবী করা হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সংবিধান কুরআনের ন্যায় কোন অপরিবর্তনীয় দলিল নয় যে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থেও তা পরিবর্তন ও সংশোধন করা যাবে না। তিনি উল্লেখ করেন যে, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাও সংবিধানে ছিল না; জাতীয় স্বার্থেই সরকার জাতীয় সংসদে বিল এনে সংবিধান সংশোধন করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের গঠিত যে সরকার দেশে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন করালো সে সরকারের মর্যাদাও ছিল কেয়ারটেকার সরকারের মর্যাদা। আর সর্বশেষে বিএনপি স্যার নিনিয়ানের মাধ্যমে যে প্রস্তাব দিয়েছিল তাও সংবিধান সংশোধন না করে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না। সুতরাং কেয়ারটেকার সরকারের দাবী সংবিধান বিরোধী একথা একেবারেই হাস্যকর। তাদের এ যুক্তিকে হঠকারিতা আর একগেয়েমী ছাড়া আর কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে আমীরে জামায়াত বলেন যে এ ব্যাপারে জামায়াত সর্বদাই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন

করেছে, কখনও আপোষ করে নাই বা সন্ত্রাস ও অনিয়মতান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। তিনি বলেন যে, জামায়াত যে আদর্শ কায়েম করতে চায় তার জন্য জনসমর্থন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ অপরিহার্য। তাই সংসদের ভেতরে ও রাজপথে সর্বত্রই জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আমীরে জামায়াত সরকারের একগুয়েমী ও হঠকারিতার জন্য সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সরকার, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবেদন জানান।

এরপর মুসলিম বিশ্বের দূরবস্থার কথা উল্লেখ করে আমীরে জামায়াত বলেন যে, একমাত্র বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবই মুসলিম বিশ্বের দূরবস্থার জন্য দায়ী। তিনি নেতৃত্বের সংকট থেকে মুসলিম বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ-তায়ালার দরবারে দোয়া করেন। তিনি আগামী ১৩ তারিখে মরক্কোতে অনুষ্ঠিতব্য ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সমাধান কল্পে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসার জন্য ওআইসি নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। আমীরে জামায়াত উক্ত শীর্ষ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি দাবি পেশ করেন। দাবী গুলো হচ্ছে ঃ

১। জাতিসংঘ, ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স মিলে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

২। রাশিয়া থেকে চেচনিয়াকে মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩। ভারতের মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জতের হেফাজত, বাবরী মসজিদ পুনর্নির্মাণ এবং কাশ্মীরে মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জতের হেফাজতের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

৪। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ পরিভাষা প্রয়োগ না করার জন্য পাশ্চাত্যের নিকট দাবী উত্থাপন।

আমীরে জামায়াত আরো বলেন, পাশ্চাত্যে খ্রীষ্টান ধর্মে লিবারেল ইজম ও মৌলবাদ থাকতে পারে; কিন্তু ইসলামে লিবারেল ইসলাম ও মৌলবাদ বলে কিছু নেই; সুতরাং ইসলামের ক্ষেত্রে মৌলবাদ পরিভাষা আদৌ প্রযোজ্য নয়।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে আমীরে জামায়াত বলেন যে, জামায়াতে ইসলামী এদেশে ইসলাম কায়েম করতে চায় এবং একই লক্ষ্যে অন্যান্য যত দল কাজ করছে তারা সকলেই এই একই দাবী করছেন। সুতরাং জামায়াত সকল ইসলামী সংগঠনকে আপন ও সাথী মনে করে। আল্লাহর আইন সৎ লোকের শাসন, খেলাফত,

ইসলামী শাসন, হুকুমতে ইলাহিয়া ইত্যাদি যে শ্লোগানই দিক- আসলে সকলের একই কথা-তাহলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা। তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, ইসলামী সংগঠনগুলো যদি এ লক্ষ্যে আন্দোলন করে এবং একে অন্যের বিরোধীতা না করে তাহলে ইসলাম পন্থীদের ন্যায় বড় শক্তি আর থাকবে না।

বক্তব্য শেষে আমীরে জামায়াত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য জনাব শামসুর রহমানকে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করেন। জনাব শামসুর রহমান আমীরে জামায়াতসহ সকলের জন্য সাহায্য কামনা করে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

অতপর নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে ১৯৯৫-১৯৯৭ সেশনের জন্য নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বন্টন করেন।

নায়েবে আমীর

১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ

সেক্রেটারী জেনারেল

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

* অধ্যাপক গোলাম আযম- আমীরে জামায়াত
১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
৪। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
৫। অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
৬। জনাব মকবুল আহমাদ
৭। জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ
৮। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
৯। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
১০। জনাব বদরে আলম
১১। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ
১২। মাওলানা আব্দুস সোবহান
১৩। অধ্যাপ মুহা. শরীফ হুসাইন
১৪। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা

১৫। মাওলানা রফি উদ্দিন আহমদ
১৬। অধ্যক্ষ আব্দুর রব
১৭। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
১৮। অধ্যাপক মাহমুদ হুসাইন আল মামুন
১৯। এড. মাওলানা নজরুল ইসলাম
২০। জনাব আবুল আসাদ
২১। এড. শেখ আনসার আলী
২২। জনাব আবু নাসের মোঃ আব্দুজ্জাহের
২৩। জনাব মীর কাসেম আলী
২৪। জনাব মোঃ ইউনুছ
২৫। জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম

০৪ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার শেষ দিন অর্থ্যাৎ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, সরকারের যে কোন উপায়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার মানসিকতার কারণেই রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকার দাবি মেনে না নিলে যে কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক বলেন-

১৯৯৪ সালের গোড়া থেকেই সংকটের সূচনা হয়, প্রথমে সংসদ থেকে ওয়াক আউট, পরে বয়কট এবং সবশেষে ২৭ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় এমপিদের পদত্যাগের হুমকি দেয়া হয়েছে। সংলাপ ও আপোষের সব উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অতঃপর ২৮ডিসেম্বর '৯৪ বিরোধী দলীয় ১৪৭ জন এমপিদের পদত্যাগপত্র স্পীকারের কাছে জমা দেয়া হয়েছে।

৬ষ্ঠ সংসদ নির্বাচন ও কেয়ারটেকার বিল সংবিধানভুক্তকরণ

১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, তাতে আশা করা হয়েছিল যে, স্বাভাবিক নিয়মেই বিএনপি সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবে এবং বিরোধী দল সংসদে স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ব পালন করবে। সরকার যদি নিজেই কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিত, তাহলে গণতন্ত্র স্বাভাবিক গতিতেই অগ্রসর হতো। সরকারের অবাঞ্ছিত ও অদূরদর্শী ভূমিকার ফলে বিএনপির বিরুদ্ধে চরম রাজনৈতিক বৈরীভাব সৃষ্টি হলো। যে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি কায়েমের দাবি বিএনপি সহ সকল বড় দল মেনে নিয়ে ছিলো, অপ্রত্যাশিতভাবে সে দাবিতে আবার আন্দোলন করতে সরকার

বাধ্য করলো। এতে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির রূপকার ও সবচেয়ে স্বোচ্চার জামায়াত নেতৃত্বকে সবচেয়ে বেশী বিব্রতকর ও সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো।

১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সকল রাজনৈতিক দল বয়কট করা সত্ত্বেও বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দল বিহীন নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত ও কলংকৃত করেছে।

এই নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও জাতীয় পার্টিসহ উল্লেখযোগ্য সকল দলই বয়কট করে। নাম সর্বস্ব ৪৮টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯৮৭জন। শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীতা বিহীন নাম সর্বস্ব এই নির্বাচনী প্রহসনে বিএনপি প্রায় সব ক'টি আসন লাভ করে। জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট লাভ করে মাত্র একটি আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পায় ১৩টি আসন। ৪৯জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

এ ধরনের অস্বাভাবিক নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করার দু'সপ্তাহের মধ্যেই সংবিধানে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংযোজনপূর্বক পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল মাত্র ১১দিন হলেও এর একটা ঐতিহাসিক অবদান ছিল। ১৯৯৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি উত্থাপিত এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি গৃহীত হয় বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল এবং সংশোধনীর ফলে সৃষ্টি হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ বিল আইনে পরিণত হওয়ার ফলে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঠামো, ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিষয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য ত্রয়োদশ সংশোধনী গ্রহণ করেই এর সমাপ্তি ঘটে। ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস বিরোধীদল বিহীন ও নিস্প্রাণ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন।

কেয়ারটেকার সরকার দাবি আদায়ে জামায়াতের শোকরিয়া জ্ঞাপন

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের মাধ্যমে জনগণের আন্দোলনে বিজয় লাভ করায় ২ এপ্রিল ১৯৯৬ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও ৫ এপ্রিল ১৯৯৬ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসে শুরার অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়-

"কেয়ারটেকার সরকার দাবি মেনে নেয়ায় জামায়াত মহান রাব্বুল আলামীনের শোকরিয়া আদায় করছে এবং সেই সাথে এই আন্দোলনে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করার জন্য দলমত নির্বিশেষে দেশের বার কোটি মানুষের প্রতি জানাচ্ছে আন্তরিক মুবারকবাদ।

জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনে জামায়াতের ০৯ (নয়) জনসহ যে শতাধিক লোক জীবন দিয়েছে, মজলিসে শূরা তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং যে সব অগনিত মানুষ আহত হয়েছেন ও কারা নির্যাতন ভোগ করেছে তাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং যারা এখনো বন্দী অবিলম্বে তাদের মুক্তি ও সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি ও হয়রানির নিন্দা জানাচ্ছে।

সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান দ্বিতীয় কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করায় মজলিসে শূরা তাঁকে ও তাঁর উপদেষ্টা পরিষদকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছে। মজলিসে শূরা ঘোষণা করছে, দেশে একটি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে জামায়াত কেয়ারটেকার সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা দান করবে। শূরা মনে করে জনগণের দীর্ঘ ১৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ত্যাগ ও সাধণার বিনিময়ে অর্জিত কেয়ারটেকার সরকারের সাফল্যের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

জামায়াত মনে করে, যে জনগণের নামে রাজনীতি চলে, সেই জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে রাজনীতিকে অস্ত্র, সন্ত্রাস ও কালো টাকার প্রভাব মুক্ত করতে হবে। মজলিসে শূরা আশা প্রকাশ করছে নবগঠিত উপদেষ্টা পরিষদ অবিলম্বে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সাবেক সরকারের ১৭ জন মন্ত্রী সহ দুর্নীতিবাজদের বিচার এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১২ জুন ১৯৯৬

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন মাস পরেই ১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের ২২৯৩ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচন কমিশনে তালিকাভূক্ত রাজনৈতিক দল ছিল ১১৯টি। ২৮১ জন স্বতন্ত্র ও ৪৮জন মহিলা প্রার্থী সহ মোট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সংখ্যা ছিল ২৬২৫জন। নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৭৪ জন। নির্বাচনী ফলাফল আওয়ামী লীগ-১৪৬, বিএনপি-১১৬, জাতীয় পার্টি- ৩২, এবং জামায়াত মাত্র ৩টি আসন পায়। জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব) আওয়ামীলীগকে প্রকাশ্যে সরকার গঠনে সমর্থন করে। ফলে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন ঐতিহাসিকভাবে শোকাহত ও কলংকিত পলাশী দিবসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে শপথ নেয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

আওয়ামী শাসন শুরু ও জামায়াতের প্রস্তাব

১৯৯৭ সালের ২৬ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এক বৈঠক সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় দফতরে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পরে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কর্মপরিষদ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ইতোমধ্যেই ভারতের চানক্যনীতির সাথে পরাজয় বরন করে আওয়ামী লীগ সরকার কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কতিপয় ব্যাপারে ভারতের কাছে ঐকমত্য পোষণ করছে। যেমন বাংলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে গ্যারান্টি ক্লজবিহীন পানি চুক্তি সম্পাদন, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির উদ্দেশ্যে প্রেক্ষাপট তৈরীর জন্য নানা ছুঁতানাতায় অস্বাভাবিক লোডশেডিং, এশিয়ান হাইওয়ের আবরণে ট্রাণজিটের নামে ভারতকে করিডোর প্রদানের সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে পারস্পরিক বিদ্রোহ দমনের নামে ভারতের জন্য বাংলাদেশেকে সামরিক করিডোর হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ প্রদানে একমত হওয়া। উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের নামে আধিপত্যবাদী শক্তির হাতকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে ভারতের পূর্বাঞ্চলের গেরিলারা ইতোমধ্যে ভারতের সামরিক পদক্ষেপে বাংলাদেশের সহযোগিতার কথা জানার পরপরই বাংলাদেশের উপরও আক্রমনের হুমকি প্রদান করছে। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সুস্পষ্ট অভিমত যে, ভারতে পূর্বাঞ্চলে সাতটি রাজ্যের সংকট যেমন ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তেমনি বঞ্চিত ৭টি রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে নীতিগতভাবেই বাংলাদেশের কিছুই করণীয় নেই। একটি অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ দাঁড়াতে পারে না। ভারতকে সহযোগিতা দিতে গিয়ে দিল্লী এবং সাত বোনের বিরোধের পরিনামে বাংলাদেশে পথ-প্রান্তর গেরিলা যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হউক তা বাংলাদেশীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে এবং সম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়রের বক্তব্যে চট্টগ্রাম বন্দর ভারতকে ব্যবহার করার সুযোগ বাংলাদেশ

দিচ্ছেন বলে জনগণের আশংকা। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করার সুযোগ পেলে ভারত তার মালপত্র খালাস ও পূর্বাঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য কুতুবদিয়া বা অনুরূপ (নিঝুম/ তালপট্টি) কোন দ্বীপে নিরাপত্তা ঘাঁটি বানানোর জন্য বায়না ধরবে এটা খুবই স্বাভাবিক।

এ ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের গোপন আলাপ-আলোচনার কথা শোনা যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে সরকার কি করছে তা পর্দার আড়ালে না রেখে জাতিকে পরিষ্কারভাবে জানানো উচিত বলে কর্মপরিষদ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করছে, কারণ এটা দেশবাসীর মৌলিক অধিকার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু, মার্চ ১৯৯৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ইস্যুতে বর্তমান সরকারের রহস্যজনক ও প্রশ্নবোধক ভূমিকায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বৈঠক ৫ মার্চ ১৯৯৭ সন্ধ্যায় সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মপরিষদে উল্লেখিত বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, ভারতের মদদপুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সাল থেকে সশস্ত্র আন্দোলন করছে। তারা সেনাবাহিনী, বি.ডি.আর. পুলিশ, আনসার ইত্যাদি দেশ রক্ষা বাহিনীর অবস্থান ও ভ্রাম্যমাণ দলের উপর যত্রতত্র হামলা করছে। তাদের সশস্ত্র হামলার মোকাবিলা করা নিরাপত্তা বাহিনী সমূহের এখন নিয়মিত কাজ। তথাকথিত শান্তি বাহিনীর হিংস্রতার বাস্তব ও নগ্নরূপ হচ্ছে অতর্কিত রাত্রে বা দিনে নিরীহ বাঙ্গালীদের উপর হামলা করা, ঘরবাড়ী এমনকি ফলবান বৃক্ষরাজি ও শস্যাদি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, অগ্নিদগ্ধ করে বা নির্বিচারে গুলীবিদ্ধ করে বাঙ্গালীদের হত্যা করা ইত্যাদি। ১৯৭৫ সাল থেকে তারা কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী পরিবারকে হত্যা করেছে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বহু সংখ্যক মানুষকে তারা অপহরণ করেছে। আর সব কিছুতেই মদদ যুগিয়েছে আমাদের শক্তিমান প্রতিবেশী ভারত। বিগত কয়েক বছর (১৯৭৫-৯৬) যাবত ভারত কমপক্ষে পাঁচটি জায়গায় বাংলাদেশ থেকে যাওয়া উপজাতীয় শরণার্থীদের জন্য শিবির খুলেছে। তথাকথিত শান্তিবাহিনী ছলে বলে কৌশলে শরণার্থীদের মধ্য হতে কিশোর ও যুবকদেরকে সশস্ত্র ক্যাডারে ভর্তি করে প্রশিক্ষণ দিতে থাকে।

জামায়াত গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে যে, অতীতে কথিত শান্তিবাহিনীর সাথে সরকারি পর্যায় অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে, তথাকথিত যুদ্ধ বিরতি হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী কোন শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছা সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে জনসংহতি সমিতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন চায়। তাদের দাবি হচ্ছে বাংলাদেশ (পূর্ব বংগ) ও জুমল্যান্ড নামক দুটো স্বতন্ত্র প্রদেশের সমম্বয়ে বাংলাদেশ নামক একটি দেশ হবে, সরকার হবে ফেডারেশন পদ্ধতির।

জুমল্যান্ড নামক পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা নিয়ে গঠিত প্রদেশটিতে আলাদা প্রাদেশিক সরকার থাকবে এবং সেই প্রদেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব জুমল্যান্ড প্রাদেশিক সরকারের কাছে যাবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বাংলাদেশের সর্বমোট জনশক্তির মাত্র ০.৫% (পাঁচ) শতাংশ এবং সর্বমোট আয়তনের ১০ শতাংশ নিয়ে বাংলাদেশ নামক প্রদেশের সমান অধিকার নিয়েই নতুন প্রস্তাবিত প্রদেশ জুমল্যান্ড গঠিত হবে।

অতীতের কোন সরকারই তাদের এ দাবি মেনে নেননি। মেনে নেয়ার প্রশ্নও ওঠে না। বর্তমান সরকারের সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে তথাকথিত জনসংহতি সমিতির কি আলাদা আলোচনা হচ্ছে জনগণ তা জানে না। কিন্তু যতুটুকু জানা যায়, জনসংহতি সমিতি তাদের দাবিতে অনড়। বর্তমান সরকার রহস্যজনক ভাবে তথাকথিত জনসংহতির দাবি বা তার কোন অংশ মেনে নিল কি না তা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী কিনা এটা এদেশের দেশ প্রেমিক জনগণের আশংকা। সকল দেশবাসী তা জানার অধিকার ও উৎসুক থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

এমতাবস্থায়, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনে করে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা এবং অখন্ডতার স্বার্থে জনসংহতি সমিতির সাথে যে সকল আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তা দেশবাসীকে জানানো উচিত। কারণ বাংলাদেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ডের বিনিময়ে এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যায় সাড়ে নিরানব্বই (৯৯.৫০%) শতাংশের ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন সমাধান জাতি মেনে নিতে পারে না।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ মনে করে বিষয়টি বাংলাদেশের একটি জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যা এদেশের সরকার ও জনগণই এই সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সম্প্রতি ব্যাংককে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। ব্যাংককে যারা এই আন্তর্জাতিক

সম্মেলনের উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে দুইটি ভারতীয় সংগঠন। সুতরাং একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে বিষয়টি যাতে আরো জটিল, উদ্বেগ ও শান্তি বিঘ্নকারী না হয়, তৎপ্রতি বর্তমান (আওয়ামী) সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।"

জামায়াতের ১৭ দফা কর্মসূচি (১৯৯৭)

পবিত্র কুরআন মজীদ, রাসূলে করীম (সা.) এর জীবন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম কতক অনুশীলন সর্বস্ব ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ, বিজ্ঞান সম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান।

অন্যদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসণ, নারী নির্যাতন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের লালন, মানবাধিকার লংঘনসহ যাবতীয় অব্যবস্থা ও আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের চাপে আমাদের জাতিসত্তা ও স্বাধীনতা বারে বারেই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব থেকে মুক্তি পেয়ে যদি আমরা একটি জনকল্যাণমূলক উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণপূর্বক বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জনগণকে সাথে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৭ সালের ৩০ এপ্রিল ১৭ দফা দাবি প্রণয়ন করে।

১৭ দফার লক্ষ্য ও রূপরেখা (Aims & outline)

বাংলাদেশকে একটি আদর্শ ইসলামী আত্মনির্ভরশীল কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই জামায়াত ১৭ দফা প্রণয়ন করেছে। বুঝবার সুবিধার জন্য ঐ লক্ষ্য কে ৪টি শিরোনামে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার হেফাজত করা।

৩. জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসহ যাবতীয় অধিকার ভোগ করার ব্যবস্থা করা।

৪. দেশবাসীকে সকল দিক দিয়ে আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ দেয়া।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের শিরোনামে ১৭ দফার রূপরেখা নিম্নে অপেক্ষাকৃত সবিস্তারে উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করা

১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষনা করতে হবে।

২. বাংলাদেশের সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সন্নিবেশিত থাকতে হবে।

৩. কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস ঘোষণা করতে হবে। এমন কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না এবং কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। পারিবারিক প্রচলিত আইনে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী যে সব ধারা রয়েছে তা অবিলম্বে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংশোধন করতে হবে।

৪. কাদিয়ানিরা যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শেষ নবী মানে না এবং শুরু থেকে অনৈসলামী কাজে লিপ্ত, তাদেরকে অমুসলিম ঘোষনা করতে হবে।

৫. সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, ব্যাভিচার উচ্ছেদসহ সকল প্রকার শোষণ এবং যাবতীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার হেফাজত করা

৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা হেফাজতের লক্ষ্যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে এবং জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ইসলামী চেতনা ও জেহাদী জযবা সৃষ্টি করতে হবে।

৭. (ক) বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত গংগাসহ সকল আন্তর্জাতিক নদীর ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। ফারাক্কা বাঁধ চালু করার পর থেকে এ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা' আদায়ের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে হবে।

(খ) ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য সার্ককে অকার্যকর করে তথাকথিত উন্নয়ন চতুর্ভূজ বা অন্য নামে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করা চলবে না।

৮. ভারতের মদদপুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী কোন চুক্তি করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন অবস্থাতেই সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা চলবে না।

জনগণের আর্থ-সামাজিক সহ যাবতীয় অধিকার ভোগের ব্যবস্থা করা

৯. সরকারের মূল দায়িত্ব হবে সূরা আল হাজ্জের ৪১ নং আয়াত অনুযায়ী;

ক. নামাজ কায়েমের মাধ্যমে জনগণের চরিত্র গঠন ও খোদাভীতি অর্জন;

খ. যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান;

গ. সৎকাজ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা;

ঘ. অসৎকাজ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।

সরকারের আরো দায়িত্ব হবে :

ঙ. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা তথা মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ।

চ. সকল নাগরিকদের জান-মাল-ইজ্জত আব্রু তথা মানবাধিকারের হেফাজত, আইনের শাসন কায়েম, সন্ত্রাস নির্মুলকরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ।

ছ. অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালাকানুন বাতিল করণ ইত্যাদি।

১০. কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করে নারীদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে হবে। যৌতুক প্রথাসহ যাবতীয় নারী নির্যাতন কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

১১. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও উপজাতীয় সকল ধর্মের লোক যাতে স্বীয় ধর্মীয় মতামত ও রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১২. বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে প্রকৃত অর্থে তাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করতে হবে।

১৩. এক শ্রেণীর এনজিও এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী কার্যকলাপ, সুদি ঋণের মাধ্যমে শোষণ ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

১৪. জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে :

ক. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করতে হবে;

খ. দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে প্রটেকশন দান এবং যথাযথ বিকাশের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ. জনগণের ৮০% কৃষকই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া দেশের সমৃদ্ধি অসম্ভব। কৃষি উৎপাদন লাভজনক করার উদ্দেশ্যে কৃষকদেরকে সুদবিহীন ঋণদান এবং কৃষি সামগ্রী সার, বীজ ও কীট নাশক সংগ্রহে ভর্তুকী প্রদান করতে হবে;

ঘ. কর্মক্ষম সকল জনশক্তিকে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখার জন্য যোগ্য হবার সুযোগ দিয়ে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে;

ঙ. ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগ করে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

চ. সকল ধরনের পেশাকে সম্মানজনক গণ্য করতে হবে এবং

ছ. পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

আল্লাহর পছন্দীয় মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ দেয়া

১৫. নীতিনৈতিকতাহীন, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে যথার্থ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ড. কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুপারিশ করেছে, তা দেশের সংবিধান বিরোধী বলে বর্জন করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ও জাতীয় উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে যথাযথ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

১৬. জাতীয় প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনকে শিক্ষা বিস্তার এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে টিভি, রেডিওসহ সকল মিডিয়াতে চরিত্র বিধ্বংসী নগ্নতা ও বেহায়াপনা এবং অপসংস্কৃতি বিস্তার বন্ধ করতে হবে।

১৭. যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিপাদন ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিখা অনির্বান, শিখা চিরন্তন, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলনসহ সকল প্রকার বিজাতীয় ও অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

বায়তুল মোকাররমের খতীবের প্রতি সরকারি নোটিশ জারি প্রসংগে

দলমত নির্বিশেষে আলেম উলামাদের পক্ষে জামায়াতে ইসলামী সর্বদাই সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমেদ্বীন জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হকের প্রতি তৎকালীন সরকারের বেআইনী শোকজ নোটিশ জারির প্রতিবাদে ২৪ জুলাই, ১৯৯৭ তারিখে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মপরিষদের সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ মাওলানা ওবায়দুল হকের প্রতি বেআইনী শোকজ নোটিশ জারির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে উক্ত বেআইনী শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ মনে করে বিগত ১৭ জুলাই ১৯৯৭ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের উপস্থিতিতে বায়তুল মুকাররমে যে দুঃখ জনক ঘটনা ঘটেছে তা' নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় এবং প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি হওয়া উচিত।

কিন্তু ঘটনা ঘটার পর পরই কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের মন্তব্যে কয়েকটি ইসলামী দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে জাতীয় মসজিদের খতীবকে দায়ী করা, ধর্মসচিব কর্তৃক অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিজনক বক্তব্য প্রদান, তড়িঘড়ি করে জনসভার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমির হোসেন আমু, মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলামসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে বায়তুল মুকাররমের সম্মানীত খতিব হযরত মাওলানা ওবায়দুল হকের প্রতি কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে বিষোদগার করা, পরের দিন জুমা'বার নামাজে আওয়ামী লীগ কর্মীদেরকে ইহুদীদের হাত থেকে বায়তুল মুকাররম উদ্ধারের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দান করা, জুমা'বার নামাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য উস্কানি দেয়া, এসবই একই সূত্রে গাঁথা বলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সুচিন্তিত অভিমত।

কর্মপরিষদ মনে করে ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে যে কোন সাধারণ জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, পুরো ঘটনাটিকে পূর্ব

পরিকল্পিত এবং ক্ষমতাশীনদের সাজানো ষড়যন্ত্র। একটি অনাকাংখিত ঘটনা ঘটিয়ে দায় দায়িত্ব ইসলামী দল এবং ব্যক্তিত্বের ওপরে চাপিয়ে বিশেষ করে হযরত মাওলানা ওবায়দুল হককে সম্মানীত খতীবের পদ থেকে অপসারণ পূর্বক নিজস্ব লোককে নিয়োগদান করাই আওয়ামীলীগ সরকারের অন্যতম চক্রান্ত।

তা'নাহলে একটি দুঃখজনক ঘটনার পর সহনশীল বক্তব্যের পরিবর্তে দলের শীর্ষনেতৃবর্গ কর্তৃক অরাজকতা সৃষ্টির জন্য চরম উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান এবং সম্মানিত খতীবের প্রতি বেআইনী শোকজ নোটিশ জারির কোন কারণ থাকতে পারে না। আইনগতভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের সম্মানিত খতীবের প্রতি শোকজ নোটিশ জারির কোন অধিকার নেই। কারণ, সম্মানিত খতীব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোন কর্মচারী কিংবা কর্মকর্তা নন।

জামায়াত মনে করে দীর্ঘ ১৩ বছর যাবত মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব জাতীয় মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন এবং একজন উস্তাজুল উলামা হিসেবে তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র। জাতীয় মসজিদের খতীবের পদটি একটি ইনস্টিটিউশন এবং জাতির মর্যাদা ও ঐক্যের প্রতীক। তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ জারি করা সরকারের এখতিয়ার বহির্ভূত, অথচ সরকারি ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির হঠকারী এবং উস্কানিমূলক বক্তব্যের দরুন অরাজকতা নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে সরকার তার দায় দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। জামায়াতের কর্মপরিষদ তাই ন্যায় ইনসাফ এবং শান্তি-শৃংখলার স্বার্থে সরকারি দল ও সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের যাবতীয় হঠকারী এবং উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।"

খতীব সাহেবের ইন্তেকাল

১৯৯৭ সালে উল্লেখিত অপ্রীতিকর ঘটনা সত্ত্বেও মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব আমরণ- আরো প্রায় ১০ বছরেরও অধিককাল সসম্মানে বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৭ সালের ৬ অক্টোবর পবিত্র রমজান মাসের রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। পরের দিন ৭ অক্টোবর বিকাল ৩ টায় জাতীয় ঈদগাহে মরহুমের বিশাল নামাজ-ই-জানাযায় আমীরে জামায়াত ও সাবেক কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সহ সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ ও তৌহিদী জনতা দলমত নির্বিশেষে দলে দলে শরিক হন।

মরহুম খতীব সাহেবের একান্ত প্রিয় দ্বীনি ভাই অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব ইতেকাফ থেকে যে শোকবানী পাঠান তার একাংশ নিম্নরূপ-
"বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতীব মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হকের আকস্মিক ইন্তেকালে দ্বীনি মহলে এক বিরাট শূণ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেল। প্রতিটি ইসলামী ইস্যুতে তিনি দেশবাসীকে ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতেন। প্রতি জুম'আর খুতবায় তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অকুতোভয়ে ইসলামী দৃষ্টি-ভংগী সঠিকভাবে তুলে ধরতেন।

তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও সকল ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শরীয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে একই প্লাটফরমে সমবেত করার উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘ প্রয়াস চালিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলেরও তিনি আজীবন চেয়ারম্যান ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর শূন্যস্থান গুলো উপযুক্ত আলেমে দ্বীন দিয়ে পূরণ করুন। আমীন।"

স্বাধীনতা সুরক্ষায় জামায়াতের ভূমিকা

পঁচিশে জুলাই, ১৯৯৭ সকাল সাড়ে ৯ টায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার তিনদিন ব্যাপী উক্ত অধিবেশনে সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান ও মাওলানা এ,কে,এম, ইউসুফ, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সহ কর্মপরিষদ ও শূরা সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে জনাব আমীরে জামায়াত বলেন, বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র না পেলেও আমাদের পূর্ব পুরুষগণ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতকে খন্ডিত করে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন বলেই আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। স্বাধীনতার মূল ভিত্তি যে, মুসলিম জাতিসত্ত্বা এবং ইসলাম, তা' অস্বীকার করলে আমাদের স্বাধীন সীমানার অস্তিত্ব থাকে না। দেশই যদি না থাকে, তাহলে কিসের রাজনীতি, কিসের আন্দোলন। আর ইসলামী আদর্শ কায়েমের প্রয়াস চালাবো কোথায়? তাই দেশের স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য ইসলামী আদর্শের হেফাজত করা ঈমানী দায়িত্ব।

অধ্যাপক গোলাম আযম আরো বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে আমরা প্রায় চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টিত ভারতের সাথে সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ করে চলেছি। কিন্তু আমরা ভারতের কাছ থেকে অনুরূপ আচরণ পাইনি। অসম পানি চুক্তি, ট্রানজিট, তথাকথিত শান্তি বাহিনীর মদদ দানসহ বহু ব্যাপারেই ভারত আমাদের সাথে যে আচরণ করেছে, তা' আধিপত্যবাদী মানসিকতার পরিচায়ক। যারা জন্মভূমীতে কোন অসুবিধা দেখলেই ঐ রাষ্ট্রটিকে তাদের আশ্রয়স্থল মনে করে, তাদের দ্বারা কি করে স্বাধীনতার সংরক্ষণ সম্ভব? যারা মরলেও এদেশে, বাঁচলেও এদেশে, তাদের দ্বারাই দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামী আদর্শের হেফাজত সম্ভব।

জামায়াত প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করে অধ্যাপক আযম বলেন, বৃটিশ শাসন আমলে ইসলামকে কতিপয় অনুষ্ঠানের সমষ্টি এবং রাসূলে করিম (সা.) শুধু একজন ধর্মনেতা মনে করা হতো। সেই সময় পেরিয়ে বৃটিশ রাজত্বের শেষে জামায়াতে ইসলামীর হক আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা জানতে ও বুঝতে পারি যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানব জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ নেতা। আল-ইসলামকে একটি বিজ্ঞান সম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম।

অন্যান্য ইসলামী দল বিশেষত: ইসলামী ঐক্যজোটের ইসলাম প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের উল্লেখ করে আমীরে জামায়াত বলেন, ময়দানে এখন আর আমরা একা নই। দেশের প্রায় সকল ওলামা, পীর, মাশায়েখ আজ ইকামতে দ্বীনের আওয়াজ নিয়ে মাঠে নেমেছেন। তারা আমাদের সম্মানিত সাথী।

অধ্যাপক আযম বলেন, ক্ষমতাশীন দলের প্রায় সকল নেতা-নেত্রীই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে মুখে স্বীকার করেন, কিন্তু বাস্তবায়নের কোন কর্মসূচি

তাদের দলের নেই। বরং যারা ইসলামকে কতিপয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম বলে জানে, সরকারি সকল পৃষ্ঠপোষকতা, মদদ তাদের জন্যই। প্রকৃত ইসলাম পন্থীদের প্রতি চলছে জুলুম, নির্যাতন ও হয়রানি।

এই ভুল বুঝাবুঝি তথা অবস্থার পরিবর্তন পূর্বক যখন আমরা গোটা জাতি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহর (সা.) আদর্শ মোতাবেক দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের সঠিক মূল্যায়নে এগিয়ে আসব। তখন আমাদের বহু ত্যাগ-তিতিক্ষায় অর্জিত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে বলে জামায়াত নেতা দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘের ইসলাম বিরোধী প্রস্তাবে সরকারের স্বাক্ষরদানের প্রতিবাদ ও দেশব্যাপী হরতাল

১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তার মহিলা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘের একটি ফোরামে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শরীয়া আইনকে অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় নয় বলে ঘোষণা করায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গভীর বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং উক্ত ইসলাম বিরোধী প্রস্তাবে স্বাক্ষরদানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

২০ আগস্ট (৯৭) জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এক জরুরি বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আকস্মিকভাবে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং সারা দেশে সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয় সন্ত্রাস, দুর্নীতির ও জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসের প্রতিবাদে ২৪ আগস্ট দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করায় জামায়াত দেশবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়।

১৯৯৮-২০০০ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম

১৯৯৮-২০০০ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন অধ্যাপক গোলাম আযম। ১৯৯৭ সালের ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। শপথ গ্রহণের পর অধ্যাপক গোলাম আযম সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। এরপর নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে ১৯৯৮-২০০০ সেশনের জন্য নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বন্টন করেন।

নায়েবে আমীর

১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

সেক্রেটারি জেনারেল

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল

১। অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
২। জনাব মকবুল আহমাদ
৩। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
৪। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

* অধ্যাপক গোলাম আযম- আমীরে জামায়াত
১। জনাব আব্বাস আলী খান
২। জনাব শামসুর রহমান
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
৪। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
৫। অধ্যাপক ইউসুফ আলী
৬। জনাব মকবুল আহমাদ
৭। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

৮। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
৯। জনাব বদরে আলম
১০। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা
১১। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
১২। মাওলানা আব্দুস সোবহান
১৩। মাওলানা সর্দার আব্দুস সালাম
১৪। অধ্যক্ষ আব্দুর রব
১৫। অধ্যাপক শরীফ হুসাইন
১৬। এডভোকেট শেখ আনসার আলী
১৭। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
১৮। মাওলানা রফি উদ্দিন আহমদ
১৯। জনাব আবুল আসাদ
২০। জনাব মীর কাসেম আলী
২১। এডভোকেট নজরুল ইসলাম
২২। জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম
২৩। জনাব আবু নাসের মোঃ আব্দুজ্জাহের
২৪। জনাব মোঃ ইউনুছ
২৫। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান
২৬। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ
২৭। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
২৮। অধ্যাপক মাহমুদ হোসাইন আল মামুন
২৯। জনাব আব্দুল গাফফার
৩০। মাওলানা মোঃ শামসুদ্দীন
৩১। অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল কাফী
৩২। জনাব কাজী শামসুর রহমান
৩৩। অধ্যক্ষ শাহ মু. রুহুল ইসলাম
৩৪। অধ্যক্ষ শাহ মু. রুহুল কুদ্দুস
৩৫। মাওলানা মীম ওবায়েদুল্লাহ
৩৬। মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী
৩৭। জনাব ডা. আনিসুর রহমান
৩৮। অধ্যাপক ফজলুর রহমান
৩৯। অধ্যাপক ফকীর মোঃ শাহেদ আলী

৪০। মাওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী
৪১। জনাব ফজলুল করিম
৪২। মাওলানা মোঃ আবু তাহের
৪৩। জনাব আতাউর রহমান
৪৪। জনাব ডাঃ শফিকুর রহমান
৪৫। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

* অধ্যাপক গোলাম আযম- আমীরে জামায়াত

১। মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ
২। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
৩। মাওলানা আব্দুস সোবহান
৪। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
৫। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
৬। অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
৭। জনাব মকবুল আহমাদ
৮। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
৯। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
১০। জনাব মোঃ ইউনুছ
১১। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা
১২। জনাব বদরে আলম
১৩। জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম

ত্রি-বার্ষিক কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন ১৯৯৭

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় ঢাকার উত্তরে টংগীস্থ জামেয়া ইসলামিয়া প্রাঙ্গণে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ষষ্ঠ ত্রি-বার্ষিক রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীন জননেতা ও আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলন অনিবার্য কারণবশত: তিন বছরের স্থলে পাঁচ বছর পরে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক আযম উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব মুসলিম

জাতীয়তাবোধের উপরেই নির্ভরশীল, ইসলামই এ জাতীয়তাবোধের উৎস। এদেশ স্বাধীন থাকলে ইসলাম অবশ্যই বিজয়ী হবে, ইনশাল্লাহ।

অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদ, ওলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে পুরুষ রুকন সংখ্যা ছিল ৮৮৪০ জন এবং মহিলা রুকন সংখ্যা ছিল ১২৭৯ জন।

অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের ৯০% মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তারা মহান আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) কে মহব্বত করে এবং কুরআন মজিদকে সম্মান ও ভক্তি করে। ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবোধই ১৯৪৭ সালে এ ভূখন্ডটিকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করে ছিল এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন লোকের মতামতের ভিত্তিতে। এই জাতীয়তার চেতনা যাদের আছে, তারাই স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করবে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশই এ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ।

তিনি আরো দুঃখ প্রকাশ করেন যে, এ পর্যন্ত কোন সরকারই জনগণের মধ্যে এ জাতীয়তাবোধ লালনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি। জামায়াত প্রধান বলেন, আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশকে রক্ষার জন্য জীবন দেবার প্রেরণা মুসলিম চেতনা থেকেই পেয়ে থাকে। ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহাসিকভাবে এদেশের স্বাধীনতার আসল রক্ষা কবজ।

সরকারের গণবিরোধী আচরনের কথা উল্লেখ পূর্বক অধ্যাপক আযম বলেন, ১৯৯৬ এর নির্বাচনী প্রচারনায় আওয়ামী লীগ অতীতের কুশাসনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ধার্মিকতার প্রদর্শনী করে। কিন্তু ক্ষমতাশীন হবার পরে এমন সব কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দিয়েছে, যার উল্লেখ তাদের মেনিফেস্টোতে নেই।

১৯৭২-৭৫ এর আওয়ামী লীগ স্ব-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে একদলীয় শাসনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ভেতরে সন্ত্রাসী আওয়াজ তুলে বিরোধী দলকে কথা বলতে দিচ্ছে না। রাজপথেও সভা-সমাবেশ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক সংকট ও জনগণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি এবং জানমালের নিরাপত্তার চরম অভাব বাস্তব সত্য। এমনকি পুলিশ, বি.ডি.আর. এর পাহারায় সরকারি দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অহরহ বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের হত্যা নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে ক্রন্দন করছে।

সরকারের ভারত তোষণ নীতির সমালোচনা করে জামায়াত নেতা বলেন, দেশবাসী শংকিত হয়ে পড়েছে যে, এ সরকার বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতের দাবি পূরণ করে ছাড়বে এবং এর ফলে এক সময়ে দেশের স্বাধীন সত্তাই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসংগে তিনি বলেন, শান্তির দোহাই দিয়ে তথাকথিত শান্তি বাহিনীর সাথে যে, চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে তা' ইতোমধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছে। সারা দেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সরকার শক্তি বলে পার্বত্য এলাকার সংখ্যা গরিষ্ঠ্য জনগণের উপর ভারতীয় মদদ পুষ্ঠ সন্ত্রাসী উপজাতীয়দের প্রভুত্ব কায়েমের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পৌষের কনকনে শীতের সকালে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম উত্তোলন করেন জাতীয় পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিনিয়র নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বিদেশী ও বিশিষ্ট মেহমানদের মঞ্চে আসন গ্রহণের পরে প্রচার সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লার পরিচালনায় শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল কর্মসূচি। কালাম-ই-পাকের সূরা আলে ইমরানের অংশ বিশেষ স্বভাব সুলভ সুললিত কণ্ঠে তরজমা ও তারতিলের সাথে তেলাওয়াত করেন কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা সরদার আব্দুস সালাম।

সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচি ও আলোচ্য বিষয়

প্রতিটি রুকন সম্মেলনেই রুকনগণ নানামূখী কর্মসূচি নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। জামেয়ায় দু'বর্গ কিলোমিটার পরিধির সুদৃশ্য প্যান্ডেলের মধ্যে দু'সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক সহ ১৪ সহস্রাধিক প্রতিনিধির সম্মেলনের অন্যতম কর্মসূচি ছিল জেলা ভিত্তিক সম্মেলন, পেশা ভিত্তিক সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক বার্ষিক রিপোর্ট পেশ, প্রশ্নোত্তর এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ভিত্তিক প্রস্তাব পাস।

দ্বিতীয় দিনে বাদ মাগরীব দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও বর্তমান পরিস্থিতি 'ইসলামী আন্দোলন ও ঈমানের দাবি' আলোচনা করেন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান। সমাপনী দিনে 'বর্তমান

বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অন্যতম নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ।

এবারের সম্মেলনে বিশাল উপস্থিতির জন্য ক্লোজ সার্কিট টি.ভি. সেট বসানো হয়েছে। যাতে দূরে বসেও নেতৃবৃন্দের ভাষন শুনতে ও দেখতে অসুবিধা না হয়। সম্মেলনে আগত বিদেশী মেহমানদের মধ্যে দ্বিতীয় দিন শুক্রবার জুম'আর নামাজের বিরতির পূর্বে আকর্ষনীয় বক্তব্য রাখেন

(১) জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর কাজী হোসাইন আহমদ;
(২) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ড. আহমদ তুতুনজী;
(৩) সুদানের সাবেক মন্ত্রী ও একটি প্রাদেশিক গভর্নর উসমান রিজক;
(৪) জামায়াতে ইসলামী হিন্দ এর সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মাদ জাফর;
(৫) যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নও-মুসলিম ইমাম খালেদ প্রমুখ।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে আমন্ত্রিত বাংলাদেশী মেহমানদের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক ও রাজনীতিবিদ ডেমোক্রেটিক লীগ প্রধান জনাব অলি আহাদ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার কোরবান আলী, এন.ডি.এর চেয়ারম্যান এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার, জাতীয় পার্টির (জা-মোঃ) যুগ্ম মহাসচিব শাহ শহীদ সরোয়ার, বি.এনপির সাবেক মহাসচিব ও স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিষ্টার আবদুস সালাম তালুকদার ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের তথ্য উপদেষ্টা ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক।

মাঝে মধ্যে গগনবিদারী নারায়ে তাকবীরসহ বিভিন্ন শ্লোগান ছাড়া আমীরে জামায়াতের ১৩ পৃষ্ঠার ৪০ মিনিটের লিখিত ভাষনের সময় ছিল পিন পতন নীরবতা। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহ সালার প্রত্যয় দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন এদেশ স্বাধীন থাকলে ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সূরা আল আনয়ামের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত পূর্বক তিনি তিনদিনব্যাপী রুকন সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

শুভেচ্ছাবানী পাঠ ও মেহমান বৃন্দ

সম্মেলনে বিদেশী মেহমানদের আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষনের পরে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের শুভেচ্ছাবানী পাঠ ও সম্মেলনে আগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন। মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী সংগঠনের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব যারা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজেরা আসতে না পেরে বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে শুভেচ্ছাবানী পাঠিয়েছেন তাঁরা হলেন :

১. হাসান আল তুরাবী– সুদান জাতীয় সংসদের স্পীকার, পপুলার আরব এ্যান্ড ইসলামিক কনফারেন্সের সম্মানিত সেক্রেটারী জেনারেল, আধুনিক বিশ্বের সুপরিচিত প্রবাদ পুরুষ। সুদান জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশন থাকায় জনাব হাসান আল তুরাবী জনাব ওসমান হাসান রিজিককে শুভেচ্ছাবানীসহ পাঠিয়েছেন।

২. নাসের আবুদী– বিশ্ব মুসলিম লীগ (রাবেতা) এর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ নাসের আল আবুদী।

৩. রাবেতা মহাপরিচালক– আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সম্মেলন বিভাগের মহাপরিচালক আল রাজী সংস্থার মহাসচিব ড. আবদুল্লাহ বিন সালেহ আল ওবায়েদের পক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীরের কাছে প্রেরিত বানীতে পূর্ব নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ততার জন্য তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

৪. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ– ইসলামিক ফাউন্ডেশন (লেস্টার যুক্তরাজ্য), ডাইরেক্টর জেনারেল। বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সুপরিচিত নেতা।

৫. ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ– সৌদী আরবের মজলিসে শূরার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পরে রাবেতার মহাসচিব।

৬. আবিম সভাপতি– মালয়েশিয়া মুসলিম যুব আন্দোললেন সভাপতি আহমদ আজম আবদুর রহমান।

৭. ওয়ামী মহাসচিব– ড. সালেহ আল জোহাশী।

৮. আল মুতাওয়া কুয়েত– এর প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আলী আল মুতাওয়া।

৯. মোস্তফা এম. তাহহান– কুয়েতের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি।

১০. মোহাম্মদ ইউসুফ– ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার আমীর।
১১. সালেহ্ আজ্জাম– ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সভাপতি।
১২. ওয়ামীর সহকারী মহাসচিব– ড. ইব্রাহিম আল কায়িদ।
১৩. শ্রীলংকা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক।

গ্যারান্টি ক্লজবিহীন ফারাক্কা চুক্তির প্রতিবাদ

'ফারাক্কা' ভারতের অংগরাজ্য পশ্চিম বংগের মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবানগোলার মাঝে অবস্থিত একটি স্থান। এটি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পশ্চিম সীমানা থেকে ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) দূরে অবস্থিত। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা বলে ভারত সরকার ১৯৬১ সনে ফারাক্কা নামক স্থানে গংগা নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। এই বাঁধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৭৪ সনের ডিসেম্বর মাসে।

শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মতি নিয়ে ভারত সরকার ৪০ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধের সবগুলো গেট খুলে দেয় ১৯৭৫ সনের ২১ এপ্রিল। কিন্তু প্রতিশ্রুত মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও গেটগুলো আর কখনো বন্ধ হয়নি।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে গংগার পানির ন্যায্য শেয়ার প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়াস চালানো হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে গংগার পানি বণ্টন ইস্যুটি উত্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েকটি বন্ধু রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে ইস্যুটি শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়নি।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৭ সনের ৫ নভেম্বর গংগার পানি বণ্টন বিষয়ে ভারতের সংগে একটি চুক্তি হয়। ১৯৮৮ সনে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কোন চুক্তি ব্যতিরেকেই ভারত ১৯৮৮ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত একতরফা পানি প্রত্যাহার করতে থাকে।

১৯৯৬ সনের ১২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার গংগার পানি বণ্টন বিষয়ে ভারতের সাথে ফারাক্কা চুক্তি নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

১৯৭৭ সনের ৫ নভেম্বর সম্পাদিত ৫ বছর মেয়াদি চুক্তিতে শুকনো মওসুমে বাংলাদেশ গংগা নদীর ৮০ ভাগ পানি পাওয়ার গ্যারান্টি ক্লজ ও বিরোধ নিরসনে সালিশী ক্লজ সংযোজিত ছিলো। কিন্তু ১৯৯৬ সনের ১২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত

চুক্তিতে বন্যা ও খরা দেখা দিলে পানি প্রবাহের হার কত হবে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই।

একজন নদী বিশেষজ্ঞ বলেন, "বাংলাদেশ ভাটির দেশ হিসেবে ভারতের সাথে অভিন্ন নদীসমূহের পানিতে ন্যায়পরায়ণতা ও যৌক্তিকতার নীতি অনুসারে শুষ্ক মওসুমে চাহিদার নিম্নতম পরিমাণ পানি পাওয়ার অধিকার রাখে। ফলে ফারাক্কা চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ না থাকা ভারতকে অসম সুবিধা প্রদান করেছে।

অপরপক্ষে দু'দেশের চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষ সালিশীর সুবিধা রাখা অপরিহার্য ছিলো। ফারাক্কা চুক্তিতে এই সালিশীর সুবিধা না থাকায় ভারতের কোন অন্যায় আচরণ বা চুক্তির শর্তভংগের কারণে কোথাও নালিশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ।"[১১]

ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর পানি প্রত্যাহার ও গতিপথ পরিবর্তনের জন্য যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো হলো :

১. ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের অনেকগুলো নদী মরে গেছে। যেমন, গড়াই নদী (কুষ্টিয়া-মাগুরা), চিকনাই নদী (নাটোর-পাবনা), বড়াল নদী (নাটোর-পাবনা), মুসা খান নদী (নাটোর), মানস নদী (বগুড়া), হরিহর নদী (যশোর), মুক্তেশ্বরী নদী (যশোর), হরাই নদী (রাজবাড়ী), কালিগঙ্গা নদী (ঝিনাইদহ), ভৈরব নদী (মেহেরপুর-চুয়াডাংগা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-বাগেরহাট), পালং নদী (শরিয়তপুর), বামনি নদী (লক্ষীপুর-নোয়াখালি), হামকুড়া নদী (খুলনা) এবং মুড়িচাপ নদী (সাতক্ষীরা)।

   আরো কতোগুলো নদী মরার পথে। যেমন, করতোয়া নদী (পঞ্চগড়-নীলফামারি-রংপুর-বগুড়া-সিরাজগঞ্জ), ইছামতি নদী (পাবনা), নবগঙ্গা নদী (চুয়াডাংগা-ঝিনাইদহ-মাগুরা), চিত্রা নদী (নড়াইল-চুয়াডাংগা-ঝিনাইদহ), ভাদ্রা নদী (যশোর-খুলনা) এবং কুমার নদী (কুষ্টিয়া-মাগুরা-ঝিনাইদহ-ফরিদপুর-মাদারিপুর)।

২. "শুষ্ক মওসুমে বাংলাদেশের বৃহত্তর সেচপ্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের ৩ লাখ একর জমিতে সেচের জন্য পানির দুস্প্রাপ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিস্তা নদীর বাঁধের নিকটে শুষ্ক মওসুমে এখন জেগে উঠেছে বিস্তৃত বালুচর এবং বর্ষায় দেখা দিচ্ছে মারাত্মক প্লাবন

---

[১১]. শেখ ফজলে এলাহী, আন্তর্জাতিক নদী আইন ও বাংলাদেশ-ভারত পানিবিরোধ, পৃষ্ঠা-৬৯।

ও বন্যা। ফলে যে জায়গায় এক সময় ছিল সবুজ ধানের সমারোহ, সেখানে দেখা দিয়েছে মরুকরণের আলামত।

৩. যখন গঙ্গা বেসিনের উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে এবং হিমালয়ের বরফ গলতে থাকে তখন ফারাক্কা ব্যারেজে পানির প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। পানির চাপ এড়ানোর জন্য তখন প্রকল্পের সবকটি (১০১টি) স্লুইস গেট খুলে দেয়া হয়। ফলে বাংলাদেশে দেখা দেয় অকাল বন্যা।

৪. ফারাক্কা ব্যারেজের প্রভাবে দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে বাংলাদেশের পানির স্তর। প্রতি বছর পানির স্তর নেমে যাচ্ছে প্রায় ৫ ফুট করে। ভূগর্ভস্থ পানির প্রায় ৮০ ভাগ বন্যার পানি থেকে সঞ্চিত হয়। ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে কয়েক বছর পরে ইরি-বোরো চাষের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়।

৫. ফারাক্কায় গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে নদীর স্রোত হ্রাস পাওয়ায় দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প শহর খুলনা রূপসা নদীতে লবণাক্ততা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সেখানে নদীর পানি খাবারের জন্য ব্যবহার করা দূরের কথা, কল-কারখানায় ব্যবহারের জন্যই অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

৬. গঙ্গা নদীর পানি দ্বারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পলিমাটি জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করার প্রাকৃতিক পদ্ধতি এখন বিপর্যস্ত। ফলে দিন দিন জমিতে রাসায়নিক সারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. ইতোমধ্যে ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণের লক্ষণ শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণাঞ্চলের জীববৈচিত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[১২]

জামায়াতে ইসলামী ভারত কর্তৃক গংগা নদীর পানি যথেচ্ছা প্রত্যাহার করার বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই প্রতিবাদ করে এসেছে। বিষয়টির ন্যায্য সমাধানের জন্য জাতিসংঘে উত্থাপনের দাবি জানিয়ে এসেছে। এছাড়া ১৯৯৬ সনে স্বাক্ষরিত গ্যারান্টি ক্লজবিহীন ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তিও যে বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে সব সময়ই বক্তব্য দিয়ে এসেছে।

---

[১২]. শেখ ফজলে এলাহী, আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ-ভারত পানি বিরোধ, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত তথাকথিত 'শান্তি চুক্তি'র প্রতিবাদ

বাংলাদেশের এক-দশমাংশ ভূমি জুড়ে পর্বতের (পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) অবস্থান। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, গারো, ত্রিপুরা, মারমা, চাক, খীয়াং, মুরং, পাংখো, তনচংগ্যা, হাজং, মাহাতো, মুন্ডা, ওঁরাও, রাজংশী প্রভৃতি উপজাতি বসবাস করে।

বৃটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমে চট্টগ্রাম জেলারই অংশ ছিলো। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি নতুন জেলা গঠন করা হয়। ১৯০০ সালের ১৭ জানুয়ারি The Chittagong Hill Tracts Regulation-1900 জারি করা হয় এবং জেলাটিকে একজন ডেপুটি কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৬৫ সনের ১৮ জুন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য ছাত্র সমিতি' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। পরের বছর অনন্ত বিহারী খীসা এবং জে. বি. লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি (আদিবাসি) কল্যাণ সমিতি' নামে আরো একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ক্রমশ উপজাতীয়দের একাংশের মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রকট হয় যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন বিচ্ছিন্নতার পথ পরিহার করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতে মিশে যেতে। ১৯৭২ সনে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশী জাতিসত্তার বদলে বাঙালী জাতিসত্তার বিষয়টিকে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা দিলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (১৯৭২-৭৫ এ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য) এর প্রতিবাদ করে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে স্মারকলিপি দেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের অসন্তোষ উত্থাপন করে তা সমাধানের দাবি জানান। শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বাঙালি হয়ে যাবার কথা বলেন। তিনি বলেন 'যা বাঙালি হইয়া যা'। শেখ মুজিবের এই প্রস্তাবে নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বকীয় জাতিসত্তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপজাতীয়রা বিচলিত বোধ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনের ২৯ জানুয়ারি চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাজা মং প্রু সাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে আরেকটি পার্বত্য প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তবে তারা তাদের দাবিগুলো রেখে যান।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে উপজাতীয়দের চার দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবীগুলো ছিল :

১. পাবর্ত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি'র অনুরূপ সংবিধি বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজন।

৩. উপজাতীয় রাজাদের দফতরগুলো সংরক্ষণ।

৪. সংবিধানে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন'-নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যে চার দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন তার একটিও পূরণ না করে তিনি পাহাড়িদের বাঙালী হয়ে যাবার কথা বলায় পাহাড়িরা মারমুখী হয়ে উঠে। মূলত এ কারণেই সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭২ সনে দেশে যে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাতে সই করেননি।

শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দাবিকে উপেক্ষা করেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ত্রিদিব রায়ের মা বিনীতা রায়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান। ত্রিদিব রায় তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায় বাংলাদেশে ফিরে আসতে অস্বীকার করেন। ১৯৭৩ সনে রাঙ্গামাটির এক নির্বাচনী জনসভায় চাকমা রাজার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দেন।

শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের চার দফা দাবী প্রত্যাখ্যান করার পর উপজাতীয়রা উপলব্ধি করলো যে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করা ছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

"... চার দফা দাবী আদায় ও আওয়ামী লীগ সরকারের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনামলেও আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বাধীন 'জনসংহতি সমিতি' ৭ জানুয়ারি ১৯৭৩

সালে 'শান্তিবাহিনী' নামে একটি সশস্ত্র উইং গঠন করে। ১৯৭৩ সালে গঠিত হলেও এর কার্যকলাপ ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের পর অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপ এ সময়ে বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের চাকমা গেরিলাদের সহযোগিতা।"

"... জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তিবাহিনীর নেতা শন্তু লারমা ও চবরি মারমা ১৯৭৬ সালে সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়। এ সময় শান্তি বাহিনীর নেতৃত্বে আসেন প্রীতিকুমার চাকমা। ১৯৮১ সালে শান্তি বাহিনীর সাথে সরকারের আলোচনার শর্ত হিসেবে শন্তু লারমা ও চবরি মারমা মুক্তি পেয়ে পাহাড়ে ফিরে আসেন।"[১৩]

একটি উপদলীয় কোন্দলের ফলে ১৯৮৩ সনের ১০ নভেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন। "শান্তি বাহিনী" লারমা গ্রুপের নেতৃত্ব লাভ করেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা।

বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়াস চালান।

১৯৯৬ সনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর শন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এটি ছিলো একটি অসম চুক্তি। এই চুক্তি স্বাক্ষর করে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে ফেলে। এই চুক্তি অনুযায়ী উপজাতিগুলোই পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির মালিক। সেখানে বসবাসকারী অ-উপজাতীয় লোকেরা জমির মালিকানা ভোগ করতে পারবে না। আবার গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করবে উপজাতির লোকেরাই।

১৯৭৬ সনের ২০ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম The Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance ১৯৭৬ জারি করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়।

---

১৩. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধানের উপায়, সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন-২০১০, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃষ্ঠা-১৬৮।

১৯৮৯ সনে "রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ", "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এবং "বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" আইন প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়।

এই আইনের ৬৪নং ধারায় বলা হয় 'পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গাজমি পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত রূপ জায়গাজমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (protected) ও রক্ষিত (reserved) বনাঞ্চল, রাষ্ট্রীয় জায়গাজমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হতে পারে এইরূপ কোন জায়গাজমি বা বনের শিল্প-কারখানা এলাকা সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।'

শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকারগুলোর নাম হয় "রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ", "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ" এবং "বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ"।

পূর্ববর্তী আইনের ৬৪ নাম্বার ধারার পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারাটি সংযোজিত হবে বলে স্থিরিকৃত হয়:

'পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গাজমি পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।'

'পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও এর সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।

তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সমন্বয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ" গঠনের বিধান রাখা হয় এই চুক্তিতে।

‘পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদ মর্যাদা একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ হবে এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।’

‘যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদেরকে রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমির সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।’

‘সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সাথে সাথে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জিলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রামু ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থানীয় নিবাসে ফেরত দেয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময় নির্ধারণ করা হবে’ ইত্যাদি।

১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটিকে “শান্তিচুক্তি” বলা হয়।

জামায়াতে ইসলামী এই অবিজ্ঞজনোচিত এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুদান, আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা ও ভারতের পুশ-ইনের নিন্দা ১৯৯৮

সুদান ও আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপনাস্ত্র হামলার ১০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন রকম সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ না করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২৯ আগস্ট ১৯৯৮ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন ঃ

ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ সুদান ও আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপনাস্ত্র হামলার ১০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থকে অদ্যাবধি সুদান ও আফগানিস্তানের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ না করায় আমি তীব্রনিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। গোটা মুসলিম উম্মাহর সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের বন্যাপীড়িত জনগণ তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করায় আমরা দেশ বাসীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

দেশবাসী ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছে যে, সুদান ও আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দায়সারা গোছের একটি বক্তব্য প্রদান করেই কর্তব্য শেষ করা হয়েছে। এ ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় সরকারের দুর্বল ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতিরই প্রকাশ পেয়েছে। ওআইসির সদস্যভুক্ত ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ সুদান এবং আফগানিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায় ও অমানবিক ক্ষেপনাস্ত্র হামলার কঠোরভাষায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো এবং আক্রান্ত ভ্রাতৃপ্রতীম রাষ্ট্র দুটোর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা ছিল বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং ধারানুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিলম্ব হলেও মার্কিন হামলার কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন ও সংশ্লিষ্ট ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ দুটোর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পূর্বক তাদের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সাংবিধানিক ও মানবিক দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশবাসী উদ্বেগ ও ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছে যে, দেশে যখন ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং দেশের কোটি কোটি লোক বন্যার পানিতে ভাসছে, এবং চরম দুর্দশার মধ্যে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে আধিপত্যবাদী ও আগ্রাসী ভারত পুশইনের অপচেষ্টা চালিয়ে সীমান্তে উত্তেজনা

সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশে পুশইনের অপচেষ্টা চালিয়ে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মারাত্মক আগ্রাসী হুমকি সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকারের এ অন্যায় ও অমানবিক আচরণের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্বল নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণেই বার বার ভারত পুশইন সমস্যা সৃষ্টি করে সীমান্তে উত্তেজনা জিয়িয়ে রাখছে এবং আমাদের দেশের বি.ডি.আর. ও বেসামরিক নাগরিকদের বি.এস.এফ. দিয়ে হত্যা ও হয়রানী করে চলেছে। ভারতের এ আগ্রাসী তৎপরতার সমুচিত জবাব প্রদান এবং বিষয়টি জাতিসংঘ সহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।

ভারত-বাংলাদেশ বৈরী সম্পর্কের কয়েকটি কারণ ও ধরন :

১. বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ত রেখার স্থায়ী করার দাবিকে ভারত সরকার কখনো গুরুত্ব দেয়নি, প্রকৃত কারণ রহস্য জনক...।

২. সীমান্তের ছিটমহলগুলোর সমস্যার ব্যাপারে ভারত সরকারের সামান্য আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ বেরুবাড়ি ভারতকে দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু শক্তিমান ভারত তিন বিঘার দখল আজ পর্যন্ত ছাড়েনি।

৩. ফারাক্কা বাঁধ ও অন্যান্য বাঁধের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি যথা সময়ে না দেয়ার ফলে বাংলাদেশ শুকনো মওসুমে মরুভূমির অবস্থায় পতিত হয় এবং বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানিতে বন্যায় দেশ ভেসে যায়, দেশবাসীকে অবর্ননীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

৪. পশ্চিম বংগে শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার সদস্য ফনীভূষণ মজুমদার ও চিত্তরঞ্জন সূতার (সাবেক এমপি) কর্তৃক পরিচালিত তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন এখনো কালিদাস বৈদ্য প্রমুখের নেতৃত্বে চলছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে তারা তৎপর, এর পরিনাম কি হবে?

৫. ভারত সরকার বাংলাদেশকে তাদের অবাধ বাজার মনে করে। তাই ভারতের সাথে পণ্য বিনিময়ে তারা আন্তর্জাতিক বিধিমালার ধার ধারে না। বাংলাদেশ ভারত থেকে যে পরিমান পন্যদ্রব্য খরিদ করে, ভারত এর এক পঞ্চমাংশ খরিদ করে না। তাই বাংলাদেশ প্রতি বছর বিরাট বাণিজ্য ঘাটতির শিকার হচ্ছে, অসম বাণিজ্য চলছে।

৬. বাংলাদেশের একমাত্র খনিজ সম্পদ গ্যাস। দেশের জনগণের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত করা সম্ভবপর হয়নি। অথচ এ গ্যাস ভারতে রফতানি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এভাবে বাংলাদেশের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার হীন প্রচেষ্টায় ভারত সরকার লিপ্ত। তাদের এ আচরণ বন্ধুসুলভ তো দূরের কথা, সৎ প্রতিবেশী সুলভও হতে পারে না। বাংলাদেশ সকল প্রকারে ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করছে। কিন্তু তা দেখা যায়, এক তরফা কিন্তু ভারত বন্ধু নয়, প্রভূসুলভ, আধিপত্য আচরণ বাড়িয়েই চলেছে।

কসোভোর মজলুম মুসলমানদের পক্ষে আমীরে জামায়াত

কসোভোর মুসলমানদের স্বাধীনভাবে বাঁচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ২৫ মার্চ, ১৯৯৯ তারিখে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে জামায়াত প্রধান বলেন যে, যুগোশ্লাভিয়ার সামরিক লক্ষ্য বস্তুতে ন্যাটোর বিমান হামলা শুরুর পদক্ষেপটি একটি শুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে শান্তিকামী বিশ্ববাসীর নিকট। যুগোশ্লাভিয়ার অমানবিক হামলা থেকে কসোভোর নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষার জন্য ন্যাটোর পক্ষ থেকে এ ধরণের একটি প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ বহু পূর্বেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। দেরীতে হলেও ন্যাটোর সামরিক পদক্ষেপকে আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমীরে জামায়াত বলেন, কসোভোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এ পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। চূড়ান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে কসোভোর মুসলমানদের প্রাণের দাবি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র কাম্য। কসোভোকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদান করে সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অধ্যাপক আযম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন, রাশিয়া এবং জাতিসংঘ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান।

দৈনিক ইনকিলাব কর্তৃপক্ষের প্রতি নিজামীর সমবেদনা (এপ্রিল ১৯৯৯)

"দৈনিক ইনকিলাবের" ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মাওলানা এম.এ. মান্নান ও সম্পাদক এ.এম. বাহাউদ্দীনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সোনালী ব্যাংক কর্তৃক সাজানো মিথ্যা মামলা দায়েরে জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান এবং সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্যাংকের লেনদেন পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করা সত্ত্বেও হয়রানীমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের অনাকাংখিত, অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। এ ধরনের অনৈতিক ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিপন্থী।

দৈনিক ইনকিলাবের বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও জনপ্রিয়তায় ভীত হয়েই সরকারের ইন্ধনে ইনকিলাবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। দৈনিক ইনকিলাব জনগণের মুখপত্র, তাই ইনকিলাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণই বানচাল করে দেবে ইনশাল্লাহ। দৈনিক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করার জন্য নেতৃবৃন্দ সরকার সমীপে জোর দাবি জানান।

দৈনিক ইনকিলাব মহা-সম্পাদকের ইন্তেকালে আমীরে জামায়াত

খ্যাতিমান সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মহা-সম্পাদক এ.কে.এম মহিউদ্দীনের ইন্তেকালে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ এক শোকবানীতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি বলেন মরহুমের ইন্তেকালে জাতি একজন সাহসী কলম যোদ্ধাকে হারালো। দেশ ও জাতির এ সংকটকালে তাঁর মতো একজন নির্ভীক কলম সৈনিকের অভাব জাতি প্রকটভাবে অনুভব করছে।

জামায়াত প্রধান মরহুমের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও পত্রিকার সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জনাব আব্বাস আলী খানের ইন্তেকাল ১৯৯৯

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সুলেখক, ইতিহাসবিদ ও প্রবীন রাজনীতিবিদ জনাব আব্বাস আলী খান ৩রা অক্টোবর ১৯৯৯ বেলা ১.১৫ মিনিটে একমাত্র কন্যা ও পিতৃহীন নাতি-নাতনীদের রেখে ঢাকাস্থ ইবনে সিনা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

৪ঠা অক্টোবর অপরাহ্ন ২.১০ মিনিটে ঢাকার পল্টন ময়দানে মরহুমের প্রথম নামাজ-ই-জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী জানাজার নামাজে ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। ঐ দিনই আমীরে জামায়াত সৌদী আরব থেকে ফিরে আসেন। জানাজা নামাজে বিশিষ্ট রাজনীতিগণ, ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক মিশনের সদস্য বৃন্দ, ছাত্র নেতা, শ্রমিক নেতা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার বহু গণমান্য ব্যক্তিবর্গ শরীক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, সাবেক মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আবদুল মতিন চৌধুরী, এম. শামসুল ইসলাম, সালাহ উদ্দীন কাদের চৌধুরী, ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার, সাবেক চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল মাহবুবুর রহমান, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া, মাওলানা মহীউদ্দীন খান, ব্যারিস্টার এ. আর. ইউসুফ, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, অধ্যক্ষ মাসউদ খান, কমরেড মেহেদী, আনিসুর রহমান, গোলাম মাওলা চৌধুরী, শফিউল আলম প্রধান প্রমুখ। এ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত বহু সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা জানাজায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সৌদী আরব, ফিলিস্তিন ও লিবিয়ার রাষ্ট্রদূতগণ, ইরান, পাকিস্তান সহ বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশের কূটনীতিকগণ জামায়াত নেতার জানাজায় যোগদান করেন। প্রবীন সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী, সাংবাদিক নেতা রুহুল আমীন গাজীসহ বহু সাংবাদিক জনাব খানের জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জামায়াত ও শিবিরের কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা মহানগরীর নেতৃবৃন্দসহ সকল কেন্দ্রীয় ও মহানগরী ও জেলা আমীর ও হাজার হাজার ভক্ত কর্মী সমর্থক ছাত্র জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানাজায় শরীক হয়। জোহরের নামাজ শেষ হবার সাথে সাথেই পল্টন ময়দান এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

জানাযা শেষে কফিন খুলে দেখানো হয় জনতাকে। সারিবদ্ধ হয়ে লোকজন মরহুম খান সাহেবের প্রশান্ত মুখ দেখে সাশ্রু নয়নে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এভাবে কেটে যায় প্রায় দেড় ঘন্টা। কান্না জড়িত কণ্ঠে মুহতারাম সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নিজামী কলেমায়ে তাইয়্যেবা পড়তে থাকেন। সাথে সাথে পড়তে থাকেন শোকার্ত কর্মী ও নেতৃবর্গ এবং জনতা।

বেলা তিনটায় কফিন পাঠানো হয় আবার মহাখালী আই.সি.ডি.ডি.আর. বি-এর হিমাগারে। উল্লেখ্য, গত রাত্রে বারডেম, সিএমএইচ কিংবা অন্য কোথাও হিমাগারে জায়গা না পেয়েই অফিসের কনফারেন্স কক্ষে থেকে রাত ১০টার দিকে মহাখালী উক্ত হিমাগারে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিকেল ৪টায় নায়েবে আমীর শামসুর রহমান, জনাব মাস্টার সফিকউল্লাহ এবং মাওলানা আবদুস সুবহান মরহুমের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কফিনের আগেই তার পৈতৃক জেলা সদর জয়পুরহাট রওয়ানা হয়ে যান।

জয়পুরহাটে শেষ যাত্রা

৪ অক্টোবর সন্ধ্যার পর রাত সাড়ে নয়টায় মরহুম জননেতার কফিনবাহী এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা নিজামী জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দসহ জয়পুরহাটে রওয়ানা হন।

রাত সোয়া একটায় বগুড়া শহরের বনানী সুলতানগঞ্জ হাইস্কুল ময়দানে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন মরহুমের দীর্ঘদনের সাথী আরেক বয়োবৃদ্ধ নেতা মাওলানা আবদুর রহমান ফকির, সাবেক এমপি। ৫ অক্টোবর ১৯৯৯ মরহুমের শেষ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জয়পুরহাট শহরের পার্শ্ববর্তী সিমেন্ট কারখানা ময়দানে। সুদূর রংপুর, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা এমনকি পদ্মা-যমুনার ওপার থেকে বন্যার স্রোতের মতো এত বিশাল জন-সমাবেশ হয় যে মরহুমের প্রতিষ্ঠিত তা'লিমুল একাডেমী ময়দানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বড় ময়দানে যেতে হয়। শেষ জানাজায় ইমামতি করেন মরহুম জননেতার একান্ত সহকর্মী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও পরবর্তীকালে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

জয়পুরহাট জেলা শহরের প্রশস্থ রাজপথ ঘেঁষে তার বাড়ির আঙ্গিনার পাশে রয়েছে তাঁর নিজ হাতে গড়া ইসলামী পাঠাগার। তারই পাশে সমাহিত করা হয় মরহুম আব্বাস আলী খানকে।

জনাব আব্বাস আলী খান (১৯১৪-১৯৯৯)

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, নিঃস্বার্থ রাজনীতিবিদ, সুসাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান বাংলা ১৩২১ সালের (ইংরেজী ১৯১৪ সাল) ফালগুন মাসের শেষ সপ্তাহের সোমবার দিন বেলা ৯ ঘটিকায় জয়পুরহাট জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি নিজ ঘরেই মৌলভী সাহেবের কাছে পবিত্র কুরআন শরীফের সবক নেন এবং ১৯২১ সালে ৮ বছর বয়সে মাদরাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ৪র্থ শ্রেণীতেই তিনি শেখ সা'দী (র.) এর গুলিস্তা কিতাব রপ্ত করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উঠার পর তিনি বাড়ী থেকে দুইশত মাইল দূরে হুগলী মাদরাসায় পড়তে যান। শরীরে জ্বর নিয়ে "সিক বেডে" পরীক্ষা (ষষ্ঠ শ্রেণীতে) দিয়েও তিনি এক বছর স্থায়ী গভর্ণমেন্ট স্কলারশীপ এবং ৪ বছর স্থায়ী মহসিন স্কলারশীপ লাভ করেন।

হুগলী মাদরাসায় পড়াশুনা শেষ করে রাজশাহী সরকারি কলেজ এবং রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কোলকাতা যান।

পরবর্তীতে অভিভাবকদের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি চাকুরীতে যোগদান করেন। খান সাহেবের নামায পড়া অফিসের বড় কর্তা ভালভাবে নিতেন না। তাই তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন। কোলকাতায় থাকাকালীন জনাব খান মাওলানা আবুল কালাম আযাদের জুমার খুতবায় প্রভাবিত হন। পরবর্তীতে তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ও হিযবুল্লাহ বই দুটি অধ্যয়ন করেন এবং আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ভাব অবলম্বনে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখেন যা মাসিক মোহাম্মদী ও তৎকালীন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মুসলিম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জনাব খান ১৯৩৬ সালের শেষদিকে আবার চাকুরিতে যোগদান করেন এবং বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটে থাকাবস্থায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সেক্রেটারী হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সার্কেল অফিসার হিসাবে নিয়োগ পান। কিন্তু তিনি সে পদে যোগদান করেননি। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে জয়পুরহাটে স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টারের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৫৪ সালে স্থানীয় একটি মাদরাসায় ইসলামী জলসা চলছিল। তাঁরই ছাত্র উক্ত মাদরাসার সেক্রেটারীর অনুরোধে তিনি সে জলসায় উপস্থিত হন। জলসায়

প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন কারমাইকেল কলেজের তরুণ শিক্ষক অধ্যাপক গোলাম আযম (পরবর্তীতে আমীরে জামায়াত)।

আব্বাস আলী খান সাইকেলে চড়ে সভাস্থলে পৌঁছেন এবং সভায় অধ্যাপক গোলাম আযমের মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। সভাশেষে এক সাথে খাওয়া-দাওয়া ও পরিচয় হয়। জনাব খান অধ্যাপক সাহেবের কাছ থেকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) এর লেখা কিছু বই পুস্তক ক্রয় করেন।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারীতে জনাব আব্বাস আলী খান বগুড়ার দায়িত্বশীল শায়খ আমীন উদ্দিনের সাথে দেখা করে মুত্তাফিক ফরম পূরণ করেন এবং নিজ এলাকায় একটি ইউনিট কায়েম করেন। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হন এবং তদানীন্তন রাজশাহী বিভাগের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জনাব আব্বাস আলী খান-এর রুকনিয়াতের শপথ বাক্য পাঠ করান।

মাওলানা মওদূদী (র.) ১৯৫৬ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে খান সাহেব মাওলানা মওদূদীর (র.) সান্নিধ্যে আসেন। খান সাহেব খুব ভালো উর্দু জানতেন, তাই তিনি মূল উর্দু ভাষায় মাওলানার সবগুলো বই পড়ে ফেলেন এবং মাওলানার সান্নিধ্যে থেকে মাওলানার বক্তৃতা এবং আলোচনা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। মাওলানার দ্বিতীয় বার পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন ১৯৫৮ সালে। এ সফরে তিনি রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও রাজশাহীতে যেসব জনসভা ও সমাবেশে বক্তৃতা করেন, মরহুম খান সাহেব সেসব সভা সমাবেশে মাওলানার দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে সংগঠনের নির্দেশে তিনি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরি ত্যাগ করেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং ছাত্ররা তাঁকে কিছুতেই স্কুল থেকে ছাড়তে চাচ্ছিল না। এমনকি স্কুলের শত-শত ছাত্র এসে তাঁকে স্কুলে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। তিনি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতের মাছিগোট সম্মেলনে রওনা করে এ ঘেরাও থেকে রক্ষা পান।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাছিগোটে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। এ বছরই তাঁর উপর রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্যাকিস্তান আমলের শেষ পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং জাতীয় পরিষদে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। জনাব খান জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা হিসেবে আইয়ুব খানের কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিলের জন্য ১৯৬২ সালের ৪ঠা জুলাই জাতীয় পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করেন। অধিবেশন শুরুর আগের দিন ৩রা জুলাই আইয়ুব খান জনাব আব্বাস আলী খানকে তার বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান। জেনারেল আইয়ুব খান তাকে মেহমানদারী করার ফাঁকে প্রস্তাবিত বিলটি জাতীয় পরিষদে পেশ না করার জন্য আকারে ইংগিতে শাসিয়ে দেন। সেই সাথে এর বিরোধীতা করার জন্য মহিলাদেরকে উসকিয়ে দেন। কিন্তু তীব্র বিরোধীতার মুখেও জনাব খান বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। এসময় আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেয়া 'আপওয়া' বাহিনীর উগ্র আধুনিক মহিলারা পিন্ডি, লাহোর ও করাচীতে জনাব খানের কুশ পুত্তলিকা দাহ করে। অবশ্য পাশাপাশি সারাদেশ থেকে জনাব আব্বাস আলী খানের নিকট অজস্র অভিনন্দন বার্তাও আসতে থাকে।

স্বৈরাচারী আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলগুলো 'কপ', 'পিডিএম' এবং 'ডাক' নামে যেসব জোট গঠন করেছিল, তিনি ছিলেন এ জোটগুলোর অন্যতম নেতা। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যূত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রী সভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার জনাব খানকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এ সময়ে তিনি দু'বছর কারাভোগ করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জনাব আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালের রমযান মাসে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমকে যখন জেলে নেয়া হয় এবং ১৬ মাস বন্দী করে রাখা হয়, তখনো তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া আমীরে জামায়াত যখনই দেশের বাইরে গিয়েছেন, তখন তিনিই ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী ভারতপন্থীরা একতরফাভাবে নানা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল। এমনি একটি বৈরী পরিবেশে কঠিন পরিস্থিতিতে জনাব আব্বাস আলী খানকে জামায়াতের হাল ধরতে হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সাংবাদিক সম্মেলনসহ সভা-সমাবেশে যুক্তিপূর্ণভাবে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করে আল্লাহর মেহেরবাণীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রতি জনাব খানের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ও উর্দু ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল এবং এসব ভাষায় তিনি সাবলীল বক্তৃতা দিতে পারতেন। অতি ব্যস্ততা সত্ত্বেও জনাব খান গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের কাজ করে গিয়েছেন নিরলসভাবে। এ ছাড়া সমসাময়িক নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতেন তিনি । তাঁর আত্ম-স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' শুধু সুখপাঠ্যই নয়, তদানিন্তন সমাজের একটা দর্পনও বটে। লন্ডন সফরের উপর তাঁর লেখা 'যুক্তরাজ্যে একুশি দিন' এবং আমেরিকা-কানাডা সফরের উপর লেখা 'বিদেশে পঞ্চাশ দিন' যেমন উপভোগ্য তেমনি তথ্যবহুল ও শিক্ষণীয়। অনুবাদ ও মৌলিক রচনা মিলিয়ে জনাব আব্বাস আলী খানের প্রায় পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন দূর্যোগ ও বন্যায় জামায়াতের ভূমিকা (১৯৯৮-২০০০)

বাংলাদেশে যখন যেখানেই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে, দুঃস্থ ও মানবতার কল্যাণে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সেখানেই এগিয়ে গেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে ২০০০ সাল পর্যন্ত অনেক বারেই বন্যায় এদেশের ভায়নক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তবে ১৯৮৮, ১৯৯৮ এর ভয়াবহ বন্যা, ১৯৯১ এর টর্নেডো এবং কয়েক বারের ঘূর্ণিঝড় এবং অসংখ্যবার অগ্নিকান্ডের কথা অনেকেরই স্মরণ থাকার কথা। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ-উত্তর রিলিফ বিতরণ, পুনর্বাসন ও চিকিৎসা কাজে জামায়াত এগিয়ে এসেছে।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যাশোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশপূর্বক জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রবীন

আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে আমীরে জামায়াত বলেন-

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তবর্তী ভারতের পশ্চিম বংগে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় ফারাক্কাসহ বিভিন্ন বাঁধ খুলে দেয়ার ফলেই বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে হঠাৎ করে বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফারাক্কা শুধু বাংলাদেশেরই নয়, পশ্চিম বংগের মরণ ফাঁদ এবং অভিশাপ। তাই মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে দাও, গুড়ীয়ে দাও দাবিতে আমরা সেই পাকিস্তান আমল থেকে দাবি করে এসেছি এবং এক্ষনে পশ্চিম বংগের ভুক্তভোগী জনগণও ফারাক্কার অভিশাপ থেকে বাঁচার দাবিতে সোচ্চার। ফারাক্কা বাঁধের সাহায্যে ভারত শুকনো মওসুমে বাংলাদেশকে শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত করে। ফারাক্কার বাঁধগুলো এবং পশ্চিম বংগের অন্যান্য স্থানের বাঁধগুলো খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে বন্যার পানিতে ভাসিয়ে ভারতের পানিসম্পদ ও সেচ প্রতিমন্ত্রী এসেছেন বাংলাদেশের সাথে আলোচনা করতে। এর চাইতে নির্মম পরিহাস আর কী হতে পারে?

বন্যার পানিতে লক্ষ লক্ষ একর জমির ফসল ডুবে গেছে, লক্ষ লক্ষ লোক পানি বন্দী অবস্থায় আছে, বন্যা দুর্গত লোকেরা অনাহারে-অর্ধাহারে কোনমতে বেঁচে আছে। ইতোমধ্যে বন্যার করাল গ্রাস গৃহপালিত পশু ও মাছ-গাছ ব্যতীত বেশ কিছু বনি আদমও প্রাণ হারিয়েছে। বন্যা পীড়িত এলাকায় খাদ্য, বিশুদ্ধ খাবার পানি, চিকিৎসা সামগ্রী সহ চিকিৎসক ও আশ্রয় স্থানের অভাবে মানুষ চরমভাবে বিপন্ন।

এমতাবস্থায়, বন্যাদুর্গত অঞ্চলের পানি বন্দী লোকদের দ্রুত উদ্ধার আশ্রয়হীনদের জন্য ত্রাণশিবির ও লঙ্গরখানা খুলে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আমীরে জামায়াত সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। সেই সাথে বন্যা কবলীতদের সম্ভাব্য সাহায্যে অবিলম্বে এগিয়ে আসার জন্য জামায়াত প্রধান বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিত্তশালী দানশীল ব্যক্তিবর্গ এবং সর্বোপরি জামায়াত নেতা কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল আরো ভয়াবহ নজির বিহীন ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ। প্রায় আড়াই মাস ব্যাপী এই বন্যা দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টি জেলার প্রায় থানাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৫২টি জেলার মধ্যে বন্যায় যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সংখ্যা ৬ কোটির মতো হবে, এর মধ্যে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২কোটি লোক যারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলের নেতা এবং পরবর্তীকালে কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দৈনিক সংগ্রামের মুক্ত মঞ্চে এক সাক্ষাৎকারে উপরিউক্ত তথ্যাদি দিয়ে বলেছেন, বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারীয়েটের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় আছে কিনা, কিছু তথ্য প্রমাণ দিয়ে জামায়াত নেতা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন।

তিনি আরো বলেন, আমাদের উজানের দেশ ও আধিপত্যবাদী ভারত নদীর স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ করায় বাংলাদেশী নদী সমূহ নাব্যতা হারিয়েছে এবং বন্যার ভয়াবহতা বেড়েছে। এটা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বন্যার আশংকা আরো বাড়বে। এ জন্য এক দিকে নদী খনন ও বেড়ীবাঁধ সংস্কারের যেমন প্রয়োজন, তেমনি উজানের দেশের সাথে অর্থবহ ও আন্তরিক আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেয়াটাও অপরিহার্য। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সফল না হলে আন্তর্জাতিক ফোরামের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন।

প্রসংগত: আরো স্মরণ করা যায়, ২৮ আগস্ট ১৯৯৮ আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এক যুক্ত বিবৃতিকালে দেশে বিরাজমান ভয়ানক বন্যার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যে ৩১ আগস্ট সারাদেশে মসজিদে মসজিদে দোয়ার অনুষ্ঠান আয়োজনের আহ্বান জানান।

চট্টগ্রামে শিবিরনেতা হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন

ইসলামী আন্দোলন নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের শিকার যুগ যুগ ধরে। রক্তস্নাত জয়-পরাজয়ের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে এর গৌরবময় সংগ্রামী ইতিহাস। আবহমান কাল থেকেই দেখা গেছে আলো-আঁধার, সত্য-মিথ্যার তথা হক ও বাতিলের এই দ্বান্দ্বিক ভয়াবহ যুদ্ধ। জানমাল দিয়ে এ যুদ্ধে শরীক হওয়া প্রতিটি মোমেনের জন্য ফরজ।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জাহেলীয়াতের ধ্বংস-স্তূপের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার এক বিপ্লবী কাফেলার নাম। এদেশের আশাহত ও বিভ্রান্ত ছাত্র জনতাকে ধ্রুবজ্যোতি তারার মতো পথের দিশা দেখিয়ে চলছে এ শহীদি কাফেলা। ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ইতোমধ্যে শত-শত তরুনের শাহাদাত ও কোরবানী সংগঠনের ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত।

শহীদি ঈদগাহে চট্টগ্রাম মহানগরীর ত্যাগের ইতিহাস শুরু হয় ১৯৭৮ সালে মোহসিন কলেজের ছাত্রনেতা আবদুল আজিজের পা হারানোর মাধ্যমে, বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আলোতে যে বিরানভূমিতে প্রথম উদ্ভাসিত হয় যে বন্দরনগরীর অপর নাম ইসলামাবাদ, সেই চট্টগ্রামের দ্বীনের দায়ী হিসেবে বুকের তাজা রক্ত যারা ঢেলে ছিলেন, সেই শহীদদের মধ্যে রয়েছেন জাফর, জাহাঙ্গীর, বাকী বিল্লাহ, আমির হোসাইন, আবদুর রহীম, ডা. মিজানুর রহমানসহ আরো অনেক প্রতিশ্রুতিশীল টগবগে কিশোর তরুণ প্রাণ।

১৯৯৯ সালের ২১ অক্টোবর, সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়ে রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরের দিন ২২ অক্টোবর হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র শহীদ আনসার উল্লাহ তালুকদার। ১৯৮২ সাল থেকে কালানুক্রমানুসারে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সে ১০৪ তম শহীদ।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী উক্ত ছাত্র নেতা নিহত হবার নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এই ঘটনার মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসীবাদী একদলীয় চরিত্রই অত্যন্ত নগ্নভাবে আরেকবার প্রকাশিত হলো।

জনাব নিজামী বলেন, সভা সমাবেশ করার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার। এ অধিকারে বাঁধাদান সম্পূর্ণ অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক কাজ। সরকার পুলিশ বি.ডি.আর দিয়ে চট্টগ্রামে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সহ বিরোধী দলগুলোর সভা-সমাবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য বিরোধী দলের সভা সমাবেশে হামলা করে শিবির নেতা আনসার উল্লাহর মাথায় গুলী করে হত্যা করেছে। অন্যদিকে পুলিশ বি.ডি.আর পাহারায় আওয়ামী লীগকে সভা করতে দিয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সরকার অঘোষিতভাবে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করে রেখেছে। সরকারের একদলীয় অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী আচরণের কারণেই বিরোধী দল এক দফার (সরকার পতন) আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে। জামায়াত নেতার আহবানে ২৩ অক্টোবর ১৯৯৯ সারাদেশে গায়েবানা জানাজা ও শোক মিছিল এবং ২৫ অক্টোবর বিক্ষোভ সমাবেশ পালিত হয়। শিবির নেতার শাহাদাত কবুলের জন্য দোয়া এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি জামায়াত নেতা গভীর সমবেদনা জানান।

পল্টনে কর্মী সভায় বোমা হামলার অপপ্রয়াস ১৯৯৯

১৯৭০ সালের ১৭ জানুয়ারি তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী আহূত পল্টন ময়দানে শান্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক জনসভায় একটি চিহ্নিত মহলের সশস্ত্র হামলা ও সভা পন্ড করার ঘটনা একটি কলংক ও দু:খজনক অধ্যায়। ঠিক একইভাবে ১৯ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলনে মঞ্চের নীচে শক্তিশালী বোমা পুঁতে রাখা এবং দুইজন সন্ত্রাসী দুর্বৃত্ত কর্তৃক ৪টি বোমা নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলনে হামলা চালাতে যাওয়ার অপচেষ্টায় তীব্রনিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান ২০ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে প্রবীন জাময়াত নেতা বলেন-

"জামায়াত নেতা ও কর্মীদের বোমা বিস্ফোরনের মাধ্যমে হত্যা করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীগণ এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের কবল থেকে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছেন। দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে সরকার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এটা সরকারের ষড়যন্ত্র কিনা সে সম্পর্কে দেশবাসীর মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলনে হামলা চালাতে যাওয়ার সময় বোমা হাতে যে দু'ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে তাদেরকে যথাযথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসতো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এ ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা সত্বেও দেশবাসী জানতে পারেনি উক্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল হোতা কারা।"

চারদলীয় জোট গঠন ঃ জোটের ঘোষণাপত্র

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসে স্বৈরশাসনের পথই বেছে নেয়। দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৯৯ সনের ৩০ নভেম্বর ২৯ মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী দুঃশাসন থেকে দেশকে উদ্ধার করার সংকল্প নিয়ে চারদলীয় জোট গঠন করেন এবং একটি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দের এই ঐক্য জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। চারদলীয় জোটের ঘোষণাপত্রটি ছিলো নিম্নরূপ :

“আমরা বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দল প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আজিজুল হক আমাদের নিজ নিজ দল, জোট ও সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং আর্থ-সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে দেশবাসীর পক্ষে ঘোষণা দিচ্ছি যে, একের পর এক জনস্বার্থ বিরোধী, রাষ্ট্রঘাতী, সংবিধান বিরোধী, জনগণের ধর্মবিশ্বাস বিরোধী, স্বৈরাচারী ও অমানবিক কর্মকাণ্ড এবং সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত ক্ষমতাসীন সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সকল বৈধতা হারিয়েছে।

আমরা সম্মিলিতভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি, যেহেতু আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিপন্ন, এবং যেহেতু এই সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির সুষ্ঠু ও অবাধ পরিবেশ ধ্বংস করে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দলীয় অস্ত্রবাজির এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সকল নাগরিকের জীবন, জীবিকা, সম্পদ এবং নারীর সম্ভ্রম বিপন্ন করেছে এবং যেহেতু সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন এবং যেহেতু আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার, ভয়-ভীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে একদলীয় ফ্যাসিবাদী কায়দায় রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সরকার রাজপথ দখলের নামে সরাসরি সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে, সমগ্র জাতিকে সরকারের মদদপুষ্ট দলীয় লোকদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি করেছে এবং এই সরকারের অত্যাচার-অনাচার, জেল, জুলুম, নির্যাতন, হয়রানি ও মিথ্যা মামলার কারণে মানবাধিকার লংঘন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং হাজার হাজার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের কারাবন্দী করা হয়েছে, এবং তিনশোরও বেশী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, এবং যেহেতু শুধু নিরস্ত্র মিছিলের উপরেই নয়, সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপরও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক নীতিবোধের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে, এমনকি সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার অপচেষ্টা করতেও সরকার দ্বিধা করেনি এবং যেহেতু এ সরকার তাদের একান্ত বশংবদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতা সম্পূর্ণভাবে কলুষিত করেছে, এ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনসহ কোন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, ক্ষমতাসীন দল জনগণের ভোটাধিকার ছিনতাই করে নির্বাচনকে

কী নিদারুণ প্রহসনে পরিণত করতে পারে লক্ষ্মীপুর, মিরেরসরাই, পাবনা, ফরিদপুর এবং টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচন তার সর্বশেষ জঘন্য উদাহরণ। বিরোধী দলসমূহের ৪-দফা দাবি উপেক্ষা করে একদলীয় একতরফা ভোটারবিহীন পৌরসভা নির্বাচন করে জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান হীনতম দলীয়করণের শিকারে পরিণত করেছে এবং যেহেতু জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে এবং আইনের শাসনকে আজ দলীয় শাসনে পরিণত করা হয়েছে এবং যেহেতু একটি বিশেষ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অনুসরণের কারণে আজ আমাদের নিজস্ব জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার দরুন অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং সরকারের আত্মঘাতী নীতির কারণে দেশে জাতীয় এবং বিদেশী নতুন পুঁজি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে গেছে এবং যেহেতু ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠাসমূহে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যেহেতু সরকারের প্রভু-তোষণ নীতির ফলে বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের চোরাবাজারে পরিণত হওয়ায় দেশের অধিকাংশ শিল্পখাত একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে আর বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছে এবং যেহেতু সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে এবং বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং যেহেতু একদিকে সার, বিদ্যুৎ ও কীটনাশক ওষুধসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত না করার ফলে কৃষক সমাজ এবং কৃষি খাত আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং গ্রামের মানুষ অপুষ্টি, অভাব ও আয়ের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে এবং যেহেতু আজ তিন কোটি কর্মক্ষম বেকার যুবকের জন্য সরকার কর্মসংস্থানের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এবং যেহেতু শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার নানা অপচেষ্টায় সরকারের যোগসাজশে সুস্পষ্ট, এবং মজুরী কমিশনের সুপারিশ প্রণয়ন ও শ্রমিকদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের কোনই উদ্যোগ নেই, এবং যেহেতু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাদের প্রতিনিধিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাকরিচ্যুত ও জেলে পুরে সরকার তাদের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করছে, এবং তিন বছর ধরে পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কর্মচারীদের সাথে শঠতা করছে এবং যেহেতু ক্ষমতায় এসেই এ সরকার শেয়ার মার্কেটে ফটকাবাজারীর সুযোগ ও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ক্ষমতাসীনদের দেশীয় দোসর ও বিদেশী মহাজনরা সাধারণ মধ্যবিত্ত হাজার হাজার পরিবারের আজীবনের সঞ্চয় লুণ্ঠন

করে নিয়েছে। পুঁজি বাজারের সংকটে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে এবং যেহেতু এই সরকার রাষ্ট্রঘাতী লক্ষ্যে আমাদের জাতিগঠনমূলক সকল প্রতিষ্ঠান যথা বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, প্রতিরক্ষাবাহিনী, শিল্প ও বাণিজ্যিক কাঠামোসমূহকে একে একে পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এবং যেহেতু সরকার উচ্চ আদালতকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। বিচারকদের জবাবদিহিতার ভুয়া প্রশ্ন তুলে বিচারকগণকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও মর্যাদাহীন করতে চাইছে এবং যেহেতু সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে সরকার সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার ধুয়া তুলে পর্দার অন্তরালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা করছে।

সমালোচনাকারী সাংবাদিকদের বেছে বেছে জীবননাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে, তাদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে, আর যেসব সংবাদপত্র সরকারের দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ করছে ও সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরছে তাদের বিজ্ঞাপনের প্রাপ্য কোটা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং যেহেতু জাতীয় রেডিও এবং টেলিভিশনকে সরকার দলীয় প্রচার, বিরোধীদলের চরিত্র হনন ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে, এবং যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে সরকার সংবিধান লংঘন করে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ও নতুন অশান্তির বীজ বপন করেছে এবং দেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ড রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করার ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছে এবং যেহেতু তথাকথিত পানি চুক্তিতে গঙ্গার পানির হিস্যার গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তার কোন বিধান এবং চুক্তি ভঙ্গের বিষয়ে কোন সালিশের ব্যবস্থা না রেখে সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যেহেতু দলীয়করণ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অসহায় মানুষকে জিম্মি এবং ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানির হীন ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে এবং যেহেতু সরকার ইসলামী মূল্যবোধ এবং সকল ধর্ম বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও আলেম সমাজের উপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে এবং যেহেতু সরকারের মন্ত্রী, এম.পি, উপদেষ্টা, দলীয় মদদপুষ্ট দালাল এবং অসৎ ব্যক্তিদের সীমাহীন দুর্নীতি ও অস্ত্রধারীদের চাঁদাবাজি দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন ও দুঃসহ করে তুলেছে এবং যেহেতু ট্রান্সশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে করিডোর দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে সরকার জাতীয় স্বার্থ ও অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং যেহেতু সরকার আমাদের সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের আক্রমণ, বিডিআর সদস্য ও

নাগরিকদের হত্যা, জমি এবং সম্পদ দখলের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে;

সেহেতু আজ সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, কৃষিজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আলেম-উলামা, ডাক্তার, আইনজীবী, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, মহিলা, সংস্কৃতিসেবী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণের একটি মাত্র দাবি। আর তা হলো, বর্তমান সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে সাংবিধানিক নিয়ম মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতি, আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার এটাই আজ একমাত্র শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথ।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ন্যূনতম পর্যায়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রেখে ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে আমাদের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হবে। তাই আমাদের চার দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই যে, যথাসত্বর ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে একটি দেশপ্রেমিক ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শক্তিশালী সরকার গঠন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা।

এই ভবিষ্যৎ সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার"- সংবিধানের এই মূলনীতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন; কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন; প্রশাসনিক শৃংখলার পুনরুদ্ধার; সর্বস্তরে মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি; অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ দমন ও সকল নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধান; আইনের শাসন পুনরুদ্ধার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা; বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল; শিক্ষার মান ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার; সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা; রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান; দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ; সর্বক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা; মানবসম্পদ উন্নয়ন; সংবিধানে সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলির বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা; কৃষক শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন; বিপুল বেকার যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল জনগণের সঞ্চয় ও জীবন মানের সুরক্ষা; নারী সমাজের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ণ প্রক্রিয়া এবং শিশুদের সুন্দরতম জীবন বিকাশের সুযোগ নিশ্চিতকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার

আধুনিকীকরণ ও বহুমুখী শক্তি সঞ্চয়; প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুনিয়ন্ত্রণ; সংবিধানের মূলনীতি পরিপন্থী সকল আইন সংশোধন; সর্বসম্প্রদায়ের নাগরিকের জন্য আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

আমাদের সমগ্র জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। আমাদের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের জয় হবেই, ইনশাআল্লাহ। সরকারের মনে রাখা উচিত জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হতে হবে। সংঘাতের পথ বিপর্যয়ই ডেকে আনে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান এক দফা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। চক্রান্ত যত কুটিলই হোক, নির্যাতন যত বর্বরই হোক, জনজোয়ার কখনও স্তব্ধ হয় না। আমরা দেশের সকল জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রকামী, ইসলামী দল, গ্রুপ, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র, সকল পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী সংগঠন ও ব্যক্তিকে চলমান গণআন্দোলনে শামিল হবার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের আন্দোলনের বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা দেশ জুড়ে সকল মহল্লায়, গ্রামে, শহরে ও বন্দরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

বেগম খালেদা জিয়া	**হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ**	**গোলাম আযম**	**আজিজুল হক**
চেয়ারপার্সন	চেয়ারম্যান	আমীর	চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	ইসলামী ঐক্যজোট

ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের নিন্দা

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের এক বৈঠক ৮ এপ্রিল ২০০০ সন্ধ্যায় সংগঠনের বিদায়ী আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের নিন্দা জানিয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়-

"জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কর্মপরিষদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে সরকার কর্তৃক দলীয় প্রচারনামূলক ও জামায়াতসহ সকল বিরোধীদের অমূলক কুৎসা রটনাকারী Bangladesh Politics Democracy Vs. Religious Fundamentalism শীর্ষক পুস্তিকা

প্রকাশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে। এই পুস্তিকায় জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামীদল ও বিএনপির আন্দোলনকে লাদেনের সাথে যুক্ত করার নির্লজ্জ অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি দল নিজেকে গণতন্ত্রী এবং জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধীদলকে সন্ত্রাসী সাজাবার হীন চেষ্টা চালিয়েছে। বাংলাদেশে তালেবান থাকার বানোয়াট কাহিনী প্রচার করায় তৎক্ষনিকভাবে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের এবং গ্রামীণ ব্যাংকের একটি প্রকল্প পরিদর্শনের কর্মসূচি বাতিল করেন।

কর্মপরিষদ ক্ষমতাসীন সরকারের এই দূরভিসন্ধিকে নির্বোধের অভিলাষ আখ্যায়িত করে বলতে চায় যে, যে কোন অনিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কহীন জামায়াতে ইসলামী সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত। অন্য দিকে সরকারের স্বৈরাচারী চেহারা আজ দুনিয়ায় কারো কাছেই গোপন নেই। দুনিয়ার সবাই জানে যে, বাংলাদেশে আজ বিরোধী দলসমূহ সরকারী স্বৈরচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সীমাহীন ধৈর্য ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখেছে।

কর্মপরিষদ মনে করে এ সত্য থেকে মার্কিনীদের দৃষ্টি একটু দূরে সরিয়ে রাখা ও তাদের আনুকল্য লাভের শেষ উপায় হিসেবে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার পাঁকে ডুবন্ত সরকার কল্পনায় বাংলাদেশে লাদেন বাহিনী (তালেবান) আমদানী করেছে। শুধু তাই নয়, উক্ত পুস্তিকায় আওয়ামী লীগ সরকার নিজেদেরকে সত্যিকার সেক্যুলার (Secular) হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। মার্কিন কৃপালাভের এক মরিয়া প্রয়াস হিসেবেই আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে এটা করা হয়েছে।

কর্মপরিষদ ক্ষমতাশীন সরকারের এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রয়াসকে একটি ব্যর্থ কসরত হিসেবে অভিহিত করে এই অভিমত ব্যক্ত করছে যে, আওয়ামী লীগ সরকার দিনকে রাত আর রাতকে দিন বললেও দুনিয়াবাসীর চোখ কিন্তু বন্ধ নেই। সুবিধাবাদ ও স্বৈরাচারই হলো তার শাসন পরিচালনার বাহন। এই কারণেই 'হিজাব' কখনো তাদের মাথায় ওঠে, আবার কখনো বেগানা পর পুরুষের সাথে হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে তা' পদদলীত হয়।

কর্মপরিষদের আরো অভিমত এই যে, এহেন নীতি নৈতিকতাহীন সুবিধাবাদী সরকারের কাছে সত্যনিষ্ঠার সুবিচার ও সুশাসনের আবেদনের কোন মূল্য নেই। এমতাবস্থায়, সকলের সম্মিলিত আন্দোলন জোরদার করার মাধ্যমে সরকার পতনের এক দফা এক দাবি আদায়ের মধ্যেই একমাত্র জনগণের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত।"

সরকারি দল কর্তৃক বিচার বিভাগের অবমাননার নিন্দা

৩রা মে, ২০০০ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে সংগঠনের নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি কিছু দিন ধরে সরকারি দল আওয়ামী লীগ কর্তৃক দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং বিচারপতিগণকে হুমকি প্রদর্শন করে যে বক্তব্য ও লাঠি মিছিল করা হয়, তার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জামায়াতের নির্বাহী পরিষদ অত্যন্ত উদ্বেগ ও শংকার সাথে লক্ষ্য করছে যে, শাসক দল আওয়ামী লীগ সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং মাননীয় বিচারকদের অবমাননা ও হুমকি প্রদর্শন পূর্বক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান এমনকি লাঠি মিছিল পর্যন্ত করেছে। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে বিব্রত বিচারকরা শেখ মুজিব হত্যার সমর্থনকারী বলেও কটুক্তি করা হয়েছে। দেশের মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগকে এভাবে হুমকি ও ভয় প্রদর্শন করা শুধু অন্যায় নয়, বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের দৃষ্টিতে একটি অমার্জনীয় অপরাধ। সরকারি দল আওয়ামী লীগের অন্যায় ও সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নির্বাহী পরিষদ তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে।

এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের নেতাদের বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন থেকে বিরত রাখার পরিবর্তে তাদের সন্ত্রাসী বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করলেন। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নির্লজ্জ দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, কালো আইন প্রণয়নের পর এই সরকার সর্বোচ্চ আদালতের ন্যায় প্রতিপালক তাদের দলীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে সহায়ক মনে করতে পারছেন না। তাই সংবিধান, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের শেষ রক্ষা কবজ, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে হুমকি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়ে দলীয় সন্ত্রাসীদের হাতে আইন তুলে দিয়ে তারা অবাধে মানুষ খুন করার লাইসেন্স চায়। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বর্তমান সরকারকে এ ধরনের নজিরবিহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছে।

পরিশেষে দেশের আইন-শৃংখলা, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সব কিছু ধ্বংস করার পর এখন বিচার বিভাগটি ধ্বংস করার যে মারাত্মক খেলায় সরকার মেতে উঠেছে। তা' পরিত্যাগ পূর্বক ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য নির্বাহী পরিষদ জোর দাবি জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতজানু মানসিকতার প্রতিবাদ

বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একত্রীকরণ সম্পর্কিত নয়াদিল্লীর কটাক্ষপূর্ণ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের প্রতিবাদ না জানিয়ে এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিধাগ্রস্ত ও অস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন মুদ্রা চালু সম্পর্কিত অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রশ্নকর্তার সাথে একমত পোষণ করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন ঃ

'সিএনএন' এর সাথে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একত্রীকরণের অঙ্গীকারের কি হলো? নয়াদিল্লীর এক প্রশ্নকারীর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রশ্নের প্রতিবাদ না করে প্রশ্নকারীর সমর্থনসূচক সুসম্পর্কের বয়ান এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন মুদ্রা চালু সম্পর্কিত অপর এক প্রশ্নের জবাবে সময় নেয়ার মাধ্যমে একমত পোষণ করায় জামায়াত নেতা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

জামায়াত প্রধান প্রশ্ন করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার যদি কোন ওয়াদা বা চুক্তি না করে থাকেন, তাহলে ভারতের একজন নাগরিক একটি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এ ধরনের আপত্তিজনক প্রশ্ন করার সাহস পায় কিভাবে? আর তিনিই বা তা প্রত্যাখান করার সাহস পেলেন না কেন? প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান না করে পরোক্ষভাবে অঙ্গীকারের স্বীকৃতি থেকে কি প্রতীয়মান হয় না যে, ভারতের সাথে প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের কোন গোপন অঙ্গীকার হয়তো রয়েছে? সিএনএন কর্তৃক সাক্ষাৎকারটি প্রচারিত হওয়ার কয়েকদিন পরেও কোন প্রতিবাদ না করায় জনগণের আশংকা বেড়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী সম্বোধন করলে প্রতিবাদ না করে পুলকবোধ করা, পুন:একত্রীকরণের অঙ্গীকারের পরোক্ষ স্বীকৃতি এবং একই মুদ্রা চালুর ব্যাপারটি কি তাহলে একই সূত্রে গাঁথা?

দেশ প্রেমিক জনতা সুস্পষ্টভাবে জানতে চায়, প্রধানমন্ত্রীকে এই ম্যান্ডেট কে দিয়েছে? জনগণ একটি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে এ ধরনের নতজানু মানসিকতা কোন ক্রমেই বরদাশত করতে রাজি নয়।

সিএনএন এ প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে প্রধামন্ত্রী সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিলে জনগণের নিকট এক অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

অধ্যাপক আযম দৃঢ়তার সাথে বলেন, ক্ষমতাশীন দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করুক, দেশ প্রেমিক জনগণ তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে হলেও জনগণ দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডত্ব রক্ষা করবে, ইনশাল্লাহ।

চতুর্দশ অধ্যায়

২০০১-২০০৩ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

২০০০ সনের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে অধ্যাপক গোলাম আযম স্বাস্থ্যগত কারণে আমীর পদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আবেদন করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা তাঁর আবেদন গ্রহণ করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন আমীরে জামায়াত নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১-২০০৩ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

৭ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে মজলিশে শূরার অধিবেশনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী 'আমীরে জামায়াত' হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন পরিচালক জনাব এ. কে. এম. নাজির আহমদ। শপথের পর পরই তিনি নবনির্বাচিত মজলিসে শুরার সদস্যদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তাকারে এক ভাষণ প্রদান করেন। আমীর জামায়াত হিসেবে এটি ছিল তাঁর প্রথম ভাষণ। ঐতিহাসিক ভাষণটি নিম্নরূপ-

"আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।

পরম শ্রদ্ধেয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, আজ পর্যন্ত যিনি আমীরে জামায়াত ছিলেন, পদপদবী ছাড়াই তিনি আমাদের নেতা থাকবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর হায়াত দারাজ করুন। তাঁর এ পর্যন্ত কালের সকল দ্বীনি খেদমত কবুল করুন। যে মহান মৌলিক কাজের উদ্দেশ্যে (জামায়াতের ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরীর জন্য একান্তভাবে সময় শ্রম প্রদান করা) তিনি আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য পূরণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে গায়েব থেকে মদদ দান করুন। সেই কাজ তাঁর থেকে নেয়ার ব্যাপারে আমাদেরকেও তৌফিক দিন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার যোগ্যতাও আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দান করুন।

কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সম্মানিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত ভাই ও বোনেরা
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা (অধ্যাপক গোলাম আযম) এমারাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার কারণে এ কঠিন দায়িত্ব আমার মতো একজন দুর্বল ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়েছে। গত মাসের ১৯ তারিখ রাতে আমি ঢাকার বাইরে সফরে থাকা অবস্থায় নির্বাচনের ফলাফল জানতে পারি। তখন থেকে এ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করার জন্যে আমি আমার পক্ষ থেকে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি। আল্লাহর কাছে তাওফিক চেয়েছি। এতদসত্ত্বেও শপথের এই মুহূর্তে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ দায়িত্ব কত কঠিন সে অনুভূতি কম বেশী আমাদের সকলেরই আছে। আমি নিজেকে কোনো অবস্থায় এত বড় দায়িত্বের যোগ্য মনে করিনি। ছাত্র জীবন থেকে ইসলামী আন্দোলনের যে দীক্ষা আমরা পেয়েছি তা থেকে জানতে পেরেছি, নেতৃত্বের কামনা বাসনা যেমন বৈধ নয়, তেমনি দায়িত্ব থেকে পালাবার অনুমতিও নেই। তাই নিজের অযোগ্যতা ও দুর্বলতাপূর্ণ অনুভূতি সহকারেই এ কঠিন গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি এবং আমাদের সকলেরই বিশ্বাস থাকার কথা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এ গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। আমি আমার সাধ্যমত এ দায়িত্ব পালনে প্রাণ উজাড় করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্য কামনা করি। সেই সাথে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে আমি এই আশাও করি, যারা এ গুরুদায়িত্ব এই দুর্বল ব্যক্তির কাঁধে অর্পণ করেছেন, তারাও আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রাণ উজার করে দোয়া করবেন এবং সকল কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবেন।

আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিয়ানে কেরাম, প্রিয় সঙ্গী-সাথী, আপনাদের মাধ্যমে আমি জামায়াতের রুকন, কর্মী, সমর্থক, শুভাকাংখী, সকলের কাছে দোয়া এবং সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন করছি। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী তথা ইসলামী আন্দোলনের এই গুরুভার যিনি বহন করেছেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি আমার ছাত্র জীবনে তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে তিন বছর এবং নিখিল পাকিস্তান সভাপতি হিসাবে দুই বছর, তার গাইডেন্স নিয়ে, তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে, ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেছি। জামায়াতের জীবনে

ঢাকা সিটির আমীর হিসাবে প্রায় পাঁচ বছর, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে ছয় বছর এবং সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে বারো বছর, তাঁর সাহচর্য পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর সরাসরি পরিচালনা ও গাইডেন্স-এ নিশ্চিন্তে নিরাপদে দায়িত্ব পালন করেছি। আজকে তাঁর জায়গায় এই গুরুভার বহন করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিল বিশাল বট বৃক্ষের ছায়া স্বরূপ। মনে হচ্ছে, সেই ছায়া থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। এ মুহূর্তে তাঁর মহানুভবতার কাছে আমার এবং আমাদের সকলের প্রত্যাশা, তাঁর সঙ্গী-সাথী হিসাবে মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ যদি কখনো আমাদের দ্বারা তিনি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, তিনি নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।

আজকে যেভাবে তিনি আমাদের জন্যে দোয়া করেছেন, আমাদের প্রাণভরা আশা, তাঁর দোয়া আমাদের জন্যে সদা সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা এমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, আন্দোলন সংগঠন থেকে নয়। তিনি কতগুলো মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে এই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন অনেক দিন থেকেই। এবার কর্মপরিষদ, মজলিশে শূরা তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছে। তিনি কেবল ব্যক্তি নন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে কিছু মৌলিক, আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। আমরা সেগুলো তাঁর থেকে আশা করি। আমরা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করবো তিনি যেন অবদান রাখতে সক্ষম হন, আমরা যেন এ ব্যাপারে তাঁর থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিতে সক্ষম হই। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা শুধু জামায়াতে ইসলামীরই নেতা ছিলেন না, জামায়াতের সংগঠন পরিচালনার পাশাপাশি এ দেশে কালেমায় বিশ্বাসী সকল মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আজকের এ দিনে তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের সকলের অঙ্গীকার হউক সেই ঐক্যকে আরো জোরদার, ফলপ্রসূ এবং বাস্তবে রূপদান করার।

আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা আওয়ামী দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জাতির একটি ক্লান্তি লগ্নে চার শীর্ষ নেতার বৈঠক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, ঘোষণা তৈরীর ক্ষেত্রে এবং সেই ঘোষণার আলোকে মাঠে ময়দানে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার ও বেগবান করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছেন, সেই ভূমিকাকেও অব্যাহত রাখার, জোরদার

করার এবং একটি যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছাবার অঙ্গীকারও আমরা করছি শ্রদ্ধেয় নেতাকে সামনে রেখে।
আসলে এই মুহূর্তে বক্তৃতার জন্য আমি মানসিকভাবে তৈরী নই। পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য, ইনশাআল্লাহ, সম্ভব হলে সমাপনী বক্তব্যে আনা যাবে। আমি একটি কথা বলে শেষ করতে চাই। তা হলো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নির্বাচন, শূরা নির্বাচন, একান্তই আমাদের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ব্যাপার। কিন্তু এবার পত্র-পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে নেতিবাচক ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা স্বেচ্ছায় বরং সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার ব্যাপারে যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, সে ব্যাপারটিকেও ভিন্নরূপ দেয়ার অপচেষ্টা করেছে। হয়তোবা পরিস্থিতি ঘোলা করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার মর্জি ভিন্ন। পত্র-পত্রিকার এই ভূমিকাকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি প্রায় সর্বস্তরের গণ-মানুষের মনে আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতের সাংগঠনিক প্রক্রিয়াধীন একটি নির্বাচনে বলতে গেলে গোটা জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উৎসাহ নিয়েছে। এভাবে জামায়াতে ইসলামীকে গণ-মানুষের একটি আস্থাভাজন সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠার পরিবেশ সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক বন্ধুরা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।
আমি এ মুহূর্তে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেই সাথে এতটুকু আবেদন রাখতে চাই যে, দেশে এবং দেশের বাইরে জামায়াতে ইসলামীর একটি ওজন আছে। জামায়াতে ইসলামীর যে কোন কথা যে কোন সিদ্ধান্তের ওজন আছে। জামায়াতে ইসলামী একটি দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ময়দানে দায়িত্বশীলতা এবং গঠনমূলক কার্যক্রমের উদ্যোক্তা জামায়াতে ইসলামী। আশা করবো, জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তাঁরা আরও একটু জানা বোঝার চেষ্টা করবেন। জামায়াতের এ অবদান দেশের জন্যে কি কল্যাণ বয়ে আনতে পারে, জাতির জন্যে কি বয়ে আনতে পারে, এ ব্যাপারে তারা আরো জানা বোঝার চেষ্টা করলে তাদের পেশার প্রতি তারা ইনসাফ করবেন, আমরা তাদের বিবেকের কাছে এ আবেদনটুকু রাখতে চাই।
পত্রিকার লেখা-লেখিকে কেন্দ্র করে আমীর নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব অভিনন্দন জানিয়েছেন। জামায়াতে

ইসলামীর এমারতের গুরুদায়িত্বের বোঝা যাদের উপর অর্পিত হয় তাদের জন্যে যে বিষয়টি আনন্দের নয়, সেকথা হয়তো তাদের বোঝার বাইরের জিনিস। এ দায়িত্ব আনন্দের নয়, ঝুঁকিপূর্ণ একটি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যাদের উপর আসে তারা আনন্দিত হয় না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। যারা সদিচ্ছা নিয়ে, শুভেচ্ছা নিয়ে জামায়াত এবং জামায়াতের আন্দোলনের প্রতি ভালবাসা নিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমরা আশা করবো তারা জামায়াতে ইসলামীর জন্যে দোয়া করবেন যাতে করে দেশ ও জাতির জন্যে জামায়াতে ইসলামী একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

জামায়াতে ইসলামী প্রথমে বাংলাদেশে এবং এরপরে গোটা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে এবং মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ দেখাবার মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক সমাজ কায়েম করার অঙ্গীকার অব্যাহত রাখবে। আমরা আল্লাহর দরবারে ধরনা দেবো এবং মাঠে ময়দানে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো। আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপাতত আমার কথা শেষ করছি।”

বিদায়ী আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য

নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াতের বক্তব্যের পর বিদায়ী আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন-

“ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগ সরকার ও দেশের সকল ইসলাম বিরোধী শক্তি জামায়াত ইসলামীকেই তাদের আক্রমনের প্রধান টার্গেট বানিয়েছে। এর দ্বারা তারা জামায়াতে ইসলামীকে প্রধান ইসলামী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, জামায়াতের দীর্ঘ ঐতিহ্য অনুযায়ী বিশ্বস্বীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে রুকনগণ তাদের আমীর নির্বাচন করেছেন। একজন রুকন হিসেবে তিনি (অধ্যাপক গোলাম আযম) নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, বিদায়ী আমীরের অব্যাহতি নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক চর্চা হওয়া এবারই প্রথম আমীরে জামায়াতের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সকল মহল সঠিক ধারণা লাভ করেছে। একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে জামায়াতে ইসলামীতে উত্তরাধিকার সুত্রে নেতৃত্বের অবকাশ নেই। নেতৃত্বের জন্য প্রার্থীতা নেই বলে এখানে প্রতিযোগিতা ও কোন্দলের সুযোগ নেই। এতে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

যে, জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ পদটি কর্মপরিষদ বা মজলিসে শূরার কোন ক্ষুদ্র সংখ্যার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না, বরং হাজার হাজার রুকন জামায়াতের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত গুণাবলী বিবেচনা করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভোটদানের মাধ্যমে তাদের আমীর নির্বাচন করে থাকেন।

বিদায়ী আমীর নবনির্বাচিত আমীরের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে বলেন- আমার সময় ও শ্রম ইসলামী আন্দোলনের এমন কিছু কাজে নিয়োজিত করতে চাই যা দায়িত্বে থাকাকালীন সম্ভব হয়নি। আমীরে জামায়াত আমাকে যেভাবে কাজে লাগাবেন সেভাবে দায়িত্ব পালনে আমি প্রস্তুত আছি। নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াতের জন্য দোয়া করার মাধ্যমে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর নবনির্বাচিত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে ২০০১-২০০৩ সেশনের জন্য নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বন্টন করেন।

নায়েবে আমীর

১। জনাব শামসুর রহমান ও
২। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ

সেক্রেটারি জেনারেল

জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল

১। অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী
২। জনাব মকবুল আহমাদ
৩। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
৪। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
৫। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা ও
৬। মাওলানা আবু তাহের

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

পূর্ববর্তী কর্মপরিষদের সাথে সাতক্ষীরার জেলা আমীর জনাব ইজ্জত উল্লাহ এবং রাজশাহী মহানগরীর জনাব তাসনিম আলমকে নিয়ে মোট ৪৯ জন সদস্য সমন্বয়ে কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

* মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী- আমীরে জামায়াত

১। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
২। জনাব মকবুল আহমাদ
৩। অধ্যাপক ইউসুফ আলী
৪। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
৫। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
৬। জনাব মাওলানা আব্দুস সোবহান
৭। জনাব মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
৮। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
৯। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা
১০। জনাব বদরে আলম
১১। জনাব মোঃ ইউনুছ
১২। জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলাম
১৩। জনাব আবু নাসের মুহাম্মাদ আব্দুজ্জাহের
১৪। জনাব মীর কাসেম আলী

অধ্যাপক গোলাম আযমসহ দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী বলার প্রতিবাদ

জামায়াতে ইসলামীর প্রবীন ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলা এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কম্যুনিস্ট রাজনীতিবিদ এবং তাদের দোসরদের যেন একটা স্টাইল ও অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। আশা করা গিয়েছিল যে, ১৯৯৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বসম্মত ঐতিহাসিক রায় প্রকাশের পরে বর্ষিয়ান জননেতা, ভাষা সৈনিক ও প্রবীন রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব অন্তত: এই অপপ্রচারের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু দুঃখজনক যে দীর্ঘ ২১ বছর পরে ক্ষমতাশীন হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মরহুম পিতার সমসাময়িক প্রবীন রাজনীতিবিদ ও

জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে ২রা নভেম্বর ২০০০ এর সাংবাদিক সম্মেলনে বিরুপ মন্তব্য করায় পরেরদিন ৩রা নভেম্বর জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন:

"গতকাল কুয়েত সফর শেষে দেশে ফিরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম আযম যুদ্ধাপরাধী এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাঁর বিচার হবেই বলে প্রধানমন্ত্রী যে অসত্য মন্তব্য করেছেন আমি তাঁর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যাবহিত পরেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৯৫ জন কর্মকর্তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছিল এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতাই ভারতের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যুলফিকার আলী ভূট্টোর আবেদন ক্রমে তাদেরকে ছেড়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর পিতা চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদেরকে সেদিন কোন রহস্যজনক কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা' তিনি জীবিত থাকলে ভাল বলতে পারতেন।

আমি এবং আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিকবার স্পষ্টভাবে বলেছি যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীণ সময়ে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন বাহিনীর কোনটির সাথেই আমাদের সংগঠন এবং নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে অধ্যাপক গোলাম আযমের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তারপরও মিথ্যাচারে যারা অভ্যস্ত তারা তাদের গোয়েবসলীয় প্রচারণা সময় সুযোগ বুঝে চালিয়েই যাচ্ছেন।

প্রসংগত: উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর পিতা ১৯৭৩ সালে গায়ের জোরে অন্যায়ভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের জন্মগত নাগরিকত্ব হরণ করেছিলেন। এ পদক্ষেপটি অন্যায় ও অবৈধ ছিল তা ন্যায়সংগত ছিল না দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ই তার প্রমাণ।

প্রধানমন্ত্রীর অবশ্যই জানা থাকার কথা, অধ্যাপক গোলাম আযম সুপ্রিমকোর্টের সর্বসম্মত রায়ের বদৌলতেই তাঁর জন্মগত নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছেন, কোন ব্যক্তি কিংবা সরকারের অনুগ্রহে নয়। রায় দেবার প্রাক্কালে মাননীয় হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট উভয় উচ্চ আদালতই অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব হরণ করাকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। মাত্র একজন বিচারক তাঁর নাগরিকত্বের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলেও তিনি অধ্যাপক গোলাম আযমের Condut বা আচরণের ব্যাপারে আপত্তিজনক কিছু পাননি।

এমতাবস্থায়, অধ্যাপক গোলাম আযমের নতুন করে যুদ্ধাপরাধী হবার প্রশ্নই ওঠেনা। এরপর প্রধানমন্ত্রী নিজে শুধু বিচারক নয়, বরং রায় কার্যকর করার পুরো দায়-দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যেই এমন অযৌক্তিক ও অন্যায় মন্তব্য করেছেন।

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, কিছুদিন যাবত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগিরা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অযৌক্তিক মন্তব্য করেই চলেছেন। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নিজে পর্যন্ত ন্যূনতম ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার পরোয়া করছেন না। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারের যে রেফারেন্স নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মন্তব্য করলেন তাও অসত্য। জামায়াতের তৎকালীণ আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বিবিসি'র সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন ইসলামী দলই অংশগ্রহণ করেনি কথাটি বলেছেন। কোন ব্যক্তির কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তি রেফারেন্স টেনে অনেকগুলো অসত্য কথা বলে ফেলেছেন। বিবিসি'র সাথে অধ্যাপক আযমের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা আছে। প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল বিষয়টি ভালভাবে জেনে শুনে তারপর মন্তব্য করা। কিন্তু প্রতিহিংসা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কোন ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে কোন যুক্তি বিবেক বা ন্যায়বোধ সাধারণ কাজ করে না।

পরিশেষে আমি প্রধানমন্ত্রীকে সবিনয়ে অনুরোধ করতে চাই, আপনার এবং দলের ব্যক্তিগত বা দলীয় অভ্যাস যাই থাকুক না কেন, আপনার মনে রাখা উচিত, আপনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। কমপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও দায়িত্বের জন্য হলেও কথাবার্তা বা কোন মন্তব্যের সময় প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিবেন।

মাওলানা সাঈদী সম্পর্কিত বানোয়াট তথ্যের প্রতিবাদ

২০০০ সালের ৩রা নভেম্বর বাংলার বানী পত্রিকায় 'নিজামী জামায়াতের পরবর্তী আমীর প্রায় নিশ্চিত' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও পরবর্তীকালে নায়েবে আমীর ও জামায়াত সংসদীয় গ্রুপের নেতা (১৯৯৬-২০০১) মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সম্পর্কে অসত্য ও বানোয়াট তথ্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি ঐদিনই নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।

"উপরিউল্লিখিত পত্রিকায় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর নিজস্ব এলাকায় স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন।

'স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ দিন পলাতক জীবন কাটান মর্মে আমার সম্পর্কে যেসব ভিত্তিহীন অসত্য বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, আমি তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমার ভাবমূর্তি বিনষ্টের হীন উদ্দেশ্যেই এর ধরনের ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।'

এ সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা বিরোধী কোন ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি জড়িত ছিলাম না। আর স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ দিন পলাতক জীবন কাটাবার প্রশ্নই আসেনা। এক দিনের জন্যেও আমি আমার এলাকা থেকে পলাতক ছিলাম না। এ সম্পর্কে ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের বাজেটের উপর প্রদত্ত বক্তৃতায় আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলাম যে, আমি ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী ছিলাম না। আমি রাজাকার নই, যদি কেউ আমাকে রাজাকার বলে তা প্রমান করতে না পারেন তা হলে তার বিরুদ্ধে দশ কোটি টাকার মানহানি মামলা দায়ের করবো। আমার এ চ্যালেঞ্জ জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীতে রেকর্ড হয়ে আছে। সেদিন সংসদে কেউ আমার এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি। আমার সম্পর্কে এ ধরনের অসত্য, বানোয়াট, ও ভিত্তিহীন তথ্য পরিবেশণ করে আমার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুর-১ আসনের সম্মানিত ভোটারগণকে অপমানিত ও তাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

পরিশেষে, এ ধরনের ভিত্তিহীন অসত্য বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন থেকে বিরত থাকার জন্য আমি বাংলার বানী কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং অত্র প্রতিবাদটি যথা স্থানে ছেপে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসনের সুযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিস দলীয় করণের নিন্দা

২০তম বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলে দলীয় দৃষ্টিভংগিকে প্রাধান্য প্রদান ও কোটা ভিত্তিক প্রার্থী বাছাইয়ের মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগের দলীয় লোকদের বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিসে ঢোকার সুযোগদানের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ৩রা নভেম্বর ২০০০ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

২০ তম বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিস পরীক্ষায় চূড়ান্ত ফলাফলে দলীয় দৃষ্টিভংগীকে প্রাধান্য প্রদান ও কোটা ভিত্তিক প্রার্থী বাছাইয়ের মাধ্যমে একতরফাভাবে আওয়ামী লীগ দলীয় লোকদের বি.সি.এস. ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগ দানের ষড়যন্ত্রের আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

উক্ত পরীক্ষায় সরকার দলীয় ছাত্রছাত্রীদের ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৮২ নম্বর এবং অন্যদের ২০০ নম্বরের মধ্যে ৭৯ নম্বরের ও কম নম্বর প্রদান পূর্বক কমপক্ষে ১৫০০ জন পরীক্ষার্থীকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় আযোগ্য ঘোষনা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সালে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও ১৯৭৩ ও ৭৪ সালে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে বি.সি.এস ক্যাডারে আওয়ামীলীগের দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগের কথাই জাতিকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও শিক্ষা ক্যাডারে তথা সরকারি উচ্চপদে যদি মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে এভাবে দলীয় লোকদেরকে ঢালাওভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়, তাহলে গোটা প্রশাসনই দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা হারিয়ে দলীয় প্রাইভেট বাহিনীতে পরিণত হবে যা হবে জাতির জন্য আত্মঘাতী। আওয়ামী লীগ সরকারের এ ধরনের দলীয়করণ তথা অপকর্মে গোটা জাতি আজ উদ্বিগ্ন এবং অনেকেই বঞ্চিত।

এ দেশটি কারো পৈতৃক কিংবা দলীয় সম্পত্তি নয়। এ দেশ প্রতিটি নাগরিকের। কাজেই বি.সি.এস ক্যাডার হিসেবে চাকরি পাওয়া দলমত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার হরণ করার এখতিয়ার কারো নেই, এটা এক ধরনের প্রহসন ও জুলুম।

জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিসে লোক নিয়োগের প্রতিষ্ঠান পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (P.S.C) সকল প্রকার দলাদলি ও প্রভাব বিস্তারের উর্ধ্বে রাখা উচিত। যাতে তারা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সততা, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে বি.সি.এস ক্যাডার সহ বিভিন্ন সার্ভিসে লোক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়।

এমতাবস্থায়, ইতিপূর্বে বি.সি.এস ক্যাডার সার্ভিসে লোক নিয়োগের যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করে পুনরায় সততা, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে লোক নিয়োগের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আমি সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি। প্রসংগত: উল্লেখ্য ১৯৯৬-২০০০ এই দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছরে বি.সি.এস শিক্ষা ক্যাডারে কোন পদোন্নতি না হওয়া একটি অতীব দুঃখ জনক ঘটনা।

আল কুদস দিবসে জামায়াত প্রধান

অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০০০ সালের ২২ ডিসেম্বর মুসলিম উম্মাহ আল কুদস দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২১ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন:

"অবৈধ দখলদার রাষ্ট্র ইসরাইল মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসা এবং পবিত্র শহর জেরুজালেম অন্যায়ভাবে দখল করে অপবিত্র করেছে। মসজিদুল আকসা ও জেরুজালেম শহরকে ইহুদীদের কবলমুক্ত করা বিশ্বের সকল মুসলমানদের প্রাণের দাবি। এ লক্ষ্যে গোটা মুসলিম উম্মাহর জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে।

স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মসজিদুল আকসা ও জেরুজালেম শহরকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্ত করার দৃঢ় অংগীকার এবং ফিলিস্তিনের নির্যাচিত নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য ২২ ডিসেম্বর ১৯৯১ বাংলাদেশের তৌহিদী জনতার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় আল কুদস দিবস পালিত হয়।

জামায়াত প্রধান আল কুদসকে ইহুদীমুক্ত করে মুসলমানদের প্রথম কেবলার মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের প্রতি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের আকুল আহ্বান জানান।"

জামায়াত শিবির বিরোধী অপ-প্রচারের মোকাবিলায় মাওলানা নিজামীর সাংবাদিক সম্মেলন-২০০১

বাংলাদেশে দ্বিতীয় মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) আওয়ামী শাসনের শেষ দিকে জামায়াত শিবির বিরোধী অপ-প্রচার চরম আকার ধারণ করে। যাবতীয় বোমাবাজি তথা সন্ত্রাসী ঘটনায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে অন্ধভাবে দায়ী করে পত্র-পত্রিকায় অপ-প্রচার চলে। এই সব ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীণ আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২০০১ সালের ১৭ এপ্রিল মগবাজার জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে যে ভাষণ দেন, তা থেকে সমকালীণ ঘোলাটে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্যক আঁচ করা যায়। তাই কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে উক্ত ভাষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

পরিকল্পিতভাবে দেশের রাজনীতিতে ঘোলাটে পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘৃণ্য রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল ও প্রতিপক্ষের উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে জনমতকে

বিভ্রান্ত করার সরকারি ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতেই আপনাদেরকে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানাতে বাধ্য হয়েছি। প্রথমেই আমি বিগত পহেলা বৈশাখ রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে সংঘটিত মর্মান্তিক, নৃশংস বর্বরোচিত বোমা বিস্ফোরণে ৯ ব্যক্তি নিহত এবং আরো ১৪ জনের আহত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। নিহতদের রুহের মাগফিরাত ও আহতদের আরোগ্য কামনার সাথে সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে সংঘটিত এই ঘটনা একদিকে যেমন পাশবিক ও হৃদয়বিদারক অন্যদিকে তেমনি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সরকারের চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর। আমি পুণরায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি। বার বার এ ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অকাতরে দেশের মানুষকে জীবন দিতে হবে আর এর কোন প্রতিকার ও সুষ্ঠু বিচার হবে না এমনটি মেনে নেয়া যায় না।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের জানমাল ইজ্জতের হেফাজত করা, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমান সরকার এই দায়িত্ব পালনে শুধু ব্যর্থই নয় বরং বোমা বিস্ফোরণে মানুষ হত্যার নির্মম ট্রাজিডিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অপকৌশল গ্রহণ করায় প্রকৃত অপরাধীরা পর্দার অন্তরালেই থেকে যাচ্ছে। আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমাদের দাবি অনুযায়ী এ যাবত সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণের সন্ত্রাসী ও মর্মান্তিক ঘটনাবলীর সুষ্ঠু বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সত্যিকারের অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানের বোমা বিস্ফোরণের মত হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হতো না। অথচ দুর্ভাগ্যজনক যে, এ সরকারের আমলে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরন ও বড় বড় হত্যাকাণ্ডের আজ পর্যন্ত কোনটারই যথাযথ তদন্ত ও বিচার হয়নি।

আপনারা অবহিত আছেন যে, যশোরে উদীচির অনুষ্ঠানে, পল্টনে সিপিবির মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণ, কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি ওজনের বোমা স্থাপনসহ রাশেদ খান মেননের উপর সন্ত্রাসীদের হামলা, খুলনায় রতন সেন ও কুষ্টিয়ার জাসদ নেতা কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হবার পরপরই কোন তদন্ত ছাড়াই আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা এ সব সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে মিথ্যা

প্রচারণা চালায়। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জামায়াত বা শিবিরের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। এবারও রমনা বটমূলে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের নৃশংস ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই পুরোনো কায়দায় দেশের ক্ষমতাশীল প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারি মহল ও তার দোসররা তাদের ভাষায় মৌলবাদী তথা জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে তাৎক্ষনিকভাবে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করেছে।

গত রোববার আড়াই হাজারে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করেছেন (মানব জমিন-১৬/৪/২০০১)। গত শনিবার বোমা বিস্ফোরণের দিনে সকাল সোয়া এগারটায় স্বল্প সময়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এস এ মালেক উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, আমি নিশ্চিত জামায়াত-শিবিরের সুইসাইডাল স্কোয়াড এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে। যশোরের উদীচির অনুষ্ঠানে একই প্রক্রিয়ায় তারা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায় (ইনকিলাব-১৬/৪/২০০১)। পুলিশের আইজি মি. নূরুল হুদা বাসসকে বলেন, এই বোমা হামলায় মৌলবাদী মহল জড়িত থাকতে পারে। (যুগান্তর-১৬/৪/২০০১)। অথচ পুলিশের এজহারে বলা হয়েছে চরমপন্থী পেশাদার সন্ত্রাসীরা রমনায় বোমা বিস্ফোরণ করে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, রাশেদ খান মেননকে এলাকার যে চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা গুলী করেছে তারা তা স্বীকার করেছে বলে প্রকাশ। চিহ্নিত ৫ জন কলাম লেখক রাতারাতি যৌথভাবে লিখিত নিবন্ধে ধর্মপ্রাণ ও ইসলামপন্থীদেরকে কৌশলে দেশের তাবৎ সন্ত্রাসী অপকর্মের জন্য দায়ী করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। একটি পত্রিকার শীর্ষ খবরের শিরোনামে বলা হয়েছে 'মৌলবাদী বোমা হামলায় নিহত ৯'।

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ

আমাদের প্রশ্ন হলো, কোন তদন্ত ছাড়াই কোন ঘটনার দায়-দায়িত্ব এভাবে কারো উপর কি চাপিয়ে দেয়া যায়? উল্লেখিত বক্তব্য ও মন্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যেই তারা এহেন অযৌক্তিক, অন্যায় মিথ্যাচার চালিয়েছেন। আমরা মনে করি সরকার এই সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায় কিছুতেই এড়াতে পারেনা। এটা আমাদের একার বক্তব্য নয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মঞ্জুরুল আহসান খানও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, "পল্টন ময়দানে সিপিবির মহাসমাবেশেও নৃংশস হত্যাকাণ্ড হয়েছে। এর বিচার তো দূরের কথা, সুষ্ঠু তদন্ত পর্যন্ত হচ্ছে না"। তিনি আরও বলেছেন "ঐ বোমা হামলার তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ চিত্র সম্বলিত ভিডিও টেপ প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিলাম। তিনি ওয়াদা

করেছিলেন, অচিরেই বিষয়টি তদন্ত হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তারপর আর কোন অগ্রগতি হয়নি"। ছায়ানট প্রধান বিবিসিকে দেয়া তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ঘটনার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে'। বিএনপিসহ সকল বিরোধীদল ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। আমরা মনে করি কোন তদন্ত ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের দোসররা রমনা বটমূলের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার জন্য কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবির তথা দেশের ইসলামী শক্তির উপর যে দায়-দায়িত্ব চাপানোর ঘৃণ্য কৌশল গ্রহণ করেছে তা রহস্যজনক ও ষড়যন্ত্রমূলক। ঘটনা ঘটার সাথে সাথে বিটিভি যেভাবে মহল বিশেষকে দায়ী করে অপপ্রচারে মেতে উঠলো। মাইক্রোফোন হাতে হাসান ইমাম নামক একজন ভাষ্যকারের ধারা বিবরণী প্রচার করলো। তাতে এটা আরও পরিষ্কার যে, মর্মান্তিক এই বোমা বিস্ফোরণের প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে ক্ষমতাসীন দল উম্মত্ত রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ন মিথ্যাচারের জিগির তুলে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতে চায়। এ ঘটনার নেপথ্যে কাদের হাত রয়েছে এ নিয়ে আজ জনমনে ব্যাপক প্রশ্ন। নিরপরাধ মানুষের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যারা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠতে পারে তারা কি দেশের মানুষের কল্যাণকামী হতে পারে? এই অপরাজনীতির হাত থেকে দেশ কিভাবে উদ্ধার পেতে পারে?

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

গত রোববার ১৫ই এপ্রিল ভারতের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপের সংবাদপত্র সানডে টাইমসে "শেখ হাসিনাকে হত্যার নতুন ষড়যন্ত্র" শিরোনামে প্রকাশিত খবরে এ ষড়যন্ত্রের বৈঠকে জামায়াত ইসলামীর দুইজন নেতা উপস্থিত ছিলেন বলে যে, তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে চাই, জামায়াতে ইসলামী হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।

জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের সংগঠন। জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে মানুষ হত্যা করে, খুন করে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শেষ করা যায় না। জামায়াতে ইসলামী সর্বাবস্থায় রাজনৈতিক আদর্শিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করতে চায় বুদ্ধি বৃত্তিক এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক উপায়ে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে কোন পথ ও পন্থা জামায়াতে ইসলামীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। জামায়াতে ইসলামী এটা অনুমোদন করে না। এ ধরনের পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামী দেশ, জাতি ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করে। জামায়াতে ইসলামীর নিজের সাংগঠনিক অস্তিত্বের জন্যও ক্ষতিকর মনে করে

এটা একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ। এভাবে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের চক্রান্তের খবর প্রায়ই কলিকাতা ও দিল্লী থেকে কেন আবিষ্কৃত হয়? কেন প্রচারিত হয়? আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সচেতন দেশবাসীর মনেও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়: যে বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তাহলো গতকাল সিএমএম আদালত থেকে ১৭ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এবং মালক্রোকের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতিপূর্বে হাইকোর্ট থেকে তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তাদের গ্রেফতার না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। এটাও একদিক দিয়ে আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে। সেই সাথে সুপ্রীম কোর্ট বার কাউন্সিলের নির্বাচনকে সামনে রেখে সুপ্রীম কোর্টের ১৭ জন সিনিয়র আইনজীবীকে হয়রানি করে এ নির্বাচনকে সরকারের নিজের পক্ষে নিয়ে যাওয়ার একটা কৌশলী ষড়যন্ত্রেরই অংশ বলে আমরা মনে করি। এটা গণতন্ত্র বিরোধী, মানবাধিকার লংঘন এবং আদালত অবমাননার শামিল। এ গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির আমরা নিন্দা করছি এবং আমরা এ গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানাচ্ছি।

গত ১৬ই এপ্রিল দৈনিক ইনকিলাবের একটি খবরের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাই, এ খবরটি প্রণিধানযোগ্য। রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার আধা ঘন্টার মধ্যে রমনা বটমূল থেকে কালো ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল বের হলো। তার মানে এ ঘটনা ঘটবে তা তারা আগেই জানতো এবং এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে হবে তাও তারা জানতো। সেই জন্য পূর্বেই ব্যানারটা রেডি করে রেখেছিল। আজকের সংবাদপত্রে ইনকিলাবের এ খবরের কেউ প্রতিবাদ করেনি। এই খবরটি সত্য নয় এমন কথাও কেউ বলেনি। হাসান ইমাম সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে যে, যশোরে সংঘটিত উদীচির ঘটনার সময়ে নাকি তাকে বলা হয়েছিল আপনি মঞ্চ থেকে সরে যান। কম্যুউনিস্ট পার্টির মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার সময়ও নাকি তাকে বলা হয়েছিল যে আপনি সরে যান। আর রমনা বটমূলের ঘটনার সময় নাকি কে একজন তাকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে এনেছে, তারপর বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথেই তিনি হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে লোক বেছে বেছে সাক্ষাৎকার নেয়া শুরু করে দিলেন। এরকম একটি দুঃজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে যে স্বাভাবিক দুঃখ বেদনা প্রকাশ করা উচিত ছিল হাসান ইমামের বেলায় তার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, এ ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত, ষড়যন্ত্রমূলক এবং সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সুপরিকল্পিত ভাবে ঘটানো হয়েছে।

মানবজমিন পত্রিকায় ১৭ই এপ্রিল প্রকাশিত 'কে এই স্বাধীন' শিরোনামে প্রকাশিত খবরের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, এর মধ্যে খুবই চাঞ্চল্যকর তথ্য রয়েছে। ডিসি-ডিবি বলার চেষ্টা করেছেন যে, তার সাথে নাকি ছাত্রশিবিরের সম্পর্ক রয়েছে। আগের দিন বিবিসিও বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মানবজমিন উল্লেখ করেছে যে, রফিকুল ইসলাম, মাহবুব, মামুন, ইব্রাহিম এরা কেউই মাদরাসার ছাত্র নয়। স্বাধীন ঢাকা কলেজে ভূগোলে অনার্স পড়ছে। সে যে মেসে থাকে সে মেস সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে মেসে তারা থাকে সে মেসের রুমে শেখ মুজিবের ছবি টানানো আছে, ছবি আছে টিভি অভিনেত্রী ও সিনেমার নায়কের। অতএব এ রকম মেস ইসলামী ছাত্র শিবিরের মেস হতে পারেনা। স্বাধীন ঢাকা কলেজ শাখা আওয়ামী ছাত্র লীগের সন্ত্রাসী কর্মী বলে গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা তথ্য পেয়েছে। স্বাধীন ঢাকা কলেজের আওয়ামী ছাত্র লীগের বরিশাল গ্রুপের সদস্য। গত ১৪ মার্চ ছাত্র লীগের একটি গ্রুপের সাথে তার ঝগড়া হয়েছে বলে গোয়েন্দারা জানিয়েছে। কিছু দিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে যে বোমা পাওয়া গেছে তার সাথে রমনা বটমূলে বোমার সামঞ্জস্য রয়েছে বলে সাংবাদিকগণ জানিয়েছেন।

আমাদের আহ্বান, মিথ্যাচারের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে বাংলাদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের এই রাজনৈতিক খেলা বন্ধ করুন। জনগণের দাবি অনুযায়ী সুষ্ঠু বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে রমনা বটমূলের ১লা বৈশাখের ঘটনা, উদীচির অনুষ্ঠানের বোমা বিস্ফোরণ, সিপিবির মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাসহ এসব ভয়ংকর সন্ত্রাসী ঘটনা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী প্রকৃত অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুন। মানুষের জীবন নিয়ে খেলার রাজনীতি বন্ধ করুন। দেশের শান্তিকামী মানুষের জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করুন।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

আমি দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলাদেশের ইসলামী শক্তি ও রাজনৈতিক দলসমূহ ঐতিহ্যগতভাবে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেনা। ইসলাম পন্থীদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিত্রিত করার

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই যে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশের সচেতন ও বিবেকবান জনগণ ক্ষমতাসীন মহলের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ। সাংবাদিক সমাজের কাছে আমাদের আবেদন, প্রকৃত সত্য উদঘাটনে আপনারা এগিয়ে আসুন এবং আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমিকে সন্ত্রাস ও সংঘাতের রাজনীতি থেকে মুক্ত করে গণতন্ত্র, সহনশীলতা, দেশগড়ার সুস্থ রাজনীতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনারাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখুন। দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে দেশবাসীর প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, ক্ষমতাসীন মহলের দায়িত্বজ্ঞানহীন মিথ্যা প্রচারনায় বিভ্রান্ত না হয়ে সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করুন। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

বেসরকারি শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে আমীরে জামায়াতের সাক্ষাৎকার

২০০১ সালের ১লা মে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগত বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা এবং কার্যকরী কমিটির সদস্যগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এ সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের উপদেষ্টা মাওলানা আবদুস সুবহান ও অধ্যক্ষ আবদুর রব এবং বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ লোকমান, সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আলী আকবর, অধ্যাপক এবিএম খায়রুল ইসলাম প্রমুখ।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের সাথে যে ৯ দফা চুক্তি করেছেন তা শিক্ষকদের স্বার্থ বিরোধী। অবিলম্বে বেসরকারি শিক্ষকদের স্বার্থ বিরোধী ৯ দফা চুক্তি বাতিলের জন্য তিনি সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রসংগে নিজামী বলেন, এ দেশের জনগণ ও শিক্ষক সমাজ ড. কুদরতে খুদার বস্তাপচা ধর্মহীন শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ড. কুদরতে খুদার ধর্মহীন শিক্ষানীতি অতি কৌশলে চাতুর্যের সাথে ভিন্ননামে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।

তিনি আরো বলেন, ধর্মহীন এ শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হলো জাতিকে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া এবং মুসলিম কৃষ্টি কালচার ও ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষা ও মুসলিম জাতি সত্ত্বাকে ধ্বংস করা। সরকার

আলিয়া নেসাবের মাদরাসা শিক্ষার প্রতি যেমন আঘাত হানছে তেমনি ষড়যন্ত্র হস্ত কওমী মাদরাসা শিক্ষার উপর। যারা এতদিন রাজনীতি থেকে দূরে সরে থেকে শুধু দ্বীনি ইলম চর্চা করতেন তারাও সরকারের অত্যাচার নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

মাওলানা নিজামী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার আবার যদি ক্ষমতায় আসতে পারে, তাহলে ইসলামের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশী। আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তা বাস্তবায়নের সুযোগ পেলে জাতির মহাসর্বনাশ হবে। কাজেই এখনই সরকারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জাতির বিবেক শিক্ষক সমাজকে সর্তক হতে হবে। শিক্ষক সমাজকে তাদের পেশাগত দাবী আদায়ের আন্দোলনের সাথে সাথে সরকার বিরোধী গণ আন্দোলনেও যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষক পরিষদের উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান বলেন, সরকার শিক্ষকদের উপর নানাভাবে জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে। একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগের লোকদের নিয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোকে দলীয়করণ করা হচ্ছে। শিক্ষক সমাজের মধ্যে নীতি নৈতিকতা যতটুকু আছে তাও ধ্বংস করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আদর্শ শিক্ষক পরিষদ নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি ড. লোকমান বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা সংকোচন নীতি অবলম্বন করছে। আরবী ভাষা ও ইসলাম শিক্ষার বিরুদ্ধে সরকার ষড়যন্ত্র করছে। এ সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের সাথে ৯ দফা চুক্তি করে কৌশলে শিক্ষকদের ধোঁকা দিয়েছে। এ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সকলের দো'আ ও সহযোগিতা কামনা করেন।

সেক্রেটারী জেনারেলের সকাশে তাফসিলী নেতৃবর্গ

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ২০০১ সালের ২১ মে সংখ্যা লঘু তাফসিলী সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল ও পরবর্তীকালে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের সাথে এক সাক্ষাৎ পূর্বক মতবিনিময় করেন। এ মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতা কার্তিক ঠাকুর এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এম.পি অধ্যক্ষ

গণেশ হালদার, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের সাবেক ভিপি খোন্দকার ফারুকুর রহমান। উক্ত মতবিনিময় সভায় জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বলেন:

জামায়াত জাতি ধর্ম, নির্বিশেষে সকল মানুষের মৌলিক অধিকার এবং গণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নীতিতে বিশ্বাসী। ধর্মীয় বিশ্বাস বা অন্য কোন কারণে মানুষের মধ্যে ভেদ বৈষ্যম্য সৃষ্টির নীতিতে জামায়াত বিশ্বাস করে না। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য জামায়াতে ইসলামী জন্মলগ্ন থেকে প্রয়াস চালাচ্ছে।

জামায়াত সেক্রেটারী জেনারেল একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন: শুধু অমুসলিম হবার কারণে যদি কোন অমুসলমানের উপর কেউ অত্যাচার নির্যাতন চালায় তাহলে কিয়ামতের (শেষ বিচার দিনে) দিন আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিব। তিনি বলেন, জামায়াত যা বিশ্বাস করে তা বলে এবং সাধ্যমত তা করার চেষ্টা করে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গাসহ বাংলাদেশে যখনি কোন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে জামায়াতে ইসলামী তখনি সংখ্যালঘুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে কোন বিপদে আপদে জামায়াতের নেতাকর্মীগণ তাদের পাশে ছিল ও থাকবে- এ আস্থা রাখতে পারেন।

তিনি বলেন, দেশের কামার, কুমার, দিন মজুর, ঠেলাগাড়ী চালক ও রিকশা চালকদের মত সংখ্যালঘু তাফসীলি সম্প্রদায়কে ও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে পরস্পরকে জানা ও বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

জামায়াত নেতা বলেন, যারা নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং পালন করেন তারা অন্যের ধর্মীয় অধিকার ও বিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। তিনি বলেন যারা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত প্রতিনিধি। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা রমনা কালীমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদেশের সম্মানিত আলেম সমাজ ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে যে বিষোদগারপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়েছে, তার সাথে সংখ্যালঘু তাফসিলী সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে যে কোন সম্পর্ক নেই তা দেশবাসীকে জানানোর জন্য তিনি তাফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও নির্বাচনের পক্ষে নিরলসভাবে

কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং মতবিনিময় করতে আসার জন্য তাফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের ধন্যবাদ জানান।

সংখ্যালঘু তাফসিলী সম্প্রদায় সেলের আহ্বায়ক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কার্তিক ঠাকুর এবং সাবেক এম.পি, মাদারীপুর কলেজের অধ্যক্ষ গণেশ হালদার বলেন যে, এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র জামায়াতে ইসলামী তাদের ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে সংখ্যালঘু তাফসিলী সম্প্রদায়ের লোকের জন্য সংখ্যানুপাতে জাতীয় সংসদের আসন বন্টনের দাবি জানিয়েছে। এ জন্য তারা জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তারা বলেন, ক্ষমতার বৈতরণী পার হবার জন্য বিভিন্ন দল তাফসিলী সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবহার করে। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে কেউ তাদের সমস্যার সমাধান করেনি। ফলে তাফসিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা শত শত বছর ধরে বঞ্চিত অনুন্নত থেকে গেছে। তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট সংরক্ষণের জন্য তারা জাতীয় সংসদে সংখ্যানুপাতে তাফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য আসন বন্টনের দাবি জানান।

তারা জাতীয় সংসদে তাফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যানুপাতে আসন বন্টনের এবং জাতীয় সংসদে তাফসিলী সম্প্রদায়ের সঠিক প্রতিনিধিত্ব প্রদানের বিষয়টি চারদলীয় জোটের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইনটাওয়ার ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় জামায়াত

২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংসের প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ১২ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে যে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন তা নিম্নরূপ-

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিইউয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় গতকাল ১১ইং সেপ্টেম্বর সকালে বিমান-বিস্ফোরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ধরনের ঘটনা বিশ্বশান্তির প্রতি এক মারাত্মক

হুমকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গতকাল সংঘটিত এ অমানবিক ঘটনায় শান্তিকামী বিশ্ববাসী স্তম্ভিত ও হতবাক।
গতকাল সংঘটিত ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমি তাদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

২০০১ সনের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

২০০১ সনের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনকালে রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ। কেয়ারটেকার সরকার প্রধান ছিলেন বিচারপতি লতিফুর রহমান। অন্যান্য উপদেষ্টা ছিলেন বিচারপতি বি.কে.রায় চৌধুরী, রোকেয়া আফজাল রহমান, মেজর জেনারেল (অব) মইনুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুর ইলাহী, এম. হাফিজুদ্দিন খান, এ.কে.এম. আমানুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আবদুল মালিক, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী এবং এ.এস.এম. শাহজাহান।

শেখ হাসিনা ক্ষমতা ত্যাগ করার পূর্বে প্রশাসন, পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনে তাঁর পছন্দের ব্যক্তিদেরকেই বসিয়ে যান। ২০০১ সনের ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ আকস্মিকভাবে চারদলীয় জোট ত্যাগ করেন। তবে নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটি অংশ চারদলীয় জোটে থেকে যায়।

রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ এবং কেয়ারটেকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন যা পূর্ববর্তী দুটি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের চেয়েও অধিকতর সুষ্ঠু হয়েছিলো।

এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৩টি আসন, আওয়ামী লীগ ৬২টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী ১৭টি আসন লাভ করে।

জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ হচ্ছেন :
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (পাবনা), মাওলানা আবদুস সুবহান (পাবনা), অধ্যাপক আবদুল্লাহিল কাফী (দিনাজপুর), আযিযুর রহমান চৌধুরী (দিনাজপুর), মিযানুর রহমান চৌধুরী (নিলফামারী), মাওলানা আবদুল আযিয (গাইবান্ধা), মুফতী আবদুস সাত্তার (বাগেরহাট), মিয়া গোলাম পরওয়ার (খুলনা), শাহ মুহাম্মাদ রুহুল কুদ্দুস (খুলনা), আবু সাঈদ মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসেন (যশোর), মাওলানা আবদুল খালেক মন্ডল (সাতক্ষীরা), রিয়াছাত আলী বিশ্বাস

(সাতক্ষীরা), গাজী নজরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (পিরোজপুর), ফরিদুদ্দীন চৌধুরী (সিলেট), ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহের (কুমিল্লা), শাহজাহান চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

সংসদের মহিলা আসনগুলো থেকে জামায়াতে ইসলামী ৪টি আসন লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ হচ্ছেন- ডা. আমেনা বেগম, শাহানারা বেগম, সুলতানা রাজিয়া ও রোকেয়া বেগম। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এটি পঞ্চম উপস্থিতি।

এই নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বেসামাল হয়ে পড়েন। সচেতন ভোটারগণ তাঁর সাজানো বাগান তছনছ করে দেয়ায় তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি, কেয়ারটেকার সরকার প্রধান, নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনকে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। অথচ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান ছাত্র জীবনে বাম ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শেখ হাসিনার পরামর্শে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন জনাব এম.এ.সাঈদ। তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তি লে. জেনারেল হারুনুর রশীদই নির্বাচনকালে সেনাপ্রধান ছিলেন।

তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর দলের সদস্যগণ জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না। অবশ্য পরে তিনি ও তাঁর দলের সদস্যগণ শপথ নেন। কিন্তু তাঁরা সংসদের অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন।

চারদলীয় জোট সরকার কায়েম হওয়ার পর বিরোধী দল দেশে-বিদেশে যে দু'টি অপবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন তা হলো-

এক. চারদলীয় জোটের দুটি দলই মৌলবাদী। যেই কারণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে উৎখাত করা জরুরি ছিলো, একই কারণে বাংলাদেশের জোট সরকার উৎখাত করা প্রয়োজন।

দুই. ইসলামপন্থীরা সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী। তারা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালায় এবং হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে। আর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এইসব কুকর্মে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অতএব জোট সরকার উৎখাত করা অত্যাবশ্যক।

সুখের বিষয়, আমেরিকা এবং ইউরোপের সরকারগুলো এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি। এই দেশে অবস্থানকারী তাদের রাষ্ট্রদূতগণ হিন্দুদের বা সংখ্যালঘুদের

নির্যাতনের কোন সত্যতা খুঁজে পাননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বাংলাদেশ সফর করে এই দেশকে 'উদার মুসলিম রাষ্ট্র' বলে মন্তব্য করেন এবং এই দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশংসা করেছেন।

সংসদে না গেলেও আওয়ামী লীগ রাজপথে থেকে জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। দলটি জোট সরকারকে সাম্প্রদায়িক সরকার, মৌলবাদী সরকার ইত্যাদি বলতে থাকে এবং জোট সরকার বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। এই অপপ্রচার কোন বিদেশী শক্তিকে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য আহ্বানেরই শামিল ছিলো।

উল্লেখ্য, এই সময় ভারতের বেশ কয়েকটি পত্রিকা এবং কয়েকজন কলামিস্ট আওয়ামী লীগের বক্তব্যের প্রতি জোরালো সমর্থন জানাতে থাকে।

নির্বাচনোত্তর সাংবাদিক সম্মেলন

৪ঠা অক্টোবর ২০০১, জামায়াতে ইসলামীর আমীর ৪ দলীয় জোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও সদ্য নির্বাচিত জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১লা অক্টোবর অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি, কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা মন্ডলী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, সাংবাদিক, রেডিও, টেলিভিশনের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ, সেনাবাহিনী, বি.ডি.আর. পুলিশ, আনসারসহ দেশবাসীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বলেন, এ নির্বাচনে দেশের জনগণ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার রাজনীতির পক্ষে রায় প্রদান করেছে।

৪ঠা অক্টোবর ২০০১ বেলা ১১টায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা নিজামী উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি. সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, জনাব আবদুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব মুহাম্মদ ইউনুস, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের ইসলামীর আমীর জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও নির্বাচন প্রচার কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মোঃ তাসনীম

আলম, ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর জনাব মুমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী ও এডভোকেট জসীম উদ্দীন সরকার, সেক্রেটারী মাওলানা এ টি এম মাছুম ও সহকারী সেক্রেটারী জনাব রফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আরো বলেন, চারদলীয় জোট মুসলিম জাতিসত্তা, ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে জাতির সাথে ওয়াদাবদ্ধ। চারদলীয় জোট দেশে সহনশীলতা, সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও উৎপাদনের রাজনীতি চালু করতে চায়। এ ব্যাপারে তিনি সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা দেশে নেতিবাচক রাজনীতির পরিবর্তে যুক্তি নির্ভর বুদ্ধি-বৃত্তিক গঠনমূলক ও দেশগড়ার রাজনীতি চালু করতে চাই। তিনি হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করে উন্নয়নের স্বার্থে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও কালো টাকার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। জনগণ আওয়ামী লীগের রাজনীতি ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সন্ত্রাস ও কালো টাকা ব্যবহার করে নির্বাচনে জয়লাভের আওয়ামী অপচেষ্টা দেশের জনগণ ভণ্ডুল করে দিয়েছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে জনগণের রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য ও আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করার জন্য তিনি শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি শেরপর-১ আসনের যে ১৭টি কেন্দ্রে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা চারদলীয় জোটের পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে ব্যালট ডাকাতি করেছে সেগুলোর নির্বাচন বাতিল করে পুন:নির্বাচন প্রদানের দাবি জানান।

তিনি বিগত সকল আন্দোলনে দেশের সাংবাদিক সমাজের গৌরব দীপ্ত ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং যুক্তিনির্ভর ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনমূলক ও দেশ গড়ার রাজনীতি চালু করার ক্ষেত্রে সাংবাদিক সমাজকে যথার্থ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে চার দলীয় জোট সরকার গঠন করে। বিএনপি চেয়ারপার্সন ও জোটের অন্যতম শীর্ষ নেত্রী খালেদা জিয়া তৃতীয় বারের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকারের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন। পঞ্চাশ জনের অধিক সংখ্যক মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে জোটের প্রধান শরীক দল জামায়াতে ইসলামী মাত্র দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষিমন্ত্রী এবং সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের ২২ মে পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সাথে কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করেন এবং ২০০৩ সালের ২৫ মে থেকে ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে শিল্পমন্ত্রণালয়কে সমৃদ্ধ করেন। সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে পালন করতে সক্ষম হন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ভাল করে উপলব্ধি করেছেন জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় এই দু'জন নেতা কতটা সৎ, নির্মোহ এবং নির্দোষ ছিলেন এবং সরকার তথা মন্ত্রণালয়ে নবাগত হলেও কত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমীরে জামায়াত ও কৃষি মন্ত্রীর সাথে অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার

১৩ই অক্টোবর ২০০১ সন্ধ্যায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে অভিনন্দন জানাতে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগমন করেন বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির সভাপতি এডভোকেট সমরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, প্রধান উপদেষ্টা, এডভোকেট মনোরঞ্জন দাস, সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট গোবিন্দ্র চন্দ্র প্রমাণিক, সদস্য দীলিপদাস গুপ্ত, এডভোকেট সুনীল বিশ্বাস, ডা. নির্মল চৌধুরী, শ্রী শ্যামল চন্দ্র মজুমদার, শ্রী দেবাশীস সিকদার, আরাধন সরকার, শংকর মিত্র, এডভোকেট অংসুই, থুই সুকুমার রায়, নরেশ চন্দ্র শাহা, ইঞ্জিনিয়ার আশুতোষ ভৌমিক, এডভোকেট আশোক কুমার বিশ্বাস, এডভোকেট বিনয় কুমার পোদ্দার প্রমুখ।

সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায়ের জানমাল, ইজ্জত আবরুর হেফাজত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনো সংখ্যালঘু অমুসলিমদের প্রতি কোন ধরনের অন্যায় অবিচার করতে পারে না। তিনি বলেন সকল প্রকার মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার শপথ নিতে হবে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আরো বলেন, কোন শান্তিকামী মানুষ কখনো অপরাজনীতিতে বিশ্বাস করতে পারে না। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে দেশের কোথাও কোথাও নিছক রাজনৈতিক উত্তাপ ও উত্তেজনার বশে বিচ্ছিন্নভাবে দুই একটি অনাকাংখিত ঘটনা হয়ত ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু তাকে ঢালাওভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত না।

তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসকের সাথে আলাপ হয়েছে। সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষা করতে হবে এবং সন্ত্রাস দমন করার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তার সাথে সাক্ষাত করতে আসার জন্য তিনি বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির নেতাদের ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে একটি অভিনন্দন বার্তা প্রদান করা হয়। অভিনন্দন বার্তায় বলা হয় যে, চারদলীয় ঐক্যজোটের নেতৃত্বে ধর্মপ্রাণ সরকারে আপনার অংশগ্রহণকে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসাবে বর্ণনা করছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোট ৭০ লাখ ভোটারের মধ্যে ৫৫ ভাগ ভোটার নিজেদের পছন্দমত প্রার্থীদেরকে উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দান করতে পেরে তারা গর্বিত।

নির্বাচন উত্তর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনায় আমরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ভোট গ্রহণের আগ থেকেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নির্যাতন

শুরু হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ঐক্য পরিষদ' এর অহরহ উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে নির্বাচন পূর্ব থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর শুরু হয় নানা রকম হয়রানি ও ভয়ভীতির মহড়া। নির্বাচন পূর্ব আওয়ামী শাসন আমলে দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখের সামনেই যেভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন চলেছে তাতে এ কথা সুস্পষ্ট আওয়ামী লীগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাজনীতির ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। এমনকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের দেশপ্রেমকে কটাক্ষ করতে শেখ হাসিনা ছিলেন অগ্রগামী। তাদেরই নেতৃত্বে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রয়েছে। নারীদের লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। সম্পত্তি দখল করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় বাড়ী ঘর ছেড়ে তাদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। যেমনটি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত করা হয়েছিল।

আপনার মাধ্যমে চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের নিকট আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জোর দাবি জানাচ্ছি। নির্বাচন পূর্ব ও নির্বাচন উত্তর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত অত্যাচার ও নির্যাতনের শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য এবং ইতোমধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিচয়ের কারণে যারা হতাহত হয়েছে ও হচ্ছে তার প্রতিকারের জন্য এবং তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনার স্বার্থে "সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়" গঠন করতে এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অত্যাচার নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় সংসদের আসন সংরক্ষণ করার জন্য আমরা আপনার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র আখ্যা দেবার ষড়যন্ত্র

২০০১ সালের নির্বাচনের পর প্রধান বিরোধীদল সরকারকে ঘায়েল করার জন্য দুটো অস্ত্র বেশী বেশী ব্যবহার করেছে। আগেও করেছে, ক্ষমতায় থাকতেও করেছে। মানুষ যখন বিবেক বর্জিত হয় তখন আসলে ক্ষমতায় থাকতে কি বলেছে, ক্ষমতা হারানোর পর কি বলছে তার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা, সঙ্গতি আছে কিনা সেটা বুঝার শক্তি থাকে না। হরতাল করবেন না বলেছিলেন, কিন্তু বিরোধী দলে গিয়ে ঠিকই হরতাল করেছেন। তারা দ্বিতীয় মেয়াদে পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) ক্ষমতায় ছিলেন তাদের সময় হারকাতুল জিহাদ থেকে শুরু করে নানা ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের কথা নিজেরাও বলেছেন। দূতাবাসের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী ক্ষমতা থেকে বিদায় নেবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের উত্থাপিত একটি অভিযোগও প্রমাণ করতে পারেনি।

ক্ষমতা হারানোর ব্যাথা বেদনা তাদের এতই কাতর করেছে যে, আবার পুরনো কথায় চলে গেছেন। এবং দুটো হাতিয়ার বিশেষভাবে তারা ব্যবহার করেছেন, একটা হলো সংখ্যালঘু নির্যাতন, যাদের পৃষ্ট-পোষকতায় মসজিদ মাদরাসা বেড়েছে, একই সময়ে তাদের পৃষ্ঠ পোষকতায় পূজা মন্ডপও বাড়ছে এটা তারা বলতেও চাননা, স্বীকার করতে চাননা। এ ঘটনা প্রমাণ করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম রাষ্ট্রটিই দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-ফ্যাসাদের কোনো ঘটনাই ঘটেনি, তবে হ্যাঁ, রটনা, প্রচারনা রয়েছে শত সহস্রাধিক এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টানদের ওপর নির্যাতনের কল্পকাহিনী তৈরী করে তা' দেশ- বিদেশের প্রচার মিডিয়াতে পরিবেশন করাই এ বাংলাদেশ সম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব যারা আবিষ্কার করছে, বাংলাদেশের মানুষকে তারা খাটো করছে, বাংলাদেশের মূখে তারা চুনকালি লেপন করছে। ইসলামকে হেয় করে দেখবার চেষ্টা করছে এবং মুসলমানদের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে।

তাদের দ্বিতীয় হাতিয়ার এদেশে জঙ্গিবাদী ইসলামী সংগঠন আছে বলে প্রচার করা। অপপ্রচারের কাজে তারা কিছু বিদেশী সংবাদ পত্রকেও ব্যবহার করেন। ফার ইস্টার্ণ ইকোনোমিক পত্রিকায় ২০০২ সালের ৪ঠা এপ্রিল সংখ্যায় বাংলাদেশ ককুন অব টেরর টাইম "ডেডলী কার্গো" ম্যাগাজিনে ২০০২ সালের ২১ অক্টোবর সংখ্যায় শিরোনামে লিখিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে দেশের ভাবমর্যাদা বিনষ্টের অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

পীরজাদা মোসলেহ উদ্দীনের হত্যায় জামায়াত নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতি

২০০২ সালের ৬ই আগস্ট ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান পীরজাদা মোসলেহ উদ্দীন আবু বকর মিয়া ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ৭ আগস্ট ২০০২ তারিখে নিম্নোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন:

"ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান পীরজাদা মোসলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া ৬ আগস্ট সন্ধ্যায় ঢাকার শনির আখড়ার কাছে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়ায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এ ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। পীরজাদা আবু বকর মিয়া একজন সুপরিচিত ইসলামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এদেশে বৃটিশ বিরোধী ও ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সিংহপুরুষ হাজী শরীয়াতুল্লাহর অধস্তন পুরুষ। বিগত আওয়ামী স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মরহুম বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত তদন্ত করে পীরজাদা মোসলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়ার হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করবেন।

মরহুমের জীবনের নেক আমল সমূহ কবুল করে মহান আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতে অতিউচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন আমরা এ দোয়াই করছি। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও ভক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং সাথে সাথে এ দোয়াও করছি যাতে করে আল্লাহ তাদেরকে এ শোক সহ্য করার তওফিক দান করেন। আমীন।"

উপজেলা আমীর সম্মেলন ২০০২

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবিক ১৭ থেকে ১৯ মে ২০০২ তিনদিনব্যাপী উপজেলা আমীর সম্মেলন মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধণী বক্তব্য রাখেন জামায়াতের ঐ সময়ের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব শামসুর রহমান।

১৭মে সকাল ৯টায় উদ্বোধনী ভাষণে জনাব শামসুর রহমান বলেন, ইসলামই হলো এদেশে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হেফাজতের একমাত্র গ্যারান্টি। কাজেই এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের হেফাজতের জন্য আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে।

ভাষণের শেষ পর্যায়ে প্রবীন জামায়াত নেতা অত্যন্ত আবেগের সাথে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর ইসরাইলী ইহুদীদের, ভারতের গুজরাট ও কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর উগ্র হিন্দুদের এবং বার্মার বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর বর্মী সামরিক জান্তার যে অকথ্য নির্যাতন চলছে তা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জাতিসংঘ এবং ওআইসিসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মুসলিম দেশগুলোর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলন উদ্বোধনের পরে দরসে কুরআন পেশ করেন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ।

উপজেলা আমীর সম্মেলনে সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সংগঠনের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। মাওলানা নিজামী তাঁর ভাষণে বলেন, জনগণের শান্তি ও কল্যাণের জন্যই আমরা চারদলীয় জোটের সরকারে শরীক হয়েছি। কোন ধরনের অবৈধ সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা সরকারে শরীক হইনি।

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী নিছক কোন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন নয়। এটা একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন। এ আন্দোলনের পথিকৃত নবী ও রাসূলগণ (সা.), তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকরেই এ আন্দোলন চলছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন ও রাসূলের (সা.) সুন্নাতই এ আন্দোলনের মূলভিত্তি। রাসূলের জীবনাদর্শই এ আন্দোলনের অনুসরণীয় নমুনা। রাসূলের (সা.) অবর্তমানে তাঁর সে দায়িত্ব আজ উম্মাতে মোহাম্মাদীর উপর বর্তিয়েছে। রাসূলে (সা.) উম্মত হিসেবেই আমরা ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করছি। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য যারা ইসলামী আন্দোলন করছেন, তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি রয়েছে।

আমীরে জামায়াত বলেন, আমাদের কাজ হলো মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করা। এ জন্যই সর্বস্তরের মানুষকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। ইসলাম বিরোধী শক্তির বেষ্টনী থেকে মুক্তির জন্য সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দিতে হবে। আন্দোলন, সংগঠন ও ব্যক্তিগঠন এবং সমাজ সেবামূলক কাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করার জন্য তিনি উপজেলা আমীরদের আহ্বান জানান।

মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন

১২ই জুলাই ২০০২ সকাল নয়টায় মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের উদ্বোধনকালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে চারদলীয় জোট সরকার বিগত নয় মাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলো সাফল্য অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার ঘটনার পরে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা এবং ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইলী সন্ত্রাসী হামলার ফলে সারা মুসলিম বিশ্বে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তার বিরুপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে বাংলাদেশও মুক্ত ছিলনা। অপর দিকে আওয়ামীলীগ সরকার রেখে গিয়েছিল বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত দলীয়করণকৃত প্রশাসন। আওয়ামী লীগের আমলে মাদক দ্রব্যের অবাধ ব্যবহার ও বিচরণের ফলে যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেংগে গিয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃংখলা এবং প্রশাসনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। সন্ত্রাসের অভিযোগে মন্ত্রী পুত্র, এম.পি ও দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সন্ত্রাস দমনে সরকারের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার কোন অভাব নেই। জনগণের ও প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতার ফলে সরকার পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করতে সক্ষম হয়েছে এবং জাতীয় স্বার্থে আদমজী জুটমিল বন্ধ করে দেয়ারমত কঠোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সফল হয়েছে।

তিনি বলেন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির অপরাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এ শক্ত ব্যাধি থেকে জাতিকে মুক্ত করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দিন রাত ৮টা থেকেই এ নির্বাচনের ফলাফল বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। তাদের প্রথম ষড়যন্ত্র ছিল নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে না দেয়া, দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা। তৃতীয় ষড়যন্ত্র ছিল তৎকালীণ স্পীকারকে দিয়ে সংসদ সদস্যগণের শপথ গ্রহণ বিলম্ব ঘটানো। আওয়ামী লীগের দলীয় সিদ্ধান্তের কারণেই তৎকালীন স্পীকার সংসদ সদস্যগণকে শপথ গ্রহণ করাতে বিলম্ব করেছিলেন।

চারদলীয় জোটের সরকার গঠিত হওয়ার পরে আওয়ামী লীগ দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্রমূলভাবে অপপ্রচার চালাতে থাকে যে জোট সরকারের মধ্যে তালেবান রয়েছে। কিন্ত তাদের সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

তিনি বলেন, চারদলীয় জোটের সরকার গঠনের পরে আওয়ামী লীগ এবার সারের ঘাটতি হওয়ার আশংকার গুজব ছড়িয়েছিল। কিন্তু সরকারের সার্বিক সহযোগিতা, কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের যথাসময়ে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে এবার দেশে সারের কোন সংকট সৃষ্টি হয়নি। ফলে এবার কৃষিপণ্যের উৎপাদন আশানূরুপ হয়েছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ বিগত নির্বাচনে হেরে গিয়ে জনগণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাচ্ছে। তবে সরকার এহেন ষড়যন্ত্র সফলভাবে মোকাবেলা করছে।

জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য তিনি প্রধান বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, হরতালের নেতিবাচক রাজনীতি না করার যে প্রতিশ্রুতি বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের সাথে করেছিলেন তা রক্ষা করবেন বলে দেশবাসী আশা করছে।

তিনি বলেন, জনগণের যে সুদৃঢ় ঐক্যের মাধ্যমে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসেছে তা যে কোন মূল্যে ধরে রাখতে হবে। চারদলীয় জোটের ঐক্য আরো মজবুত করে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে

সংগঠনকে আরো জোরদার ও বেগবান করার জন্য তিনি জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণের প্রত্যাশা পুরণের লক্ষ্যে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

দেশজাতি ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে তওফিক কামনা করেন।

পরিশেষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মরহুম মুহাম্মদ ইউনুসের মাগফিরাতের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণকে সাথে নিয়ে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদ মুক্ত ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইউনুস ২০০২ সালের ১৭মার্চ ঢাকায় আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন।

শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রসংগে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল

৪দলীয় জোট সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাধার সৃষ্টি করে হীন রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২ এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন-

“নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ৪দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর জোট সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রীদের বিনাবেতনে পড়ার ব্যবস্থা, প্রাইমারী স্কুল ও মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি চালু, প্রাইমারী স্কুল ও মাদরাসার (এবতেদায়ীসহ) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বই বিলি, মাদরাসা শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন ও কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, বহুসংখ্যক কলেজ, মাদরাসা ও স্কুলকে এম.পি.ও. ভূক্তকরণ ও উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসা, বয়স্ক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

সরকার যখন একের পর এক এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তখন নির্বাচনে পরাজিত অপশক্তি নানা ধরণের অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন ইস্যু দাঁড় করিয়ে শিক্ষাঙ্গনে অশান্তি সৃষ্টি করছে এবং শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

শামসুন্নাহার হলের ঘটনার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেবার পরও ঐ মহলের সমর্থক শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীগণ এবং কতিপয় ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বুয়েটের ছাত্রী সনি হত্যার ঘটনায় সরকার মূল আসামীদের গ্রেফতার ও দ্রুত চার্জশীটের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেবার পরও ঐ মহলটি ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তাদের ষড়যন্ত্রের কারণেই বুয়েট খোলার পরও কর্তৃপক্ষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণিত করার হীন কৌশল নিয়ে ঐ মহলটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্রী নির্যাতনের ভিত্তিহীন ধূয়া তুলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ মহলটি একের পর এক কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ ধরনের অযৌক্তিক ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মসূচির কারণে দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অবস্থায় দেশবাসীকে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এবং শিক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টিকারী অপশক্তি সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

ইসলাম বিরোধী বাংলাপিডিয়া নিষিদ্ধ করার জন্য উলামা মাশায়েখ কমিটির যুক্ত বিবৃতি

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ইসলাম বিরোধী বিতর্কিত বাংলাপিডিয়া অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে কেন্দ্রিয় ওলামা-মাশায়েখ কমিটির সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ নিম্নোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন-

"এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়ায় ইসলামকে অবমাননা ও বিতর্কিত করার ষড়যন্ত্রের আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রকাশিতব্য বাংলাপিডিয়ায় ইসলাম ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে চরম অবমাননাকর ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করে মুসলমানদের ঈমানের উপর আঘাত প্রদান করা হয়েছে। বিতর্কিত বাংলা পিডিয়ায় পবিত্র ঈদুল আজহাকে বলা হয়েছে 'কাউ ফ্যাস্টিভ্যাল' ঈদুল ফিতরকে বলা হয়েছে 'বদর যুদ্ধের বিজয় উৎসব' ইব্রাহিম (আ.) এর নাম বিকৃত করে 'আব্রাহাম' লেখা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) এর নাম বিকৃত করে লেখা হয়েছে 'আবু বাকের', হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শেষ নবী স্বীকার করা হয়নি, হযরত মুহাম্মদ

(সা.) বিবি খাদিজাকে টাকার লোভে বিবাহ করেছেন বলে উল্লেখ করে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তিকে 'সিদ্ধিলাভ' করেছেন বলে উল্লেখ করে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কেও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এতে শিয়া-সুন্নী ও মুহররম সম্পর্কেও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ বিতর্কিত বাংলা পিডিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মহীনতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে ইসলামকে সুকৌশলে হেয় প্রতিপন্ন ও বিকৃত করা হয়েছে।

সরকারী অর্থে বিতর্কিত বাংলাপিডিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে ধর্মহীন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠি সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধার পরিচয় দিয়েছে। এ বাংলাপিডিয়া আওয়ামী লীগ ও আওয়ামীপন্থী সমস্ত ব্যক্তি ও বিষয়কেই মহান হিসেবে তুলে ধরে অআওয়ামী লীগার ব্যক্তি ও ইস্যুগুলো বর্জন করা হয়েছে। এ বাংলাপিডিয়াকে ধর্মহীন আওয়ামী পিডিয়া বলাই যুক্তিযুক্ত। এতে ইসলামী ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে বিকৃত বানোয়াট, আপত্তিকর ও উস্কানিমূলক বক্তব্য সংকলন করা হয়েছে। বাংলাভাষায় অধিক সংখক ইসলামী সাহিত্যের প্রণেতা ও অনুবাদক হিসেবে অগ্রনায়ক, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুর রহীমের (১৯১৮-৮৭) ন্যায় বহু পন্ডিত-গবেষকের নামটা পর্যন্ত উল্লেখ নেই। বিতর্কিত বাংলাপিডিয়ার প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "বাংলাপিডিয়া প্রকাশের পরে দেশে বিশৃংখলা দেখা দিলে তিনি সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভিন্ন দেশে চলে যাবেন। এ বাংলাপিডিয়া তার জীবনের শেষ মিশন"। এ কথা বলার পরে এ বাংলাপিডিয়া প্রকাশের ব্যাপারে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে কি?

এ বাংলাপিডিয়ায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে দেশের ইসলাম প্রিয় জনগণের ঈমানের উপর চরম আঘাত দিয়েছে। দেশের জনগণ ইসলাম ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কোন ধরনের বিকৃত তথ্য ও কটূক্তি বরদাস্ত করতে রাজী নয়। কাজেই বিতর্কিত বাংলাপিডিয়াটি অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমরা সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি"।

যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাই দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র মাধ্যম

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন যাকাত দরিদ্রের প্রতি ধনীর দয়া নয়, ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার এবং মৌলিক ইবাদত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার

যুগে কোন গরীবকে যাকাতের জন্য কোন ধনীর দুয়ারে যেতে হয়নি বরং সম্পদশালী ব্যক্তিকে গরীবের ঘরে যাকাত পৌছে দিতে হয়েছে।

২৭ নভেম্বর ২০০২ এগ্রিকালচারিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ আয়োজিত দারিদ্র বিমোচনে যাকাত ও ওশর শীর্ষক এক সেমিনার ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ফোরামের সভাপতি কৃষিবিদ ড. মোঃ মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) অডিটরিয়াম মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামী ব্যাংক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমীর পরিচালক (রিসার্চ) ড. মাহমুদ আহমেদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ডা. এন, এ, কামরুল আহসান, কৃষিবিদ মোঃ ফারুকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখের কৃষিবিদ মোঃ আলী আফজাল, উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রী বলেন ইসলাম নিছক ধর্ম নয়, কোরআন শুধু ধর্ম গ্রন্থ নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়েছে ইসলাম ও আল কোরআন। মুসলমানগণ তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে বিদেশী সাহায্যের দারস্থ হয় অথচ আমাদের ঘরে রক্ষিত কোরআনে এর সঠিক সমাধান রয়েছে। নবী-রসূলগণ শুধু ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্যই আসেননি। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বাণিজ্য-কূটনীতি ইত্যাদির শিক্ষা নবী রসূলগণ দিয়েছেন।

প্রধান অতিথি পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল যুগের সকল মানুষের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা সকল নবীগণ বিশেষভাবে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন। আল্লাহ মুসলমানদেরকে দুটি পরিচয়ে পরিচিত করেছেন। প্রথমত মুসলমানগণ "খাইরে উম্মত" বা উত্তম জাতি। উত্তম জাতীর দায়িত্ব হলো মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে উজাড় করে দেয়া। দ্বিতীয়ত হলো "উম্মতে ওসাত" বা মধ্যম পন্থী উত্তম জাতি, এ প্রসঙ্গে তিনি পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের সমালোচনা করে বলেন তারা আমাদেরকে মৌলবাদী-অমৌলবাদী বলে হেয় প্রতিপন্ন করছেন। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানগণ মধ্যমপন্থী জাতি।

আল কোরআনের অর্থনৈতিক দিক তুলে ধরে প্রধান অতিথি বলেন অতিরিক্ত ব্যয় এবং কার্পণ্য করা নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন দারিদ্রতা আমার অহংকার এবং দরিদ্র লোক আমার বন্ধু। পাশাপাশি এও বলেছেন দারিদ্র মানুষকে কুফরির দিকে নিয়ে যায়। অতএব এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন আমি কোরআনকে যতটুকু অধ্যয়ন করেছি তাতে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে, কোরআনকে অনুসরণ করলে এবং কোরআনের অর্থনীতি মেনে চললে মুসলমান দরিদ্র থাকার কথা নয়। সুদ শুধু হারাম নয়, শোষণেরও হাতিয়ার। কোরআনে যাকাত বণ্টনের আটটি খাত আছে এর মধ্যে যাকাত আদায়ের কর্মচারীও আছে। যাকাত আদায়ের কর্মচারী রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করলেই কেবল থাকতে পারে। কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেন আমি মুমিনদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা নামায কায়েমের পাশাপাশি যাকাত আদায় করবে। অতএব প্রমাণিত হয় যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় ও পরিশোধের জন্য ফরজ হয়েছে। কোরআন ও ইসলামের অনুসরণই মানব জাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি দিতে পারে।

কেন্দ্রীয় শূরায় আমীরে জামায়াত ও কৃষিমন্ত্রীর ভাষণ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, সরকার সন্ত্রাস দমন করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানের ফলে সন্ত্রাস দমন হওয়ায় দেশের জনগণের মনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। জনগণ এবার আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন করেছে। সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন ও আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি ১৯ শে ডিসেম্বর ২০০২ সকাল দশটায় মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার দুই দিন ব্যাপী বৈঠকে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ, সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা মুহাম্মদ

আবদুস সুবহান এমপি ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি. সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, জনাব মকবুল আহমাদ, জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, জনাব আবদুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ এবং কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আরো বলেন, গত বছর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে চারদলীয় জোট সরকার যে সাফল্য অর্জন করেছে তা সামান্য নয়। পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। চলতি বাজেটের ৫৫% ভাগ অর্থের যোগান প্রদান করা হয়েছে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে। সম্পদের অপচয় রোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ও অনুৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতার পরে ঢালাওভাবে শিল্প-কারখানা জাতীয়করণের ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে শিল্প ক্ষেত্রে চরম দৈণ্যদশা সৃষ্টি হয়েছিল। যে কারণে সরকারকে আদমজী জুট মিলটি বন্ধ করে দেয়ার মত কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি চালু করেছে এবং গমের পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার যেখানে মাদরাসা শিক্ষা ধ্বংস করার জন্য বহু মাদরাসার অনুদান বন্ধ করে দিয়েছিল, বর্তমান সরকার সেখানে মাদরাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের নির্বাচনী অংগীকার পূরণ করেছে।

তিনি বলেন, গত বছর ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পরে বিশ্বব্যাপী এক নাজুক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আফগানিস্তানের ঘটনার পরে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর ইসরাইলীদের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন গণত্যার রূপ ধারণ করলেও মুসলিম

উম্মাহর পক্ষ থেকে ইসরাইলী বর্বরতার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ইসলাইলীদের বর্বর হামলার ফলে মুসলিম দেশগুলোর মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ফিলিস্তিনের নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনাকে অকার্যকর করে দেয়া হয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের জন্য তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন জামায়াতে ইসলামী একটি দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক খাঁটি ইসলামী আন্দোলন। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে জামায়াতে ইসলামী এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির সুষ্ঠু ও সঠিক মূল্যায়ন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলীর ইন্তেকাল

২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সংগঠন একজন গুরুত্বপূর্ণ ও ত্যাগী নেতাকে হারান। যিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সফলতার সাথে নিরবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন বড়গাঁও-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকাস্থ ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) থেকে ১৯৫৭ সালে বোর্ডে চতুর্দশ স্থান দখল করে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৫৯ সালে ১ম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। অতপর ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৬৩ সালে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে শাহ আবদুল হান্নানের (সাবেক সচিব ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ প্রাক্তন চেয়ারম্যান) নিকট থেকে সর্বপ্রথম ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। অতপর একটি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ খুররম জাহ মুরাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় এতই মুগ্ধ হন যে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরো বেড়ে যায় এবং ১৯৫৯ সালে তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬১-৬২ সেশনে ইসলামী ছাত্র

সংঘ ঢাকা মহানগরীর সভাপিত এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৩ সালে অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাংবাদিক হিসেবে 'সাপ্তাহিক ইয়ং পাকিস্তানে' কাজ শুরু করেন। অতপর সাংবাদিকতা ছেড়ে ১৯৬৪ সালে মৌলভীবাজার ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর একই বছরে তিনি নরসিংদী ডিগ্রী কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন।

১৯৬৪ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং সে সালেই জামায়াতের রুকন হন। তিনি ১৯৬৬-৬৭ সালে ঢাকা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিভাগের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং ১৯৮৯ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিনিয়র সহকারি সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। সাংগঠনিক কাজে কুমিল্লার থেকে ঢাকায় ফেরার পথে চান্দিনায় এসে গুরুতরভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। সাথে সাথে চান্দিনা হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

মরহুমের তিনটি জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসায়। দ্বিতীয়টি হয় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে আর তৃতীয়টি হয় তাঁর গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জে। প্রতিটি জানাজায় ছিল উপচেপড়া ভিড়। জানাজার শেষে মরহুমকে নিজ গ্রাম বড়গাঁও-এর মসজিদের পার্শ্বে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

বায়তুল মোকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত জানাজায় ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমীর ও কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জানাজার আগে মাওলানা নিজামী এবং জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

মাওলানা নিজামী তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, ১৯৬১ সালে অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঢাকা আলীয়া মাদরাসায় আসেন ইসলামী আন্দোলনের

দাওয়াত দিতে। আমি ভেবে অবাক হয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র মাদরাসার ছাত্রদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি বলেন, মরহুমের অধীনে কর্মী হিসেবে আমি ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেছি। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য গোটা জীবনকেই ওয়াকফ করে গেছেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও বর্তমান আমীরে জামায়াত জনাব মকবুল আহমাদ বলেন- "ব্যক্তি জীবনে তিনি খুবই সহজ-সরল জীবনের অধিকারী ছিলেন। বৈঠকে আলোচনায় যখনই কোনো বিষয় সুস্পষ্ট মতপার্থক্য দেখা দিত দেখতাম তিনি খুব সুন্দরভাবে একটা আপস প্রস্তাব বা সমন্বিত প্রস্তাব পেশ করতেন যা সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য হতো। সাংগঠনিক জীবনে এ ভূমিকাটা খুবই কল্যাণকর অবদান রাখত।"

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মন্ত্রণালয় পরিবর্তন

২০ মে ২০০৩ তারিখে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে জানানো হল তাঁকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের আমীর হিসেবে মন্ত্রণালয় পরিবর্তন আলোচনা সাপেক্ষে হওয়াটা ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তা না করে মাওলানা নিজামীকে মন্ত্রণালয় পরিবর্তনের কথা জানানো হলো। কৃষি মন্ত্রণালয়ে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর Outstanding পারফর্ম দেখে কিছুসংখ্যক লোক ঈর্ষান্বিত হয়। তাই অতি অল্প সময়ে গুছিয়ে আনা মন্ত্রণালয় থেকে মাওলানা নিজামীকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়। ২০ মাস ধরে দায়িত্ব পালনরত মন্ত্রণালয় নিয়ে মাওলানা নিজামীর নানামুখী স্বপ্ন ছিল। এরি মধ্যে বেশ কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে- বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন ছিল। আকস্মিক এ খবরে মাওলানা যারপরনাই ব্যথিত হলেন। এ বিষয়ে মাওলানার বক্তব্য নিম্নরূপ-

"দপ্তর পরিবর্তনের খবর ছিল খুবই আকস্মিক। আমার মনের অজান্তে এ সিদ্ধান্তের প্রতি ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমি বাসায় পৌঁছার সাথে-সাথেই খবরটি পেলাম। পরিবারের সদস্যদের বাইরে কারো সাথে কোন মত বিনিময়ের সুযোগ ছিল না। আমার স্ত্রী, ছোট মেয়ে এবং ছোট ছেলে ছাড়া চার ছেলের তিন ছেলেই তখন দেশের বাইরে। এভাবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব না নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ থেকে সরে দাঁড়ানোই উচিত বলে মনে হল। আমার স্ত্রী এবং ছোট

মেয়ে আমার সাথে একমত হল। আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারী বাসা ছেড়ে মগবাজারের দিকে কোন একটা বাসা ভাড়া নেয়ার ব্যাপারেও একমত হলাম।

পরের দিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের এক প্রোগ্রাম ছিল। ঐ প্রোগ্রাম থেকে যে প্রেস ব্রিফিং দেয়া হয় তাতে আমি আমার নামের সাথে আমীরে জামায়াত ছাড়া অন্য কোন পদ পদবীর উল্লেখ করতে নিষেধ করে দিলাম এবং এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে ঐ দিনই রাতে কর্মপরিষদের জরুরী বৈঠক ডাকতে বলে দিলাম। বৈঠকে বিষয়টি উপস্থাপনের পর সকলের মতামত চাওয়া হল। আমার এবং আমার পরিবারের সিদ্ধান্ত ও মানসিক প্রস্তুতির কথাও তুলে ধরলাম। বিষয়টিকে সবাই আমীরে জামায়াত এবং জামায়াতের জন্যে অমর্যাদাকর মনে করলেও মন্ত্রিপরিষদ থেকে বেরিয়ে আসা ঠিক মনে করা হয়নি।

এ বিষয়ে ঐ রাতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আলোচনার জন্যে জামায়াতের দু'জন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে দায়িত্ব দেয়া হল। তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীর মাধ্যমে সাক্ষাতের সময় পেয়ে যান ঐ রাতেই। তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা হয় যে তাকে যেন আমরা ভুল না বুঝি। তিনি কোন খারাপ উদ্দেশ্যে এ সিদ্ধান্ত নেননি। উক্ত বৈঠকে আমাকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফোনে আলাপের অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি সেই অনুরোধে রাজী হতে পারিনি।

পরের দিন সম্ভবত শনিবারে কেবিনেট ডিভিশন থেকে একজন কর্মকর্তা আমাকে দপ্তর বদলের কথা জানালে, আমি তাকে বললাম খবরটা ইতোমধ্যে রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে লোকেরা জেনে আমাকে জানিয়েছে। পরিবর্তিত দপ্তরে আমি যোগদান করা না করার ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। আমার সংগঠনের নীতি নির্ধারকদের সাথে আলাপের পরই সিদ্ধান্ত নিব। তবে সেটা ইতিবাচকও হতে পারে আবার নেতিবাচকও হতে পারে। এর কিছুক্ষণ পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফোন পেলাম। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। উত্তরাঞ্চলের একমাত্র ভারী শিল্প সুগার ইণ্ডাষ্ট্রিগুলোর

দুরবস্থার কথা আপনি ভালভাবেই জানেন। আপনি এই অঞ্চলের লোক হবার কারণেই আপনার উপর আস্থা নিয়ে দায়িত্বটা দিচ্ছি যাতে সুগার মিলগুলোর উন্নয়নে আপনি কিছু করতে পারেন।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথায় বেশ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বকে আমি শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২/১ দিনের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে ফোনের আলাপ সেদিনের মত শেষ করি।

দপ্তর বন্টন ও পরিবর্তন একান্তই প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ ব্যাপারে কারো তেমন কিছু বলার থাকে না। কিন্তু আমার ব্যাপারটি একটু হলেও ভিন্ন প্রকৃতির। কৃষিমন্ত্রী হিসেবে ২০ মাস দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কৃষি, কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে আমি মনেপ্রাণে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ নিয়ে আমার মনে অনেক স্বপ্নও ছিল। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে দেশের সকল ব্লক সুপারভাইজারগণ ঢাকায় মিলিত হবে তাদের ইতিহাসের প্রথম একটি সম্মেলনে। এখানে তাদের পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা বড় রকমের ইনসেনটিভ দেয়া হবে। পেশ করা হবে চাষীর বাড়ী বাগানবাড়ীর চারটা মডেল একটি পুস্তকের মাধ্যমে। সবই আমার চিন্তার ফসল। কিন্তু সেখানে আমি থাকব না।

ঐ সম্মেলন উপলক্ষে 'চাষীর বাড়ী বাগানবাড়ী'র চার মডেল তুলে ধরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে। উক্ত চারটি মডেলের মূল চিন্তা ছিল আমার। কিন্তু সেই পুস্তকে আমার কোন উল্লেখই রইল না। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে একটি বৃক্ষ মেলা এবং ফল মেলারও আয়োজন করা হয়। সম্মেলন শেষেও তা কয়েক দিন চলে। আমি একান্তই মনের টানে আমার স্ত্রীকে সাথে করে ঐ সম্মেলনস্থলে অনুষ্ঠিত মেলা দেখার জন্যে যাই। মূল উদ্দেশ্য যাদের সাথে নিয়ে ২০টি মাস কৃষি, কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তা ও গবেষকদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কাজ করেছি তাদের সাথে এই সুযোগে একটু দেখা সাক্ষাত করা।

'চাষীর বাড়ী বাগানবাড়ী' প্রোগ্রামটি আরো কার্যকর করার জন্যে 'সম্মিলিত উদ্যান উন্নয়ন' নামে একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্যে পরিকল্পনা বিভাগে পাঠানো হয়েছিল। এটা অনুমোদিত হল আমার কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বিদায়ের মুহূর্তে। আমার চিন্তা আমি যেভাবে বাস্তবায়ন করার জন্যে জানপ্রাণ দিয়ে লেগে

থাকতাম, সেটা আর কেউ করেছে কিনা আমার জানার কোন সুযোগ হয়নি। যা হোক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুরোধে আমি কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত তিন বিদায়ী অনুষ্ঠান (মন্ত্রণালয়ে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে এবং কৃষি মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরে) শেষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম।"

ষোড়শ অধ্যায়

জামায়াতের দৃষ্টিতে অমুসলিম নাগরিক

ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের আশংকা ও অপপ্রচার যে, জামায়াতে ইসলামী যেহেতু একটা মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠন, সুতরাং তাদের কাছে অমুসলিমরা নিরাপদ নয় এবং তাদেরকে তারা যথার্থ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কি অধিকার তথা সুযোগ সুবিধা ইসলামী শরীয়ত দিয়েছে এবং ইসলামের সোনালী যুগে অমুসলিমরা কি অবস্থায় ছিল সে সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা উন্নাসিকতা হয়তবা উক্ত অপপ্রচারের অন্যতম কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে জামায়াত প্রচার ও প্রকাশনা যথেষ্ট না হলেও যা আছে তাই বা কজনে জানে কিংবা জানার চেষ্টা করে?

জামায়াতে ইসলামী এদেশের অমুসলিম নাগরিকদেরকে এদেশের সন্তান হিসেবে দেশের মুসলিম নাগরিকদের সমমর্যাদার নাগরিক মনে করে। জামায়াত এদেশে কুরআন সুন্নাহর শাসন চায়। মানবিক অধিকারের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ মুসলিম ও অমুসলিম কোন পার্থক্য করে না। কুরআনে স্রষ্টা স্বয়ং অমুসলিম নাগরিকদেরকে যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে, তা পরিবর্তন করে কেউ তাদের অধিকার খর্ব করতে চাইলে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার এবং ইসলামী সরকারের অবর্তমানে জামায়াতে ইসলামী কুরআনের মান-মর্যাদার স্বার্থেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। ধর্ম একেবারেই বিশ্বাস ও মনের ব্যাপার। মনের ওপর যেহেতু শক্তি প্রয়োগ করা যায়না। যেহেতু জোর করে মুসলমান বানাবার বিরুদ্ধে কুরআন সোচ্চার। জামায়াত মনে করে যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মের নাগরিকগণ নিজ নিজ ধর্ম পালন করেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কুরআনের বিধানকে সমর্থন করতে পারেন। যদি অন্যান্য মতবাদের সাথে তুলনা করে কুরআনের বিধানকে তারা অধিকতর কল্যানকর মনে করেন। তাহলে নিজ নিজ ধর্মে থেকেও তারা জামায়াতে ইসলামীর সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সা.) পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রে মদীনা নীতিমালা স্মরণ করা যেতে পারে। মদীনার অমুসলমানরা মুসলমানদের মতই সমান মানবিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করতেন। কেউ যদি হিন্দু থেকেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে যুক্তির বিচারে কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করলে হিন্দু হিসেবেও তা সমর্থন করতে

পারেন। তাই জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমর্থন করতে হলে ধর্মীয় দিক থেকে মুসলিম হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও কুরআনকে মেনে চলার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কিন্তু ধর্মান্তরিত না হয়েও কুরআনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানকে মেনে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমগণ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করেছেন বলে ইতিহাসে উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে।

অমুসলিমদের প্রতি সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের আবেদন

এদেশের অমুসলিম নাগরিকগণ স্বাভাবিক- ভাবেই নিজেদের কল্যাণ কামনার সাথে সাথে জন্মভূমিরও কল্যাণ চান। দেশের শান্তি-অশান্তি, মঙ্গল-অমঙ্গলের সাথে সকল নাগরিকের ভাগ্যই জড়িত।

জামায়াত বিশ্ব নবীর (সা.) অনুকরনে কুরআনের বিধানকে এদেশে চালু করতে চায়। যারা অন্য আদর্শের অনুসারি তারা জামায়াতের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচারে লিপ্ত। এসব বিরোধীদের প্রচারনায় পক্ষপাতমূলক ধারণা নিয়ে জামায়াত সম্পর্কে কোন মতামত স্থির করা একেবারেই অযৌক্তিক। এমতাবস্থায়, অমুসলিম নাগরিকদের কাছে আমার আকুল আবেদন যে, আপনারা সরাসরি জামায়াতের সাহিত্য, সংগঠন এর কার্যাবলী, পত্র-পত্রিকা ও সদস্যদের নিকট থেকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহণপূর্বক মতামত স্থির করুন। আশাকরি এটা একটা নৈতিক ও জাতীয় দায়িত্ব মনে করেই আপনারা জামায়াতকে জানার চেষ্টা করবেন।

ইসলামের নাম শুনেই জামায়াতে ইসলামীকে সাম্প্রদায়িক কোন দল মনে করলে মারাত্মক ভুল হবে। ইসলামী শাসন মানে মুসলিম নামধারী অনৈসলামী চরিত্রের লোকদের শাসন নয়। কুরআনে যে বিধান রয়েছে তা বাস্তবে কায়েম করলেই ইসলামী শাসন হবে। ইসলাম ও মুসলিম এক কথা নয়। জামায়াত মুসলিম শাসন চায় না, ইসলামী শাসন চায়। তাই যে কোন মুসলিমকে জামায়াত এর সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে না। চিন্তা, কথা, কর্ম ও চরিত্রে ইসলামের সত্যিকার অনুসারী না হলে জামায়াত কাউকে সদস্য করে না।

আপনি হিন্দু, খ্রিস্টান বা উপজাতি যাই হোন, এদেশের নাগরিক হিসেবে আপনার ও আমার ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। দেশে শান্তি-শৃংখলা থাকলে আমরা সবাই এর সুফল ভোগ করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান দেশ বাসীর মধ্যে যারা ধর্মকে ভালবাসেন এবং মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য ধর্মের

গুরুত্ব অনুভব করেন, তারা রাজনৈতিক ময়দানেও অধার্মিক নেতৃত্ব পছন্দ করবেন না। স্ব-স্ব ধর্মে নিষ্ঠাবান থেকেই জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শরীক হবার জন্য আপনাদের কাছে পুনরায় আকুল আহ্বান জানাচ্ছি।

মাওলানা মওদূদীর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে জামায়াত নেতাদের লাহোরে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর জন্মশত বার্ষিকী (১৯০৩-২০০৩) উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান লাহোরে এক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন আয়োজন করে। ২০০৩ সালের ৬ ও ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে মরহুম মাওলানার দীর্ঘ দিনের সহযোদ্ধা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর ও প্রবীন জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমসহ তিনজন নেতা পাকিস্তান সফর করেন। অপর দু'জন হলেন জামায়াতের তৎকালীণ বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের ও সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর পরিচালক মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম।

৪ ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের বিমানে তিনজন একত্রে ঢাকা থেকে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী এবং মহানগর নেতৃবৃন্দ ঐদিন বাদ এশা সম্মানিত প্রতিনিধি দলকে বিমান বন্দরে উপস্থিত থেকে বিদায় জানান।

মওদূদী একাডেমীর উদ্যোগে একটি সেমিনারে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

৩রা আগস্ট ২০০৩ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন: একটি মূল্যায়ন' শীর্ষক এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর পরিচালক মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিমের পরিচালনায় এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ ও ইসলামিক ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: এর উপদেষ্টা জনাব এম আযীযুল হক। আলোচনায় অংশ নেন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. আবদুন নূর, রাজনৈতিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. হাসান মুহাম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আবু আহমদ. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান ও জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম।

মাওলানা নিজামী তাঁর বক্তব্যে বলেন- ইসলামী রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থার রূপরেখা পেশ এবং তার বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন মরহুম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (র.)। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি পুস্তক রচনা করে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে গেছেন। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চলছে তার পেছনে মরহুম মাওলানা সইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর (র.) বিরাট অবদান রয়েছে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আরো বলেন, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামই রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজের চালিকা শক্তি। মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুর্বলতার মূল কারণ ইসলাম থেকে সরে আসা। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে মরহুম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (র.) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি শুধু ইসলাম সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বর্তমান বিশ্বে যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে তা তাঁরই প্রচেষ্টার ফসল।

২০০৪-২০০৬ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

২৫ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট ২০০৩ পর্যন্ত ঘোষিত তফসিল অনুসারে ২০০৪-২০০৬ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচনের জন্য সারা দেশের রুকনদের ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। জামায়াতের বর্তমান আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২০০৪-২০০৬ কার্যকালের জন্য পুনরায় আমীর নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানানো হয়।

অতঃপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২০০৪-২০০৬ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ শপথ বাক্য পাঠ করান।

নবনির্বাচিত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করে ২০০৪-২০০৬ সেশনের জন্য নিম্নোক্তভাবে দায়িত্ব বন্টন করেন।

নায়েবে আমীর

১। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
২। জনাব মকবুল আহমাদ ও
৩। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ

সেক্রেটারি জেনারেল

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল

১। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
২। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা
৩। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
৪। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক
৫। জনাব মাওলানা আবু তাহের ও
৬। জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ

* মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী- আমীরে জামায়াত

১। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
২। মাওলানা আব্দুস সোবহান এমপি
৩। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, এমপি
৪। জনাব বদরে আলম
৫। জনাব আবু নাসের মুহাম্মাদ আব্দুজ্জাহের
৬। জনাব মীর কাসেম আলী
৭। মাওলানা রফিউদ্দীন আহমদ
৮। অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুর রব
৯। মাওলানা সর্দার আব্দুস সালাম
১০। অধ্যাপক মোঃ তাসনিম আলম
১১। জনাব আবুল আসাদ
১২। অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন
১৩। মাওলানা নজরুল ইসলাম এডভোকেট
১৪। জনাব আতাউর রহমান
১৫। ডাঃ মুহাম্মাদ শফিকুর রহমান
১৬। অধ্যক্ষ শাহ্ মু. রুহুল কুদ্দুস এম.পি
১৭। মাওলানা মীম ওবায়েদুল্লাহ
১৮। মাওলানা মোমিনুল হক চৌধুরী
১৯। ডা. আনিসুর রহমান
২০। অধ্যাপক ফজলুর রহমান
২১। অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহেদ আলী
২২। মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী এম.পি
২৩। জনাব গোলাম রব্বানী
২৪। জনাব সাইফুল আলম খান মিলন
২৫। জনাব আব্দুর রব
২৬। অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এম.পি
২৭। এডভোকেট আঃ লতীফ
২৮। অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ
২৯। জনাব মোমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী
৩০। মাওলানা আ ন ম শামশুল ইসলাম
৩১। এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

* মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী- আমীরে জামায়াত

১। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ
২। জনাব মকবুল আহমাদ
৩। অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ
৪। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
৫। মাষ্টার শফিক উল্লাহ
৬। মাওলানা আব্দুস সোবহান এমপি
৭। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি
৮। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
৯। জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা
১০। জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম
১১। জনাব বদরে আলম
১২। জনাব আবু নাসের মুহাম্মাদ আব্দুজ্জাহের
১৩। জনাব মীর কাসেম আলী
১৪। মাওলানা রফিউদ্দিন আহমদ

আমীরে জামায়াতের ইফতার মাহফিল

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২রা নভেম্বর ২০০৩ বিকেল সাড়ে চারটায় স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশে নিযুক্ত মুসলিম দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন। এ ইফতার মাহফিলে বাংলাদেশে নিযুক্ত প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান, মরক্কো, আরব আমিরাত, কুয়েত, ব্রুনেই, আফগানিস্তান প্রভৃতি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত, হাই কমিশনার, চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্সসহ কূটনীতিকবৃন্দ শরীক হন।

ইফতারীর পূর্ব মুহূর্তে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী মুসলিম উম্মাহর প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বলেন, মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। এই সংকটজনক অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য আজকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কার্যকর ঐক্য গড়ে তোলা। সারা বিশ্বের মুসলমান সকলেই মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।

জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত এ ইফতার মাহফিলে অংশ গ্রহণ করায় তিনি কূটনীতিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষের জন্য বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন।

পেশাজীবীদের নিয়ে ইফতার মাহফিল

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রাক্তন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ওলামা-মাশায়েখ, ব্যবসায়ী ও কৃষিবিদদের সম্মানে ১১ই নভেম্বর ২০০৩ বিকেল সাড়ে ৪টায় হোটেল সোনারগাঁয়ে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন।

এ ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস, কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান, জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার জনাব আখতার হামিদ সিদ্দিকী, স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী ও বিএনপি'র মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ, ভূমি মন্ত্রী জনাব এম শামসুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী জনাব চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, কৃষিমন্ত্রী জনাব এমকে আনোয়ার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন চৌধুরী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী জনাব মির্জা আব্বাস, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালাহ উদ্দীন কাদের চৌধুরী, আইন ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার মুহা: শাহজাহান ওমর বীর উত্তম, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব মীর মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব রিয়াজ রহমান, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মো: রেজাউল করিম, জ্বালানি ও খনিজ

সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব একেএম মোশাররফ হোসেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: লুৎফুজ্জামান বাবর, কৃষি প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহ মোঃ আবুল হোসাইন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জনাব জিয়াউল হক জিয়া, প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য উপদেষ্টা জনাব মো: বরকত উল্লাহ বুলু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব-২ আলহাজ্ব মোসাদ্দেক আলী, কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) মঈনুল হোসেন চৌধুরী, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান চৌধূরী।

চারদলীয় জোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, জাতীয় পার্টি (জেপি) এর চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও সেক্রেটারী জেনারেল শেখ শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মহাসচিব জনাব জমির আলী, সাবেক মন্ত্রী জনাব আনোয়ার জাহিদ, ইসলামী ঐক্যজোটের নায়েবে আমীর জনাব এআরএম আবদুল মতিন, অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, অধ্যাপক আখতার ফারুক, মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী, মুফতি মাওলানা ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান লেঃ জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান, জনাব এসএ খালেক এমপি।

আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন, বিচারপতি আবু সাঈদ আহমদ, ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ, জাসাস এর সেক্রেটারী জনাব বাবুল আহমদ, ইসলামিক ল'ইয়ার্স কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাড. নওয়াব আলী, সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও সাবেক বিচারপতি জনাব টিএইচ খান, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব ওবায়দুল হক সরকার, জনাব সাহাবুদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ বেতারের উপমহাপরিচালক জনাব আপেল মাহমুদ, ইসলামী ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির সদস্য মাওলানা মোফাজ্জল হোসাইন খান, দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক জনাব এএমএম বাহাউদ্দীন, দি ইনডিপেন্ডেন্টের সম্পাদক জনাব মাহাবুবুল আলম, দি নিউজ টুডে এর সম্পাদক জনাব রিয়াজ উদ্দীন আহমদ, দৈনিক অর্থনীতির সম্পাদক জনাব জাহিদুজ্জামান ফারুক, বিএফইউজের সভাপতি জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী, বাসস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আমানুল্লাহ কবীর, রয়টারের ঢাকা ব্যুরো চীফ জনাব আনিস আহমদ, বিএফইউজের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জহিরুল হক, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খোন্দকার

মনিরুল আলম, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন খান, ওকাবের সাবেক সভাপতি মিসেস পারভিন এফ. আহমদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব সাদেক খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আতিকুল আলম, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি জনাব রুহুল আমিন গাজী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর চেয়ারম্যান জনাব শাহ আবদুল হান্নান ও ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মীর কাসেম আলী, সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এজি মাহমুদ, ব্রিগেডিয়ার (অব.) মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডা. এমএ মাজেদ, বিএমএ এর সহ-সভাপতি ডা. এনএ কামরুল আহসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব বেহরুজ ইস্পাহানী, এফবিসিসিআই এর সহ-সভাপতি জনাব আবুল কাসেম হায়দার।

ইফতারীর পূর্ব মুহূর্তে মাহফিলে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

শিল্পমন্ত্রী ও আমীরে জামায়াতের ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়

২০০৩ সালের ২৬ নভেম্বর ছিল ঈদুল ফিতরের দিন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঈদুল ফিতরের দিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং শিল্প ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে এবং বাদ জোহর থেকে আসর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের সাথে ৮নং মিন্টু রোডস্থ তার সরকারি বাসভবনে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. শোয়েব আহমদ, বিসিআইসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) ইমামুজ্জামান, বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব সোলাইমান খান, বিএসইসির চেয়ারম্যান জনাব নূরুন্নবী, বিএসটিআই এর মহাপরিচালক জনাব মাহমুদুর রাজা চৌধুরীসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের পরিচালকবৃন্দ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, উপসচিবসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সাথে তাঁর সরকারি বাসভবনে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এ ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধীদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কাজী এমদাদুল হক, ব্রির মহাপরিচালক জনাব এনআই ভূঁইয়া, মহিলা অধীদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব দুলাল আঃ হাফিজ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউশন অব ম্যানেজমেন্টের ভারপ্রাপ্ত ডিজি জনাব মোঃ নিজামউদ্দীনসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে তার সরকারি বাসভবনে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ সম্মেলনে সম্মানীত আমীরে জামায়াত ও মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ সকালে মগবাজার আল ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন ২০০৩। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি ড. মোঃ লোকমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলাম, বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের জয়েন্ট সেক্রেটারী অধ্যাপক এবিএম খায়রুল ইসলাম, খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আহাদ আলী, বরিশাল বিভাগীয় সমন্বয়কারী প্রফেসর মোসলেম উদ্দীন সিকদার বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক মোঃ আলী আকবর।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন- শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আর শিক্ষক সমাজ হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। দেশ গড়ার উপযোগী সৎ ও যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার জন্য আজকে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো। এই জন্য শুধু সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে জনগণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আরো বলেন, আমাদের দেশে ইংরেজদের রেখে যাওয়া মোল্লা এবং মিস্টার তৈরীর মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করার শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো বিদ্যমান। এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনটি বড় প্রতিবন্ধকতা হল, প্রথমতঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নকল করার প্রবণতা, দ্বিতীয়তঃ নোট বই মুখস্ত করার ব্যাপকতা এবং তৃতীয়তঃ সন্ত্রাস নির্ভর নোংরা ছাত্র রাজনীতি। শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এই সব প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব সব চাইতে বেশী। ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রবান আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষকদের হতে হবে আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাদেরকে বাস্তব জীবনে নীতি-নৈতিকতার অনুসারী হতে হবে। যাতে তারা শিক্ষার্থীদের নিকট অনুকরণীয় হতে পারেন। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তিনি ওহির জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সা.) সর্বযুগের সর্বকালের মানুষের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে রাসূলকে (সা.) পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, শিক্ষকতার পেশায় নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্র, মেধা ও যোগ্যতাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের লক্ষ্য হচ্ছে দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক সুবিচার, আন্ত:সাম্প্রদায়িক সমঝোতা, সাংস্কৃতিক সম্প্রতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হেফাজত। সকল পেশা, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষের অধিকার ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান, গঠনমূলক ও মানবতাবাদী পদক্ষেপের বাস্তবায়ন করা। তাই জামায়াতে ইসলামী চায় একটি দুর্নীতিমুক্ত, জুলুম নিপীড়নশূন্য, দারিদ্র ও ক্ষুদামুক্ত সুখী সমৃদ্ধশালী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। যেখানে থাকবে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারী পাবে পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা।

উক্ত লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জামায়াতে ইসলামী সকল গণতন্ত্রকামী দেশপ্রেমিক শক্তির কল্যাণধর্মী গণমুখী নিয়মতান্ত্রিক কর্ম তৎপরতাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করতে বদ্ধ পরিকর। দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী এবং কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী সকল অপতৎপরতা প্রতিরোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে এদেশের প্রচলিত আইন কানুন বিধি বিধান সংস্কারের মাধ্যমে তা সময়োপযোগী করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এতদউদ্দেশ্যে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে জাতীয় দিবস ও পর্ব সমূহ প্রতিবছর জামায়াত উদযাপন করে থাকে।

তাবলীগ জামায়াতের বিশ্ব ইজতিমা- প্রসংগ কথা

প্রতি বছরের শুরুতে সাধারণত জানুয়ারি মাসে ঢাকা মহানগরীর উত্তর পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে টংগীতে দেশী-বিদেশী লাখ লাখ মুসলমানের উপস্থিতিতে তাবলীগ জামায়াতের বিশ্ব ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর শুভেচ্ছা বানী পাঠিয়ে থাকেন। অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৫০ সালে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দ্বীনি জামায়াতেরও নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৯৯ সালের ৩০ জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমা উপলক্ষে তৎকালীণ সহ প্রচার বিভাগীয় সেক্রেটারী জনাব আবদুল কাদের মোল্লা স্বাক্ষরিত এক বানীতে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক আযম সাহেব বলেন, বিশ্ব ইজতেমার সকল প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায়

আমরা আনন্দিত এবং সারা বিশ্ব থেকে আগত লাখ লাখ মুসল্লীগণের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করায় আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

বিশ্ব ইজতেমায় যাতে মুসল্লীগণ স্বাচ্ছন্দে চলা ফেরা করতে পারে সে জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থাসহ সর্ব প্রকার সহযোগিতার জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান। পরিশেষে তিনি বলেন আমি মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করছি আল্লাহ পাক যেন তাবলীগ জামায়াতের বিশ্ব ইজতেমাকে দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসার এবং সর্বোপরি ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে কায়েমের একটি সফল পদক্ষেপ হিসেবে কবুল করেন, আমীন।

তাবলীগ জামায়াত নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি কেন

জামায়াতে ইসলামী ও তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে পরস্পরকে সঠিকভাবে না জানা এবং ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণার অভাবই এসব ভুল ধারনার মূল কারণ।

জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা কর্মসূচির ১ম দফাই হলো দাওয়াত ও তাবলীগ। দীর্ঘ সময় ধরে যিনি জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব পালন করে গেছেন সেই অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তান আমলের শুরুতে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর তাবলীগ জামায়াতে নেতৃত্ব দিয়ে প্রধান মুবাল্লীগ হিসেবে দায়িত্ব বর্তানোর প্রাক্কালে পূর্ণাঙ্গ ইকামতে দ্বীনের জামায়াত হিসেবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। তাবলীগ জামায়াতের মুরুব্বী মাওলানা জিয়াউদ্দীন আলীগড়ী, মাওলানা আবদুল আযিয, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মুকিত প্রমুখ জীবিতাবস্থায় অধ্যাপক সাহেবের যথার্থ মূল্যায়ন করতেন এবং তিনিও তাদেরকে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করতেন।

বর্তমান তাবলীগ জামায়াত দ্বারা যতবড় দ্বীনি খিদমত হোক, এ জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মসূচিতে ইকামতে দ্বীনের পরিকল্পনা নেই। দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার যে কঠিন ও সংগ্রামপূর্ণ আন্দোলন আল্লাহর রাসূল (সা.) মদীনায় পরিচালনা করেছিলেন সে প্রোগ্রাম যদি তাবলীগ জামায়াত গ্রহণ করতো তা হলে বাতিলের সাথে সংঘর্ষ ব্যতীত সব দেশে কাজ করার সুযোগ পেতো না। তবে তাবলীগ জামায়াত দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নামাযী বানাবার ও মাস্‌লা-মাসায়েল শিখাবার চেষ্টা করছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। জামায়াতে ইসলামী পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম কায়েম করতে চায় আর তাবলীগ জামায়াত ব্যক্তিগত জীবনে আংশিক ইসলাম কায়েমের দাওয়াত দেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় জীবনে রক্তাক্ত স্মৃতিময় স্মরনীয় দিন। ১৯৫২ সালের পরে থেকে এ দিনটি শহীদ দিবস ও শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে জাতীয়ভাবে। বাঙালী ও বাংলাদেশের ইতিহাসের এই অবিস্মরনীয় দিনে আমরা ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও তাদের পারলৌকিক মাগফেরাত কামনা করি। সেই সাথে শ্রদ্ধা জানাই দলমত নির্বিশেষে সব ভাষা সৈনিককে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। শহীদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার প্রমুখের বুকের তাজা খুনে সেদিন ঢাকার রাজপথ তথা মায়ের ভাষা বাংলার বর্ণমালা রক্তলাল হয়ে ওঠেছিল। আমাদের মাতৃভাষা আন্দোলন শুধুই পঞ্জিকার একটি দিন, মাস, বা বছরের মধ্যে সীমিত নয়, দীর্ঘ পটভূমির বুকে বিশেষত: ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে এ আন্দোলনের সূচনা এবং ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ প্রথম বিকাসপূর্ণ চূড়ান্ত পর্যায়ে বায়ান্নোর একুশে মহা ইতিহাস সৃষ্টি করে। বায়ান্নোর ঘটনা অন্যান্য জাতিকে কমবেশী উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারেই ভারতের আসামে এই বাংলাভাষা যথাযথ স্বীকৃতির দাবীতে ১৯৬১ সালে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন কয়েকজন বাঙালী, তারাও আমাদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও স্মরণের দাবীদার।

জামায়াতে ইসলামী প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। ১৯৮০ সাল থেকে জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শহীদ দিবসে প্রখ্যাত ভাষা সৈনিক অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, অধ্যাপক নূরালম ভূঁইয়া, এডভোকেট কাজী গোলাম মাহবুব, অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাহাবুদ্দিন আহমদ প্রমুখ পর্যায়ক্রমে আলোচনায় শরীক হতেন।

স্বাধীনতা দিবস- ২৬ মার্চ

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উদ্যোগে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এ ঐতিহাসিক জাতীয় দিবস উপলক্ষে আমীরে জামায়াত যে বিবৃতি দিয়ে থাকেন তার একটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো। ২০০২ সালের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২৪ মার্চ তারিখে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন-

২৬ শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনে এদিনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার কারণেই বিগত ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে জাতি ফ্যাসিবাদী অপশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ নির্বাচনে জয়লাভ করে চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার কারণে বাধা বন্ধনমুক্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশে জাতি স্বাধীনতা দিবস পালন করছে। এ জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া জানাচ্ছি।

এ দেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই ইতিহাসের গতিধারায় স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী আদর্শই এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের রক্ষা কবজ। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে আধিপত্যবাদী শক্তি ও তাদের এদেশীয় এজেন্টদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ সম্পর্কে দেশ বাসীকে সতর্ক থাকতে হবে। নতুবা হায়দরাবাদ ও সিকিম বাসীদের ভাগ্যবরণ করতে হবে।

আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমিকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের জনশক্তি ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে একযোগে কাজ করতে হবে।

দুর্নীতি, দারিদ্র ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গঠন এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং দেশবাসীর লালিত চেতনা সংরক্ষণপূর্বক ভারতের আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র ও ছোবল থেকে দেশকে রক্ষার দৃঢ় শপথ নিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জামায়াত

বাংলা নববর্ষ মুসলমানদের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ও গৌরবের দিন পয়লা বৈশাখ মোতাবেক ১৪ এপ্রিল। বাংলা সন হিজরী সনের সাথে মিলিয়ে গণনা করা মুসলিম ঐতিহ্য। বলা বাহুল্য হিজরী সন (৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চালুকৃত) চন্দ্র মাসের হিসেবে চলে। মুঘল সম্রাট আকবরের সময় ১৫৭৬ সালে বাংলা বিজয়ের পরে হিজরী ৯৬২-৬৩ সনে খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য সৌর মাসের হিসেবে সন গণনা করা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের সময় পন্ডিত ফতেহ উল্লাহ সিরাজী

কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও পাকিস্তান আমলে ১৯৬৬ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংস্কারকৃত সনই অধুনা বাংলা সন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর প্রতি বছর ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাঙালী জাতির এ ঐতিহাসিক দিনটির যথাযথভাবে উদযাপনের গুরুত্বারোপ পূর্বক সাধারণত দু'একদিন পূর্বেই প্রেসবিজ্ঞপ্তি আকারে একটি শুভেচ্ছাবাণী দিয়ে থাকেন। ১৩ এপ্রিল ১৯৯৯ জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগীয় সেক্রেটারী জনাব আবদুল কাদের মোল্লা স্বাক্ষরিত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বলেন, সকল জাতিই নববর্ষের দিনটি আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে উদযাপন করে থাকে। বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখও আমাদের একটি আনন্দের দিন। এ দিনটি মুসলিম ঐতিহ্য মোতাবেক শালিন ভাবেই উদযাপন করা উচিত। কিন্তু ইংরেজদের দীর্ঘ গোলামীর যুগ থেকে ইসলামী তাহজীব লালনের অভাবে আমরা এ দিবসটি পালনে কাংখিত মান তথা শালিনতা রক্ষা করতে পারি না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন যাতে ভবিষ্যতে বিজাতীয় তথা অমুসলিম পদ্ধতি থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আমি দেশবাসী সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই এবং সকলের শুভ কামনা করি। নববর্ষ সকলের জন্য কল্যাণকর হোক।

জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস প্রসংগ

সাতই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। একই সাথে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ প্রশ্নে এদিনের তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে অনেক শিক্ষনীয় দিক। ১৯৭৫ সালের এ দিনে দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতার পক্ষ থেকে যে চেতনার উন্মেষ ঘটানো হয়েছিল, তার পেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। চার মূলনীতির একটি ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা আরেকটি ছিল সমাজতন্ত্র। সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সংযোজিত হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সমাজতন্ত্রের স্থলে সামাজিক ন্যায় বিচার সংযোজিত হয়েছে।

এ পটভূমিতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের জায়গায় উপজাতিসহ দেশের সর্বস্তরের জনমানবকে সম্পৃক্ত করার মতো একটি দর্শন হিসেবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উল্লেখ ঘটেছে। শুধু তাই নয়, এক দলীয় বাকশালী শাসন

ব্যবস্থা পরিবর্তন পূর্বক প্রবর্তিত হয়েছে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যে পথ ধরে পরবর্তী পর্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে। তার ও শুভসূচনা হয়েছে এ ঐতিহাসিক দিবসের সিপাহী জনতার চেতনাকে কেন্দ্র করে। এ দিবসটি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি যুগান্তকারি টার্নিং পয়েন্ট। দেশের সর্বস্তরের গণমানুষের হৃদয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে যে চিন্তা-চেতনা লালিত হয়ে আসছিল, মাঝখানে তা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী সত্যকে স্থায়ীভাবে চাপা দেয়া যায় না। আওয়ামী অপশাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে দারুণ ক্ষোভ ছিল, কিন্তু প্রকাশের সুযোগ ছিল না। প্রথমত: ধর্ম ভিত্তিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি আওয়ামীলীগ ও নিষিদ্ধ হয় বাকশালের যাঁতাকলে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের যখন দরজা খুললেন, সে সুবাদেই আওয়ামীলী পুন: আত্মপ্রকাশের এবং দেশের ক্ষমতাশীল হবার সুযোগ পান।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সিপাহী জনতার আবেগ অনুভূতি চিন্তা-চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক পরবর্তী পর্যায়ে শুধু সরকারী প্রজ্ঞাপনে নয় গণভোটের মাধ্যমে সংবিধানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনেন। ধর্মীয় তথা ইসলামী রাজনীতির ওপর সংবিধানের সে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটাও তিনি পরিবর্তন করেন। অতএব ৭নভেম্বর বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তা পুনঃজীবনের দিবস। জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের একটি অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে এ দিনে। এ দিনে সিপাহী জনতা যে চিন্তা চেতনায় উল্লেখ ঘটিয়েছিল মূলত: এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের রক্ষা কবজ। তাই এদেশের স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করতে হলে এ চেতনাকে লালন করতে হবে। তার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূলবোধকে লালন করতে হবে। দেশকে আর্থ-সামাজিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দেশের উন্নয়ন ও উৎপাদনের কার্যক্রমকে যারা বাধাগ্রস্ত করতে চায় দেশের শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশের বাজারে রফতানি করতে যারা কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় দেশের অর্থনীতিকে পংগু করে দেশকে যারা আধিপত্যবাদী শক্তির করদ রাজ্যে পরিণত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জাতি ধর্ম বর্ণ দলমত নির্বিশেষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীসহ দেশকে যারা স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধশালী দেখতে চান, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের যারা নিরাপদ দেখতে চান, তারা ১৯৭৫ থেকে ৭ নভেম্বরকে জাতীয় সংহতিও বিপ্লব দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উদ্যোগে বুদ্ধিজীবী সমাবেশ ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীর জামায়াতের উদ্যোগে ৪২৩ বড় মগবাজারস্থ আল ফালাহ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরীর তৎকালীন আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ, মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দানের প্রাণ পুরুষ অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, বিশিষ্ট সাংবাদিক আলহাজ্ব শামসুল হুদা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যাপক ড. শ্রী কালিপদ সেন ও ঢাকা মহানগীর জামায়াতের নায়েবে আমীর আবদুল কাদের মোল্লা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি জননেতা আব্বাস আলী খান তাঁর দীর্ঘ লিখিত ভাষণে আজকের বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৭১ সালে অভ্যূদয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরে শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি বর্ষিয়ান জননেতা আল বদর, আল শামস তথা জামায়াত নেতাদের জড়িয়ে অপপ্রচার সম্পর্কে বলেন, ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি শহীদ জহির রায়হানের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড এর ফলশ্রুতিতে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীর পরিচয় চাপা পড়ে গেছে। তিনি রাজনৈতিক ঈর্ষা বিদ্বেষমুক্ত হয়ে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য আজকের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযমের আদেশে কিংবা ইন্ধনে কোন বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়েছে একথা যদি কেউ পবিত্র কুরআন হাতে নিয়েও বলে আমি তা বিশ্বাস করি না, কারণ আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং ভালভাবে জানি। তিনি একজন অতি উঁচু পর্যায়ের মানবতাবাদী। ভাষা আন্দোলনের উদ্যোগী সংগঠন তমদ্দুন মজলিশে তাঁর সাথে আমার একত্রে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অনর্থক অভিযোগ আনা হচ্ছে।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলমন্ত্র গণতন্ত্র যা ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিই খলিফা হতেন। ইসলামের চার খলিফার নামোল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে বড়

গণতন্ত্রী ও মানবতাবাদী। ইসলাম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার শিক্ষা দেয় না। ইসলাম মানুষকে সততা, মানবতা ও ঐক্য শিক্ষা দেয়।

অধ্যক্ষ আবুল কাসেম বলেন, প্রতিহিংসার শেষ নেই। হিংসা বিদ্বেষ প্রচার করে আমাদের দেশের কোন উন্নতি হবে না। আমাদেরকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ্য পরিহার করতে হবে। দেশ থেকে স্বৈরাচারের অপছায়া দূর করতে হলে সম্মিলিতভাবে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আলহাজ্ব জনাব শামসুল হুদা বলেন, জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামের কোন সংঘাত নেই। জামায়াতে ইসলামীকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে আওয়ামী লীগ ভুল করেছে। জামায়াত আওয়ামী লীগের শত্রু নয়। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে তারা আওয়ামী লীগের শত্রু।

তিনি অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে বলেন, মহান ভাষা আন্দোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল (ছাত্র জীবনে এবং অধ্যাপনা জীবনেও)। তিনি এজন্য একাধিকবার জেল খেটেছেনে। আমরা তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছি। অনেক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসই ঢাকা পড়ে আছে, সত্য একদিন উদঘটিত হবেই। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে আদর্শের জন্য কাজ করছে। আন্দোলন হিসেবে ব্যাপক জনসমর্থন ও সফলতা লাভ করেছে। আজকে জামায়াত বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করছে এবং বাংলাদেশকে তারা মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে।

অধ্যাপক ড. কালিপদ সেন বলেন, যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তারা দেশ থেকে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধকে উৎখাত করতে চায়। এটা হলে দেশে মার্কসবাদ, লেলিনবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর অনেক মসজিদকে নাইটক্লাবে পরিণত করা হয়েছে। ড. সেন শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক স্বৈরশাসনকে অপসারণ করার লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি অপনোদনের আহ্বান

জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯১ শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসের আলোচনা সভার প্রদত্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভ্রান্তিকর রিপোর্টকে কেন্দ্র করে কোন কোন মহল থেকে অপপ্রচার চালানোর

প্রেক্ষিতে দলের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ থেকে ২৩/১২/৯১ তারিখে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর আজকের কাগজে জামায়াত নয়, আওয়ামী লীগই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। শিরোনামে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি আসলে কোন আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ছিল না। ১৪ ডিসেম্বর '৯১ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনা সভায় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্য যখন মাঝ পর্যায়ে ঠিক তখন আজকের কাগজের রিপোর্টার আলোচনা সভায় হাজির হন। বক্তৃতার প্রথম দিক তিনি কি বলেছেন উক্ত রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাবে জামায়াত নয় আওয়ামী লীগই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। এ ধরণের কোন কথা তার বক্তব্যে ছিল না। তিনি জাতির সামনে প্রশ্ন রেখেছেন গত বিশ বছরে (১৯৭২-৯১) বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত কেন হলা না? কেন বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে বিচার করা হলো না? স্বাধীনতাউত্তর সাড়ে তিন বছরে আওয়ামী লীগ দুর্দান্ত প্রতাপে দেশ শাসন করেছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত ও বিচারের দায়িত্ব তখন তাদের ছিল। কিন্তু তারা কেন এবং কার স্বার্থে তদন্ত ও বিচার করেনি? যদি রাজাকার আল বদরগণ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে থাকতো তাহলে আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বিচার করল না কেন? এমনকি তদন্ত রিপোর্ট পর্যন্ত প্রকাশ করা হল না কেন? মাওলানা নিজামীর বক্তব্য দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাব, মিল্লাত, দৈনিক বাংলা, বাংলার বাণী ইত্যাদি পত্রিকায় সঠিকভাবে ছাপা হয়েছে। একটি মাত্র পত্রিকায় প্রকাশ্যে বিভ্রান্তিকর রিপোর্টকে কেন্দ্র করে অহেতুক কাদা ছোড়া ছুড়ী করাটা আদৌ সমীচীন মনে করি না।

উল্লেখ যে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৩৭ হাজার লোক দালাল আইনে জেলে বন্দী ছিল। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুট পাটের অভিযোগে অভিযুক্ত কোন লোককেই সরকার সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি দেয়নি। আর জামায়াতের কোন লোকের বিরুদ্ধে উল্লেখিত অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলে তাদের আওয়ামী সরকার কিছুতেই ছাড়তেন না। কাজেই অপপ্রচারের বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ঐতিহাসিক বিজয় দিবসে জামায়াত

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসব্যাপী ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) বাংলাদেশ হিসেবে জন্মলাভ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী

পাকিস্তানের মূল ভূ-খণ্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ ও সাহায্য বঞ্চিত হয়ে ভারতীয় বাহিনীর নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ভারতীয় বাহিনীর পূবাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসি লে. জেনারেল অরোরার কাছে পাক বাহিনীর পূর্বাংশের জিওসি লেঃ জেনারেল এ.এ.কে নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। উল্লেখ্য, কর্ণেল (পরে জেনারেল) এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধারা নয় মাস যাবত পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ এবং শেষের দিকে ভারতীয় বাহিনীর সাথে মিলে সম্মুখ যুদ্ধ চালিয়ে দুর্দর্ষ পাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করলেও ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানিকে মতলববাজ ভারত সরকার উপস্থিত থাকতে দেয়নি।

যুদ্ধে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব দানের ব্যাপারে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে অতীতে বিশেষত: ১৯৬৫ সালে ঘোর শত্রু হিসেবে পরিচিত ভারত ১৯৭১ সালে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে পরিগনিত হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে উল্লেখ্য বিজয়লাভের পর ভারতীয় বাহিনী তৎক্ষনিকভাবেই পাক বাহিনী থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান যুদ্ধাস্ত্র ছাড়াও হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠন করে ভারতে নিয়ে যায়।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৭৯ সালে এদেশে প্রকাশ্যে তার তৎপরতা চালানোর সুযোগ লাভ অবধি মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পালন করছে। জামায়ত প্রভাবিত পত্র-পত্রিকায় এ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা মহানগর সহ সারা দেশের দলীয় অফিস ও সহযোগী সংস্থার অফিস সমূহেও বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করে থাকে। এমনি এক আলোচনা সভায় জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক কৃষি মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো:

আজ থেকে ৩২ বছর আগে স্বাধীনতা যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। জাতীয় জীবনে এ ধরনের বিজয় শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে পালন যথেষ্ট নয়। এই ৩২ বছরে আমাদের প্রত্যাশার ও প্রাপ্তির একটি খতিয়ান, একটি মূল্যায়ন অপরিহার্য; যাতে করে বহু ত্যাগ ও কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা সম্ভব হয়। এ স্বাধীনতা অর্জন নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। তেমনি স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও অর্থবহ করা আরো কঠিন কাজ। চিন্তার স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা ও সর্বপরি গনতন্ত্রে আমরা যদি বিশ্বাস করি তাহলে রাজনৈতিক ইস্যুতে ভিন্নমতের অবকাশ

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু একটি রাজনৈতিক ইস্যু চূড়ান্ত পরিনতি লাভের পর জাতিগঠন এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করতে হলে যারা সরকারি দায়িত্বে থাকে, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে থাকে তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্র নায়কোচিতভাবে জাতীয় ঐক্যকে সুসংহত করতে বিভক্তির পথ রুদ্ধ করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিনতি ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হওয়ার পর যারা সরকার গঠন পূর্বক নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তারা এই কাজটি করেছেন কিনা ইতিহাস সাক্ষী।

বিজয় দিবসকে সামনে রেখে আমাদেরকে দৃঢ় শপথ নিতে হবে। যে ঐক্যের মাধ্যমে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর নির্বাচনে আমরা জয়ী হয়েছিলাম সেই ঐক্যের মাধ্যমে দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। তাই আমাদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।[১৪] "দেশে যখন ৩৩তম বিজয় দিবস উদযাপনের আয়োজন চলছে তখন কলকাতায় সে দেশের ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠনের একটি বিক্ষোভ সমাবেশের খবর প্রচারিত হয়েছে। তাদের বক্তৃতার ভাষা আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, উদ্বেগজনক।"

মহরম (আশুরা) উদযাপন

হিজরী তথা আরবী মাসের ১২টি মাসের মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে ঐতিহাসিক বেদনাদায়ক স্মৃতি বিজড়িত মহরম মাস। কারবালার বিয়োগাত্মক শোকাবহ ঘটনা ছাড়াও মানবসৃষ্টি তথা ইসলামের ইতিহাসে এ মাসটি খুবই ঐতিহ্যমন্ডিত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) ৬২২ খৃস্টাব্দে মহানবী (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে চিরস্মরণীয় রাখার জন্য ১৭ বছর পর হিজরী সনের প্রবর্তন করেন।

মহরম মাসের দশম তারিখে মহানবী (সা.) এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে এক অসম ও অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে ইয়াজিদ বাহিনীর সাথে সপরিবারে ও মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন। অন্যায়, অসত্য ও স্বৈরাচারের কাছে মাথা নত না করে রাজতন্ত্র নয় বরং খিলাফতই যে মোমেনের কাম্য তা জীবন দিয়েও শের-ই-খোদা হযরত আলী ও নবী নন্দিনী ফাতেমার কলিজার টুকরা প্রমান দিয়ে গেলেন। মহরমের শিক্ষা ইকামতে দ্বীনের

---

[১৪] আমীরে জামায়াত কর্তৃক ২০০৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেমিনার ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রদত্ত একাধিক বক্তৃতা থেকে।

জন্য জানমাল দিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ। চরম ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেই ইসলামের পথে অবিচল থাকতে হবে। গোটা মহরম মাসব্যাপী জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্র থেকে অধঃস্তন পর্যন্ত সর্বত্র এটা যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বসহকারে পালন করা হয়ে থাকে।

মে দিবস উদযাপন

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং জামায়াতে ইসলামীর অংগ সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ জামায়াতের সহযোগী বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগ মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে 'ইসলামে শ্রমের মর্যাদা, মজুরদের অধিকার ও কর্তব্য' এরকম নানা বিষয়ে প্রতিবছর পহেলা মে আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় তুলে ধরা হয় ইসলামে শ্রমিকের যে অধিকার দেয়া হয়েছে তার মত কোন শ্রমনীতি আজ পর্যন্ত কোন আদর্শ পেশ করতে পারেনি। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম শ্রমিকের অধিকারের কথা বলে শ্রমজীবী মানুষকে রাষ্ট্রীয় বন্দীশালায় আবদ্ধ করে। ঐতিহাসিক মে দিবসের অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে।

বালাকোট দিবস উদযাপন

৬ মে শহীদ সাইয়েদ আহম্মদ বেরলভী ও ইসমাইল শহীদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বালাকোটের শহীদদের স্মরণে প্রতি বছর জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির বালাকোট দিবস পালন করে থাকে। এ দিবসের আলোচনায় শহীদদের মর্যাদা এবং যুগে যুগে এ উপমহাদেশে যেসব ইসলামী আন্দোলন হয়েছে এবং সে আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছে তাদের স্মরণ করা হয়।

১লা এপ্রিল ঐতিহাসিক গ্রানাডা ট্রাজেডি দিবস এ শিক্ষা

মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি বেদনাবিধুর শোকস্মৃতির দিন। ১৪৯২ ঈসায়ী সালে সাতশত বছরের মুসলিম শাসনের গৌরবোজ্জ্বল জনপদ স্পেন সেখানে খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী রাজা ফার্ডিনান্ডের নির্দেশে অসংখ্য মুসলিম নরনারীকে পুড়িয়ে ও সমুদ্রে ডুবিয়ে মারে। এ দিন এপ্রিল বোকা না হয়ে বুদ্ধিমান হবার শিক্ষা নিতে হবে। এপ্রিল ফুল বানাবার যে জঘন্য ষড়যন্ত্র ছিল আজ তা নব প্রজন্মকে জানতে হবে এবং জানাতে হবে।

আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও আশু তদন্ত দাবি

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকায় শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের জনসভায় ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা নেত্রী আই.ভি রহমান সহ ২৩ জন নিহত এবং অনেক নেতা কর্মী আহত হন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ এই শোকাহ ঘটনার তাৎক্ষনিকভাবে শোক প্রকাশ ও দূর্ঘটনার আশু তদন্ত দাবি করেন।

শেখ হাসিনা যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন এর আশে পাশে প্রায় ডজন খানেক গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ট্রাকের মধ্যে একটা ও পড়েনি। পড়লে হয়ত শেখ হাসিনার জীবনও বিপন্ন হতো। তাই ঘটনাটি বড়ই গুরুতর, আবেগময়, উত্তেজনাপূর্ণ ও খানিকটা রহস্যজনক।

শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলেও (১৯৯৬-২০০১) বহু সমাবেশে অনুরূপ হামলায় বহু লোক নিহত ও আহত হয়েছে। তিনি সে সবের কোনটিরই রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করেন নি। কিন্তু প্রতিটি ঘটনার সাথে সাথে তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য সহযোদ্ধারা এর জন্য মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক মহলকে দায়ী করেছেন। প্রকৃত পক্ষে কারা ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করে বিচার করার উদ্দেশ্যে কোন তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন মনে করেন নি। কেন করেননি তা' আজো রহস্যই রয়ে গেলো।

২১ আগস্টের ঘটনার পর পরই তৎকালীণ ৪ দলীয় জোট সরকার প্রধান সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। শেখ হাসিনা ঘটনার সাথে সাথেই সরাসরি প্রধান মন্ত্রীকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। পরে জামায়াত শিবিরকেও দায়ী করেন। তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে প্রত্যাখ্যান পূর্বক আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেন। তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য ইন্টারপোল ও আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা এফ. বি. আই বাংলাদেশে আসে। শেখ হাসিনার সাথে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সাক্ষাত করতে চাইলে তাচ্ছিল্যের সাথে উপেক্ষা করা হয়।

শেখ হাসিনা ও তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দ তদন্তকারী দলকে সাক্ষাৎকার দিতেও অস্বীকার করেন। এমনকি শেখ হাসিনার ব্যবহৃত গাড়ীটা দেখাতে ঘোর আপত্তি ও গড়িমসি করেন। তারা জাতিসংঘ বা কমনওয়েলথ এর পক্ষ থেকে তদন্ত চান। তাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, এ জাতীয় কাজ ঐ দু'সংস্থার করণীয়

নয়। আসলে তারা মনে প্রাণে তদন্ত চান না। কারণ, তদন্ত ছাড়াই তারা তো নিশ্চিত করেই জানেন যে, এটা কারা করেছে। শেখ হাসিনার আমলে এ জাতীয় সকল ঘটনাই তিনি বিনা তদন্তে ঘোষনা করে দিতেন যে, মৌলবাদীরাই এটা করেছে।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও শিল্প মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ জামায়াত এম.পিগণ পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে সর্বদাই সন্ত্রাসের মূল রহস্য উদঘাটনের কথা বলতেন। নিম্নে ২০০২ সালের ২৭ জুন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও তৎকালীণ কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হল-

“মাননীয় স্পীকার তারা তালেবানের প্রসংগ তোলেন। আমি এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলতে চাই, তারা ক্ষমতায় থাকতে ৭৬ কেজি ওজনের বোমা নাটকের রহস্য উদঘাটন করে যাননি, উদীচী অনুষ্ঠানে বোমা হামলার কেন্দ্র করে ও তালেবান, হরকাতুল জেহাদ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে কারা এজন্য দায়ী তা তারা প্রমান করে যাননি। এমনিভাবে রমনা বটমূলের ঘটনা নারায়নগঞ্জের বোমা হামলার ঘটনার কোনো একটিও তারা প্রমাণ করে যাননি। ক্ষমতায় থাকতে যারা তালেবান, হরকাতুল জেহাদের অস্তিত্ব প্রমান করতে পারেনি নির্বাচনে পরাজয় বরণ করার পর তাদের কোন রাজনৈতিক প্রভূকে আফগানিস্তানে যেভাবে যুদ্ধ করে তালেবান সরকার উৎখাতপূর্বক কারজাইয়ের পুতুল সরকারকে বসানো হয়েছে, সম্ভবতঃ অনুরূপ আশায় বুক বেঁধে তারা তালেবানের ধূয়াঁ তুলে বিশ্বব্যাপী প্রচারনার আশ্রয় নিয়েছেন।”

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মাওলানা নিজামীর ভাষণ

৩০ মার্চ ২০০৪ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালিন, ওয়াআলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাইন। ওয়া আ'লাল্লাজিনাত্তাবা-উহুম বি-ইহসানিনি ইলা ইয়াওমিদ্দীন।

জনসভার জনাব সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সংগ্রামী দেশবাসী ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রিয় ভাইয়েরা

২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীতে এটিই প্রথম জনসভা। আপনাদের গঠন করা জোট সরকার গত আড়াই বছরে কী অর্জন করেছে সেটা জানার যেমন আপনাদের অধিকার আছে, তেমনি আমাদেরও জানানোর দায়িত্ব আছে।

আজকের এই সুযোগে জোট সরকারের আড়াই বছরের অর্জনগুলোর বিশেষ বিশেষ দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। তার আগে একটি বিষয় আপনাদের বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করব। জোট সরকার ২০০১ সালের নির্বাচনের পর অক্টোবরের ১০ তারিখে মন্ত্রী পরিষদের শপথের মাধ্যমে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে দুটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে। একটি প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয় আওয়ামী লীগের ৫ বছরের দুঃশাসনের মাধ্যমে। পাঁচ বছর ধরে আওয়ামী লীগ দুঃশাসন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও প্রশাসনকে দলীয়করণ করে দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। তারা দেশের ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর আঘাত হেনে দেশকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তা আপনারা জানেন। এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে জোট গঠিত হয়েছিল এবং ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে জনগণ তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। তাদের সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জোটকে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় আরেকটি প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলার মাধ্যমে। এটাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক

পরিস্থিতির উপর একটি বিরুপ প্রভাব পড়েছিল। বিশ্ব বাজারে অর্থনৈতিক মন্দাভাব সৃষ্টি হয়েছিল। যার কারণে তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর প্রতি দাতা গোষ্ঠির দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি পরিবর্তন এসেছিল।

প্রিয় ভাইয়েরা

এই পরিস্থিতির দাবি ছিল দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে দেশকে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আপনারা জেনে খুশী হবেন এই আড়াই বছরে জোট সরকার বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে এবং পর পর দুটি বাজেটে অভ্যন্তরীন সম্পদ জোগানের পরিমাণ অতীতের যে কোন রেকর্ডকে ভঙ্গ করেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা

এই জোট সরকারের আড়াই বছরের অবদানের কথা যদি উল্লেখ করতে হয়, প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, মানব সম্পদের উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন এবং সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার পেছনে জোট সরকার একটি অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

এই দেশকে যদি স্বনির্ভর করতে হয় এবং সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে মানব সম্পদের উন্নয়নের বিকল্প নেই। আর মানব সম্পদের উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি পাঠাবার জন্যে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নত করা হয়েছে। এজন্যে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

সবার জন্যে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সব গরীব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া করে তাদের এক সন্তানের জন্যে মাসে একশত টাকা, একাধিক সন্তনের জন্যে ১২৫ টাকা সর্বসাকুল্যে বছরে ছয়শত কোটি টাকার দায়িত্ব সরকার নিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্যে এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

এমনিভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সুশিক্ষার ক্ষেত্রে নকল একটি অত্যন্ত ন্যক্কারজনক ব্যাধি। নকলমুক্ত পরীক্ষা, নকলমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জোট সরকার অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা

এ সরকার জনকল্যাণমূলক কাজ এবং দারিদ্র বিমোচনমূলক কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যুব মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিকের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যুবকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে দেশের মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের উন্নত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা আওয়ামী আমলে ১০০ টাকা করে ১৫ হাজার মানুষ পেত। জোট সরকার প্রথম বছরে বয়স্ক ভাতা ১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে দেড়শত টাকায় পরিণত করেছে। জোট সরকার ১ম বছর বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষে উন্নীত করেছে। দ্বিতীয় বছর বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ৫ লক্ষ লোক থেকে বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। তাদের কোটায় ছিল ১৫ হাজার সেটা হয়েছে ১০ লক্ষ। এটা কি অগ্রগতি নয়?

প্রিয় ভাইয়েরা

বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ চাকরি জীবন শেষে ছাত্র/ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিয়ে এক জোড়া স্যান্ডেল, একটি ছাতা আর পাজামা-পাঞ্জাবী নিয়ে বাড়ী ফিরে যেত। এর বাইরে তাদের আর কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। জোট সরকার বেসরকারি শিক্ষদের ভাতা ও পেনশন প্রদান ব্যবস্থার জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা

কৃষি আমাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। আওয়ামী আমলে এ ক্ষেত্রে সর্বসাকুল্যে ১০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছিল। জোট সরকার দ্বিতীয় বছরে তা বাড়িয়ে ৩০০ কোটি টাকায় পরিণত করেছে। জোট সরকার এ আড়াই বছরে একটি মহলের প্রচারণা এবং ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সারসহ কৃষির সকল উপকরণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা

আপনারা আজকের পত্রিকায় দেখেছেন ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ এ সরকার মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হলে সরকারের কৃষিখাতে ভর্তুকি যাবে ৪৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। তাতে উপকৃত হবে প্রায় ১৫ লক্ষ কৃষক পরিবার। এ সরকার উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে জাতি গঠনে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে আপনারা দেখছেন কোটি কোটি টাকার ঋণ খেলাপীদের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে

অর্থ জমা আদায়ের আইনী পদক্ষেপ নিয়েছে। তার সাথে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মাঝারি ঋণের কৃষকরা যাতে হয়রানির শিকার না হয় সে জন্য ৫ লাখ টাকা ঋণের পরিমাণ যাদের তাদেরকে যাতে অর্থ ঋণ আদালতে মামলার হয়রানির শিক্ষা হতে না হয় তাই এ আইন অতি সম্প্রতি সংশোধন করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ১৫ লক্ষ মধ্যবিত্ত, মাঝারি আয়ের কৃষকরা যারা কৃষি ঋণ নিয়েছেন তাদেরকে এ অর্থঋণ আদালতের হয়রানি থেকে রেহাই দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা

আওয়ামী লীগ একাডেমিক ক্যারিয়ার বিচার না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিল। যেখানে জনসেবা, স্বাস্থ্যসেবা জড়িত সেখানে অন্যেক শূন্য পদ ছিল কিন্তু সেখানে নিয়োগ দিয়ে যায়নি। ফলে আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন উপজেলায় ডাক্তার স্বল্পতা ছিল। এ সরকার দায়িত্ব নেয়ার সাথে সাথে জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংকট উত্তরণের ব্যবস্থা করেছে।

শিল্পখাতের ব্যাপারে বলা হয় আমরা নাকি শিল্প বন্ধ করছি। চট্টগ্রামের স্টীল মিল আওয়ামী লীগের আমলে বন্ধ হয়েছে। তারা বিকল্প কিছু করেনি। জোট সরকার সেই স্টীল মিলের জায়গায় শিল্প পার্ক তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। অতি শীঘ্র সেখানে শতাধিক শিল্প ইউনিট কায়েম হতে যাচ্ছে।

আদমজী জুট মিল বন্ধ হয়েছে; কারণ ৭২ সালে আওয়ামী লীগ পাইকারীভাবে জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল, শিল্প খাতকে ধ্বংস করেছিল। সে কারণেই আজকে শিল্পের এই দুর্দশা। এ লোকসানী শিল্প টানার পরিবর্তে পাওনাদারদের পাওনা দিয়ে মিলটি বন্ধ করে সেখানে শিল্পপার্ক গড়ে তোলার বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেখানে ২৬ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান ছিল সেখানে জোট সরকারের এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা

সার্বিকভাবে জোট সরকার জনকল্যাণ, দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও উৎপাদনে যে অনন্য ভূমিকা পালন করছে, তাতে আওয়ামী লীগ বুঝে নিয়েছে এটা যদি অব্যাহত থাকে, জোট সরকারের মেয়াদ পর্যন্ত যদি কাজ বিনা বাধায় চলে, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে তাদের রাজনীতির কোন ঠাঁই থাকবে

না। এ জন্যে তারা অস্থিরতায় ভুগছে এবং অস্থিরতার কারণেই আবোল-তাবোল বকছে।

এদের অস্থিরতা শুরু থেকেই, নির্বাচনের দিন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাচনের দিন প্রথমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে নির্বাচন সুন্দর হচ্ছে, সঠিক হচ্ছে। রাত ৮টায় যখন রেডিও টেলিভিশনের সংবাদে নির্বাচনের ফল তাদের প্রতিকূল যাওয়া শুরু করল তখন তারা রেডিও-টেলিভিশনে নির্বাচনের ফলাফল প্রচার বন্ধের চক্রান্ত করেছিল। জোট নেতৃবৃন্দের সময়োচিত পদক্ষেপে তাদের সেই চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়ে যায়। এরপর তারা তদানীন্তন প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে ঐ নির্বাচন বাতিল করার চক্রান্ত করেছিল। তাদের সেই চক্রান্ত সফল হয়নি।

এরপর সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। সেটাও যখন ব্যর্থ হয় তখন তারা সংসদে না আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি তাদের চক্রান্ত ছিল সংসদে না এসে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ৬ মাসের মধ্যে সরকারকে তারা ফেলে দেবে। তারা একদিকে দেশের ভেতরে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধুয়া তুলে আর বিদেশে তালেবানের ধুয়া, আল কায়দার ধুয়া প্রচার করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার ফন্দি আঁটে। এজন্যেই তারা ২০০২ সালের বাজেট অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে সংসদে এসেছেন। এর আগে তারা আসেননি। তারা এখন বলেন, পার্লামেন্টে কথা বলতে দেয়া হয়না তাই তারা যান না। প্রথম অধিবেশনে কেন তারা আসেননি দয়া করে বলবেন কি? এর পরবর্তী অধিবেশনে না আসার কারণ তারা বলবেন কি?

প্রিয় ভাইয়েরা

এর জওয়াব তাদের কাছে নেই। সংসদকে অকার্যকর করার জন্যে তারা নৈরাজ্যকার পরিস্থিতির সৃষ্টির লক্ষ্যেই আজকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটাচ্ছে। অবশেষে তারা সরকারের পতনের জন্যে দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলেছে। আমি কথাটাকে গুরুত্ব দিতে চাইনি। কিন্তু পত্রিকাগুলো কথাটার গুরুত্ব দিচ্ছে। আমার জানামতে এই কথাটা বলে খোদ আওয়ামী লীগ বেকায়দার পড়েছে। আওয়ামী লীগের মধ্যে এ উপলব্ধি আছে। কথাটা হাল্কা করার জন্য বিরোধী দলের নেত্রী বলেছেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নাকি বিরোধী দলে থাকতে এভাবে ৮৮ বার সরকার হটানোর হুমকি দিয়েছিলেন।

এভাবে দিনক্ষণ ঠিক করে দেয়ার কথা আমাদের জানা নেই। কারণ আমরা একসাথে আন্দোলনে ছিলাম। যদি শেখ হাসিনার কথা মেনেও নেই তাহলে দেশবাসীর কাছে ঐ জলিল মিয়া গণক ঠাকুরের দিন তারিখের যে ঘোষণা এসেছে সেটা মাত্র ১টা কমপক্ষে আরো ৮৭টা ঘোষণার অপেক্ষা করতে হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা

সংসদের বিরোধী দলীয় ডেপুটি লিডার হামিদ সাহেবও ঘটনাটাকে হালকা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি একবার বলেছেন, দিনক্ষণ দিয়ে পলিটিক্যাল স্ট্যান্টবাজি করতে চাই না। আবার বলেছেন সংসদে খামাখা স্পীকার কেন রুলিং দিতে গেলেন। এটাতো সংসদের বাইরের একটা রাজনৈতিক ঘটনা। আমার বিশ্বাস বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার এবং মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী নিজেই জলিল মিয়ার কথায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন। কারণ এটা ইনশাআল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে বুমেরাং হবে, বুমেরাং হতে বাধ্য।

প্রিয় ভাইয়েরা

একটু আগে মাওলানা আবদুস সুবহান সাহেবের গল্পটা আপনারা শুনেছেন। ঐ গল্পটা জলিল মিয়ার ঘটনার জন্যে একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এপ্রোপ্রিয়েট। ঐ গল্পের শেষ কথা ছিল 'বউকে বলছে গরু হারাইলে এমনি হয়রে মা।' জলিল মিয়ার এ উক্তি মূলত ক্ষমতা হারানোর বেদনায় কাতর অস্থির রাজনীতিকের বোলচাল আর কি?

প্রিয় ভাইয়েরা

সময়ের আগে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে টেনে হেঁচড়ে নামানোর কথা গণতন্ত্রের কথা হতে পারে না। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কথা হতে পারে না। সাংবিধানিক রাজনীতির কথা হতে পারে না। এটা একটা ব্যর্থ আস্ফালন। আমি বিরোধী দলের নেত্রীকে বলব, আজকে আপনারা একটা ভদ্রোচিত প্রোগ্রাম করেছেন। এ ধরনের ভদ্রোচিত গণতন্ত্র সম্মত প্রোগ্রামের মাধ্যমে সরকারের বিপক্ষে আপনাদের পক্ষে জনমত গঠন করুন। ধৈর্যের সাথে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এই প্রচেষ্টায় যদি জনগণ আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে সামনের নির্বাচনে আপনার পক্ষে রায় দেয় ভালো কথা। যদি বিপক্ষে রায় দেয় সেটাও খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে মেনে নেয়ার জন্যে তৈরী থাকতে হবে। ১লা অক্টোবরের রায় মেনে নিতে ব্যর্থ হয়ে যে অস্থিরতার পরিচয় দিয়েছেন এটা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে না।

প্রিয় ভাইয়েরা

জনাব আব্দুল জলিল সাহেবের ঐ কথার কোন গুরুত্ব আমাদের কাছে নেই। কিন্তু মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী খুবই চাঞ্চল্যকর একটি কথা বলেছেন। জোট সরকার নাকি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে। তিনি এটা জানলেন কোত্থেকে?

প্রিয় ভাইয়েরা

কথায় বলে 'নিজের স্বপ্ন পরকে দেখায়।' আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশল হলো 'বলিবে উত্তরে, চলিবে দক্ষিণে।' তারা বলেছেন, 'সরকার হত্যা করবে'। মূলত: এ পরিকল্পনা তাদেরই। তারা নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেই সরকারকে বেকায়দা ফেলতে চান। নিজেরা লাশ সৃষ্টি করে লাশ নিয়ে রাজনীতি করতে চান। হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে এই খেলাটি খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম হওয়ার কারণে তারা এতে সফল হয়নি।

এটা তাদের পুরোনো অভ্যাস। এই পল্টন ময়দানে '৭০ সনের ১৮ই জানুয়ারিতে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় দীর্ঘ ৯০ মিনিটব্যাপী আওয়ামী লীগ হামলা চালিয়ে এক হাজারের বেশী লোককে আহত করেছিল। আহত অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে দুইজন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, নোয়াখালীর আবদুল আউয়াল, বাগেরহাটের আবদুল মজিদ। সেই লাশ দু'টি তারা ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল, বলেছিল অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালী মেরে ফেলেছে। কিন্তু দুই জনই ছিল মাদরাসার ছাত্র। তাদের মুখে ছিল দাড়ি। মাদরাসার কর্তৃপক্ষ সনাক্ত করেছে তারা তাদের মাদরাসার ছাত্র। তারা তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘ করত আওয়ামী লীগের সেদিনের চক্রান্ত সফল হয়নি।

প্রিয় ভাইয়েরা

শেখ হাসিনা যা বলেন তার উল্টোটাই বুঝতে হবে। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সন পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে। আর ৭২-এ ক্ষমতায় গিয়ে ৭৫ এ সংসদীয় বহু দলীয় গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। কারণ তারা যা বলে তার উল্টোটাই করে। প্রধানমন্ত্রী থাকতে তিনি বলেছিলেন যদি বিরোধী দলে যাই তাহলে হরতাল করব না। এখন হরতাল কি বাদ দিয়েছেন? না কথায় কথায় হরতাল করছেন? অতএব, তিনি যা বলেন তার বিপরীতটা বুঝতে হবে এবং এর মধ্যে একটি চক্রান্ত- ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত আছে। এ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্যে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা

আমি এ সুযোগে দেশের বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই। যারা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন অবশ্যই তাদের মুক্তবুদ্ধির চর্চার সমালোচনা করার অধিকার অন্যের আছে এটাও স্বীকার করতে হবে। তা না হলে মুক্তবুদ্ধির শ্লোগান দেয়া মানায় না। সম্প্রতি একজন বুদ্ধিজীবীর লেখা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। যদি সমালোচনা না হয়, তাহলে মুক্তবুদ্ধির সুযোগ আছে এটা বলাও কোন অধিকার থাকে না। আমি বুদ্ধিজীবীদের কাছে অর্থাৎ যারা নিজেদের সুশীল সমাজ বলে দাবি করেন, তাদের কাছে সত্যিকার অর্থেই রুচিপূর্ণ সুশীল আচরণ আশা করতে চাই। বিশেষ করে যারা শিক্ষকতার পেশায় আছেন, তাদের ভাষায় যদি অশালীন কথা থাকে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের কাছ থেকে কী শিখবে?

একজন লেখক নিয়ে কথা হচ্ছে। এই লেখকের বই পড়ার রুচি আমার নেই। ইনকিলাবের একটি উপসম্পাদকীয়তে কিছু উদ্ধৃতি ছাপা হয়েছিল। এটা পড়েই আমি বিস্মিত হয়েছি। এ রকমের অশালীন-নোংরা ভাষায় যারা কথা বলেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন কিভাবে। তারা বুদ্ধিজীবী নামে কিভাবে আখ্যায়িত হন? একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, এটাকে কোন ধরনের সাহিত্য বলা যায়, আমি বলেছিলাম আমাদের বুদ্ধিজীবীদের যে রুচি সে রুচির মাপে এটাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলতে হবে। তিনি বললেন, "না ভুল বলছেন, এটা হল নিম্নাঙ্গের সাহিত্য।

প্রিয় ভাইয়েরা

আমি বুদ্ধিজীবীদের নিকট অনুরোধ করব- এদেশে আলেম-উলামা তথা মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃটিশরাও ধ্বংস করতে পারেনি। এদেশের আলেম উলামা ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। এই ব্যাস্তবতা স্বীকার করে দেশের আলেম-উলামার সাথে আপনারা মেলামেশা করে তাদের থেকে ইসলাম শেখার ব্যবস্থা করুন। যদি পারেন আলেম-উলামাকেও আধুনিকতার ছোঁয়া দেয়ার চেষ্টা করুন। আলেম-উলামা ও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব-সংঘাত একটি দেশের জন্যে শুভ হতে পারে না। সুস্থ কিছু দিতে পারে না। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্যে আমি অনুরোধ করব।

দাবি তোলা হয়েছে, হুমায়ুন আজাদের উপর হামলার ব্যাপারে সাঈদী সাহেবকে গ্রেফতার করতে হবে। তিনি পার্লামেন্টে একটি আইনের কথা বলেছেন। বৃটেনে বাইবেলকে গালি দিলে, যীশু খ্রিস্টকে গালি দিলে ব্লাসফেমী আইনের আওতায় বিচারের ব্যবস্থা আছে। আমার জানামতে খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী কোন

ধর্মের এমন বুদ্ধিজীবী নেই যারা তাদের ধর্মের মুণ্ডুপাত করে, ধর্ম গুরুদের মুণ্ডুপাত করে। দুর্ভাগ্য আমাদের। মুসলমান নামধারীদের মধ্যেই এমন বুদ্ধিজীবী পাওয়া যায় যারা ইসলামের মুণ্ডুপাত করতে, কুরআনের মুণ্ডুপাত করতে এমনকি আল্লাহর রাসূলের (সা.) বিরুদ্ধে অপমানকর কথা বলতেও বুক কাঁপে না।

প্রিয় ভাইয়েরা

কেউ বলছে খুনীকে সাঈদী সাহেব নাকি চিহ্নিত করবে। আমি বলতে চাই খুনী কে, এটা হুমায়ুন আজাদ সাহেবের ভক্ত-অনুরক্ত, প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীরাই ভালো করে জানে। সাঈদী সাহেবকে জিজ্ঞেস করার কোন কারণ নেই।

আমি আলেম-উলামার খেদমতের কিছু কথা বলতে চাই। উলামায়ে কেরামের সমর্থনপুষ্ট এ চারদলীয় জোট। উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে ইসলামী ঐক্যজোট, জামায়াতে ইসলামী এ জোটে আছে। উলামায়ে কেরামকে আওয়ামী শাসনামল ও বর্তমান শাসনামলের পার্থক্য বুঝতে হবে। '৭২ থেকে ৭৫-এ আওয়ামী লীগ হাজার হাজার আলেম- উলামাকে শহীদ করেছিল। মাদরাসা শিক্ষা ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিল। আবার '৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালেও আওয়ামী লীগ মাদরাসায় তালেবান আবিষ্কার করতে গিয়ে ছাত্র-শিক্ষগণকে হয়রানি করেছে। আলীয়া মাদরাসার এমপিও ভুক্তি বন্ধ করার পাঁয়তারা করেছে।

জোট সরকার আসার পর আলীয়া মাদরাসা যেগুলোর এমপিওভুক্তি বাতিল হয়েছিল সেগুলোকে আবার চালু করা হয়েছে। আর এই বর্তমান আড়াই বছরে কোন কওমী মাদরাসায় তালেবান, আল-কায়দা আবিষ্কার করতে গিয়ে ছাত্র শিক্ষকদের কি হয়রানি করা হয়েছে? অতএব, এ পার্থক্যটুকু বুঝতে হবে। সেই সাথে ক্রাউন হান্টার এর লাইসেন্স বাতিল করা এবং কোমল পানীয়ের নামে মাদকের প্রসার ঘটাবার ক্ষেত্রে যে আইনের ফাঁকফোকর ছিল সেটা বন্ধ করা এ সরকারের একটা বড় অবদান। উলামায়ে কেরামের এটা মূল্যায়ন করা উচিত।

আমরা যা চাই, তা সব না পেতে পারি, এজন্য সমস্ত ইসলামী দল, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে আরো সাংগঠনিক মজবুতি অর্জন করতে হবে। গণভিত্তি বাড়াতে হবে এবং সেই সাথে উলামায়ে কেরামের খেদমতে আমি আরজ করব, ইসলামের নাম নিয়ে যাতে কোন মহল হটকারী কোন কথা না বলে, কোন হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলামের দুশমনদের হাতকে যাতে শক্তিশালী করতে না পারে, ইসলামের দুশমনদের হাসির খোরাক যাতে সরবরাহ করতে না পারে,

সকল আলেম-উলামাকে এ ব্যাপারে সতর্ক, সাবধান ও অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ভাইদের কাছে আমরা বলতে চাই, জোট সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করতে অবাধে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী এবং জোট সরকার তাদের সকল ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কোথাও যদি কোন অসুবিধা হয়, আমাদেরকে বলতে পারেন। আমাদের জানামতে ধর্মের ভিত্তিতে এখানে কোন সংঘাত নেই।

প্রিয় ভাইয়েরা

সবশেষে জাতিসংঘ ও বিশ্ব নেতৃত্বের কাছে একটি কথা বলতে চাই, বাংলাদেশ একটি মধ্যমপন্থী গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশ। বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান সকল প্রকারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। জাতিসংঘের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আমি একটি অনুরোধ করব- বিশ্ববাসীর জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস নির্মূলের ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক হতে হবে।

সকল প্রকারের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নীরব থাকলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন হবে না। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূলের উদ্যোগ নিতে হবে। এই সন্ত্রাসবাদের উৎস অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল এবং ইসরাইলীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ইসরাইলীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দমন এবং প্যালেস্টাইনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে, মুসলিম উম্মাহর এ প্রান্ত থেকে জাতিসংঘ এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে উপরোক্ত আবেদন রেখে এ জনসভা সফল করার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ, অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

৮ম জাতীয় সংসদে মাওলানা নিজামী

২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ১৭ জন এম.পি ও জামায়াত মনোনীত ৪ জন মহিলা এম.পি. অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। আমীরে জামায়াত ও মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২৮ জুন ২০০৪ সালে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের শেষাংশ থেকে এখানে উদ্ধৃতি দেয়া গেল -

মাননীয় স্পীকার, আমি ৫ম জাতীয় সংসদে (১৯৯১-৯৬) ছিলাম। এই সংসদেও আড়াই বছর চলে গেছে। আমরা কোন দিন মাওলানা মওদূদীর নাম এই পার্লামেন্টে উচ্চারণ করিনি। আমরা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাস করি না। মাওলানা মওদূদীর জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী আমরা উদযাপন করি না। যেহেতু মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রথম দিন পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে এই নামটি ভিন্নভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, আরেকজন সংসদ সদস্য এই নামটি উচ্চারণ করেছেন, অতএব আমাকে এর উত্তর দেয়া আমি প্রয়োজন মনে করি এবং সুযোগ দেবেন বলে আশা করি।

কাদিয়ানী সমস্যা ও মাওলানা মওদূদী (রহ.) সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকার, আহমদিয়াদের বই যেদিন নিষিদ্ধ ঘোষিত হল, বিরোধী দলীয় নেত্রী বিবৃতি দিলেন তাদের বই কেন বন্ধ করা হল, বন্ধ করা উচিত মাওলানা মওদূদীর বই। এই কথাটি বলে তিনি আসলে কাদিয়ানীদের পক্ষ নিয়েছেন, হয়তো বা তিনি টের পাননি। তাঁর দলের লোকেরাও এটা মনে করে না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরে কেউ নবী হতে পারে। অতএব, এ কথাটা তিনি বুঝে বলেছেন না, না বুঝে বলেছেন, আমি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু এটা কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয়; এটা নিতান্তই ধর্মীয় ইস্যু। এ বিষয়ে গোটা বিশ্বব্যাপী কোন দ্বিমত কিংবা বিতর্কের অবকাশ নেই যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী, তার পরে আর কোন নবী আসবে না। কুরআন এটা বলে, হাদীসেও এটা এসেছে। মুসলিম উম্মাহর সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইসলামে ওলামায়ে কেরামের মাঝে অনেক বিষয়ে অনেক ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৫৩ সালের রায়টের কথা বলা হয়। সেই রায়টে মাওলানা মওদূদী কিংবা জামায়াতে ইসলামীর কোন ইনভলবমেন্ট (involvement) ছিল না।[১৫] তদানীন্তন পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের হোতারা সেই সময় ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলনকে সাবোটাজ করার জন্য এই দাঙ্গা উসকে দিয়েছিল। আর ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রবক্তাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করে ছিল এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্য।

কাদিয়ানী ইস্যূতে আমি আমার কথা কিংবা মাওলানা মওদূদীর কথা বলতে চাইনা। ওআইসির ফেকাহ একাডেমীর একটি সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে পড়ে শুনাতে চাই মাননীয় স্পীকার, ফেকাহ একাডেমীর এই রেজুলেশনে বলা হয়েছে-

The declaration by Mirza Ghulam Ahmad concerning his Prophethood and his claim of inspiration by the Divine Revelation, is an open rejection of the obviously and categorically established religious doctrine concerning the ending of Prophethood with Prophet Muhammad (pbuh) and that there is no revelation after him. Therefore, the said declaration from Mirza Ghulam Ahmad make him, along with all those who accept the same, apostates (Murtad), who have apostatized Islam. As for as the Lahorites are concerned, they too like the Qadianis are apostates (murtad) despite their description of Mirza Ghulam Ahmed as the shadow and incarnation of our prophet Muhammad (pbuh).

মাননীয় স্পীকার, মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে আমি এটুকু বলতে চাই যে, তিনি ১৬০ খানির মত বই লিখেছেন। ৬০টির মত ভাষায় তাঁর বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কোন বই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়নি। তাঁর কোন বই থেকে কেউ এটা প্রমাণ করতে পারবে না যে তিনি সশস্ত্র কিংবা সন্ত্রাসী কোন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। তাঁর বই থেকে এটাও কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না যে, তিনি বৃটিশের সমর্থক ছিলেন।

তেমনিভাবে মাননীয় স্পীকার, তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে, উপমহাদেশের মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল Two Nation

---

[১৫] এই রায়টে (দাঙ্গায়) ১১ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়েছিল।

Theory. এই "টু নেশন থিওরীর" (দ্বি-জাতিতত্ত্ব) পক্ষে মাওলানা মওদূদীর অসংখ্য লেখনী ও বই আছে। অতএব এই অভিযোগ তার ব্যাপারে সত্য হতে পারে না যে, তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন।

মাননীয় স্পীকার, এর পরে আমি একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই, আমাদের দেশে এখন কাদিয়ানীদের ব্যাপারে যে আন্দোলন চলছে, আপনি জানেন এই আন্দোলনের কর্মসূচির সাথে জামায়াতে ইসলামীর কোন সম্পর্ক নেই, কোথাও আমাদের সংশ্লিষ্টতা নেই। (আমাদের এ নীরবতায় কেউ কেউ আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ, নাখোশ) কিন্তু এ বিষয়ে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে আমি যা জানি তা না বলাটা সত্য গোপনের পর্যায়ে যায়। সে জন্য আমাকে হক কথা বলতেই হবে মাননীয় স্পীকার।

আমি সর্বশেষে যে কথাটি বলতে চাই তাহলো পশ্চিমা কিছু মিডিয়ার কারণে আমরা অনেক সময় এই হীনমন্যতায় ভোগী। মাননীয় স্পীকার, আমি এক্ষণে আপনার মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের দু'টি ঘটনা মহান সংসদে উত্থাপন করতে চাই। পশ্চিমা জগত থেকে প্রায়ই আমাদেরকে গণতন্ত্র শিখাতে আসে, আমাদেরকে মৌলিক মানবাধিকার শিখাতে আসে, আমাদেরকে ধর্মীয় সহনশীলতা শিখাতে আসে, তাদের দেশে কতটা সহনশীলতা আছে এর একটা ছোট নমুনা আমি পেশ করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৬৬ সালে The Evening Standard এ একটি ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিল একজন সিংগার গ্রুপের নেতার। তার গ্রুপের নাম হলো 'বিটলস' বলা হয়েছিল, 'বিটলস আর বিগার দ্যাস জিসাস ক্রাইস্ট' এই বলার দরুন তাদেরকে পশ্চিমা জগৎ বয়কট করেছিল। তার পরে তাকে দস্তরমতো ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৯৩ সালে জনৈক ডেভিড কোরেশ নিজেকে 'জিসাস ক্রাইস্ট' বলে দাবি করেছিল। তাকে তার সংগীদেরকেসহ আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আমাদের মুসলমানদের দেশে এমন কোন নজীর নাই মাননীয় স্পীকার। অতএব আমরা যেন হীনমন্যতায় না ভোগী। আমরা যেন পশ্চিমাদের প্রচারনায় পড়ে আমাদের আত্মপরিচয় না ভুলি। আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে পশ্চিমাদের নিকট থেকে আমাদের শেখার কিছুই নেই।

মাওলানা নিজামীর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনা

২৮ জুন ২০০৫ সালে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তৃতার অংশ বিশেষ-
মাননীয় স্পীকার, আমি গতকাল সকালে বি.বি.সি'তে শুনলাম, মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবকে বি.বি.সি প্রশ্ন করেছে, "পার্লামেন্টে আপনারা যাচ্ছেন না কেন? বাইরের লোকরাও তো বলে (আওয়ামী লীগের) পার্লামেন্টে যাওয়া উচিৎ।" তিনি বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের খাতে আমরা এক হাজার প্রশ্ন জমা দিয়েছি, একটি প্রশ্নও উত্তরের জন্য গ্রহণ করা হয়নি।" মাননীয় স্পীকার, এটা শোনার পর আমি খুব গুরুত্ব সহকারে সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা করেছি। আপনার সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট লোকদেরকেও একটু পরিশ্রম করিয়েছি। তারা আমার কাছে একটি তথ্য দিয়েছে যে, এই ৮ম জাতীয় সংসদের ১৭টি অধিবেশন হয়েছে, এই ১৭টি অধিবেশনে কোন একটি অধিবেশনেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরের খাতে আওয়ামী লীগের বন্ধুরা একটি প্রশ্নও জমা দেননি। অথচ বি.বি.সি'র মাধ্যমে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা একহাজার প্রশ্ন জমা দিয়েছেন, একটি প্রশ্নও গ্রহণ করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার, আপনার দপ্তর সাক্ষী, তাদের কথাটি কত বড় অসত্য, জঘন্য একটা অপ-প্রচার।

মাননীয় স্পীকার, আমি এখন একটি কথা বলে শেষ করতে চাই। বাংলাদেশকে মৌলবাদের দেশ' ইত্যাদি যাই বলা হোক, বাংলাদেশ ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশ। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এই অবস্থা আজকে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মকর্ম পালন করে। মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মকর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এর প্রকাশ সব সময়ই ঘটেছে। আওয়ামী লীগের ১৯৭২-৭৫ শাসনামলে এদেশের ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ আলেম -ওলামা এরা হয় ছিলেন কবরে, না হয় কারাগারে, এরা কেউ বাইরে ছিলেন না। সেই সময়ে দাউদ হায়দার হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ব্যঙ্গ করে যে কবিতা লেখে তার প্রতিক্রিয়ায় গণ বিক্ষোভ হলে দাউদ হায়দার দেশ ত্যাগে বাধ্য হলো। সেদিনের অবস্থাকে তো মৌলবাদ কিংবা জঙ্গিবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। এই হলো বাংলাদেশ। মাননীয় স্পীকার, আপনি লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশের একজন বৈমানিক যখন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন, তিনি প্যারাসুট জাম্প করে মাটিতে পা দিয়েই যাকে কাছে পেয়েছেন বলেছেন, অজুর পানি ও জায়নামাজ দিন। তিনি আগে শোকরানা নফল নামাজ আদায় করেছেন। আমাদের উদীয়মান ক্রিকেট তারকা আশরাফুল ইসলাম সেঞ্চুরী

করার পর সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করেছে। এটাই বাংলাদেশ, এটাই বাংলাদেশের ধর্মীয় আবেগের বাস্তবতা।

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার কণ্ঠে যে স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজ উচ্চারিত হয়েছিল তাতেও এই ইসলামী আদর্শের প্রতি আবেগ অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছিল। যার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে শহীদ জিয়া আমাদের সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" যোগ করেছেন, সেকুলারিজম এর পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আস্থা সকল কর্মকাণ্ডের উৎস হবে বলে ঘোষণা করে এদেশের ইসলামী জনতার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে মুসলিম উম্মাহর কাছে অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। আজকে আমাদের প্রধান বিরোধী দলের আফসোস, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি'র প্রতি ইসলামী দলগুলো কেন সমর্থন দিয়ে আসছে? ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা মনে করে এটাই তাদের পরাজয়ের কারণ এবং সামনে ঐ ঐক্য থাকলে তাঁরা আর বিজয়ের স্বপ্ন দেখে না। এই জন্য নানা রকমের চতুর্মুখী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত।

মাননীয় স্পীকার, এখন তাদের কাছে অবলম্বন, আগামী নির্বাচন যাতে (যথা সময়ে ও যথা নিয়মে) হতে না পারে। নির্বাচনের আগে যেন নৈরাজ্যকর কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়। কেয়ারটেকার সরকারের বিরুদ্ধে তারা একটি কেওয়াস সৃষ্টি করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়। আমি আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রেখে এদেশের জনগণের প্রতি আস্থা রেখে বলতে চাই, ২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিল তারা যা করতে চেয়েছিলেন তা করতে পারেননি তেমনি ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকে কেন্দ্র করে যা করতে চেয়েছিলেন করতে পারেন নি। ২০০১ সালের নির্বাচনকে যেভাবে তাদের পক্ষে নেয়ার চক্রান্তে ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনি আগামী দিনের সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, যদি জোট (বহাল তবিয়তে) থাকে। আমি এই কথা বলে জোটের ঐক্যকে অটুটু অক্ষুন্ন রাখার সংকল্প ব্যক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সতর্ক গতিতে চোখ-কান খোলা রেখে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের ধরন ও প্রকৃতি উপলব্ধি করে, বাস্তবসম্মত ও সময়োচিত পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

দেশব্যাপী আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন

জামায়াতে ইসলামী তার বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে দেশের ১০টি অঞ্চলে ২০০৫ সালের শুরুতেই দশটি আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পন্ন করে। ২৮ এপ্রিলের মধ্যে বিভাগীয় শহর ব্যতীত কুমিল্লা, সাতক্ষীরা ইত্যাদি স্থানে সাতটি

সম্মেলন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এমনকি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ও চার দলীয় জোটের প্রনিধিত্বকারী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই সব সম্মেলনে জামায়াতের রুকন, কর্মী ও সক্রিয় সমর্থকসহ মহিলা ও পুরুষ সকলের অংশগ্রহণে সম্মেলনগুলো খুবই প্রাণবন্ত হয়েছিল।

প্রথম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৪ মার্চ '০৫ ঐতিহাসিক সিলেট সরকারি আলীয় মাদরাসা ময়দানে। এতে সভাপতিত্ব করেন সিলেট অঞ্চলের দায়িত্বশীল ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমান। এতে অংশগ্রহণ করে সিলেট মহানগর, সিলেট জেলা দক্ষিণ, সিলেট জেলা উত্তর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার সকল রুকন, কর্মী ও উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১১ মার্চ '০৫ কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব আবু নাসের মুহাম্মদ আব্দুজ্জাহের সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ২য় আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন। প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা শহর, কুমিল্লা উত্তর, কুমিল্লা দক্ষিণ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নোয়াখালী লক্ষ্মীপুরের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৩য় আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই মার্চ '০৫ বন্দর নগরী খুলনা স্টেডিয়ামে। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ। উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন খুলনা মহানগরী, খুলনা উত্তর, খুলনা দক্ষিণ, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও নড়াইল জেলার সকল রুকন, কর্মী এবং উপজেলা, থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১ এপ্রিল '০৫ জামায়াতে ইসলামীর ৪র্থ আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে। বিশাল এই প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা জেলার সকল রুকন, কর্মী ও উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

দিনাজপুরের বিশাল ময়দানে জনাব এ.টি.এম. আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে ৮ এপ্রিল '০৫ জামায়াতে ইসলামীর ৫ম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে ৮টি জেলার সকল রুকন ও কর্মী

এবং বিভিন্ন উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। জেলাগুলো হলোঃ পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা।

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে ১৫ এপ্রিল ২০০৫ জামায়াতে ইসলামীর ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মীর কাশেম আলী। উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরী, চট্টগ্রাম উত্তর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও ফেনী জেলার সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

২২ এপ্রিল ২০০৫ ফরিদপুর ময়েজ উদ্দীন হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর ৭ম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন। উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সহকারি সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আবদুল কাদের মোল্লা। প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৮ম প্রতিনিধি সম্মেলণ অনুষ্ঠিত হয় ২৯ এপ্রিল ২০০৫ ঢাকা পল্টন ময়দানে। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা রফিউদ্দীন আহমদ। প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন ঢাকা মহানগরী, ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং শরিয়তপুর জেলার সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৬ মে ২০০৫ বরিশাল স্টেডিয়ামে অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর ৯ম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন বরিশাল মহানগরী, বরিশাল পশ্চিম, বরিশাল পূর্ব, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বছরের শেষ প্রতিনিধি সম্মেলন হয় ১৩ মে ২০০৫ রাজশাহীতে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণমন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ। কিন্তু সেক্রেটারী জেনারেল অসুস্থ থাকার দরুন উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী মহানগর আমীর জনাব আতাউর

রহমান। প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী মহানগরী, রাজশাহী পশ্চিম, রাজশাহী পূর্ব, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, পাবনা, জয়পুরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ জেলার সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে ঐ সব সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া গেলো না। এখানে শুধুমাত্র ২৯ এপ্রিল ২০০৫ ঢাকাস্থ ক্রীড়া মিলনায়তন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঢাকা অঞ্চলের ৮ম প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রদত্ত আমীরে জামায়াত ও শিল্প মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর মূলবান ভাষণের বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত সম্মেলনে অন্যতম বিশেষ অতিথি ছিলেন তৎকালীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা জনাব মির্জা আব্বাস। সবগুলো সম্মেলন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বিধায় সম্মেলনেই মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

হামদ, সানা, সম্মোধন ও সালাম বাদ মুহতারাম আমীরে জামায়াত পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে এই প্রতিনিধি সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই কথাটি সবাইকে স্মরণ করিয়ে আশা করেন যে, সম্মেলন আমাদেরকে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো জোরদার, আরো বেগবান করার ক্ষেত্রে উজ্জীবিত করবে। সম্মেলন শেষে মাঠে ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের বহুমুখী সার্বিক কর্মকান্ড, কর্মসূচি, পরিকল্পনার বাস্তবায়নে আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এবং যত্ন সহকারে চেষ্টা করব।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) তথা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে সাধারণত মনে করা হয় তারা ছিলেন ধর্মগুরু, আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। মানুষের ব্যবহারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

আজকের প্রেক্ষাপটে দুনিয়াব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর উপর আঘাত ও নিপীড়ন নেমে আশা সত্ত্বেও ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আবার নতুন মাত্রায় ও নতুন আঙ্গিকে শুরু হয়েছে, এবং ইসলামী জাগরণ দুনিয়ায় একটি নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সেই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যে বিশ্ব জনমতকে মিসগাইড করার নানা ও বহুমখী প্রচারণা শুরু হয়েছে। প্রিন্টিং মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি ওয়েব সাইট অন লাইনের মতো, আধুনিক প্রযুক্তিকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

মিলিট্যান্ট ইসলামের নামে ইসলামের উপর আঘাত হানার প্রচেষ্টা একটি পর্যায়ে এসেছে। এখন এতে নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে ইসলামের বিভাজন সৃষ্টির জন্যে। রাজনৈতিক ইসলাম নাকি আলাদা একটা, আধ্যাত্মিক ইসলাম নাকি আলাদা একটা। পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক ইসলাম সম্পর্কে কিছু লেখা মাঝে মধ্যে পড়ার সুযোগ হয়। বিশেষ করে ইংরেজী দৈনিকগুলোর উপ-সম্পাদকীয়গুলোতে মাঝে মধ্যে এরকম কিছু আসে।

সম্প্রতি আবার দেখলাম বাংলাদেশে নাকি জঙ্গিবাদ, মৌলবাদের পাশাপাশি মৌলবাদী অর্থনীতিরও উৎপাত শুরু হয়েছে। এই মৌলবাদের অর্থনীতির লেখকও একটি পর্যায়ে আধ্যাত্মিক ইসলাম ও রাজনৈতিক ইসলামের মধ্যে বিভাজনের রেখা টানার চেষ্টা করেছেন। আমি আরো বিস্মিত হয়েছি, ইসলামী পরিচয় বহনকারী একটি জাতীয় দৈনিকেও এই নিবন্ধটি পূর্ণাঙ্গ আকারে ভরা পাতায় ছাপা হয়েছে। যার টার্গেট হলো ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই উপমহাদেশে নাকি যারা ইসলাম নিয়ে এসেছেন তাদের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। তারা শুধু আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে ইসলাম প্রচার করেছেন। এটাও ইতিহাস বিকৃতির একটি জঘন্য অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত শাহ জালাল (র.), শাহ মখদুম (র.), খান জাহান আলীসহ এই দেশে যারা ইসলামের দা'য়ী হিসেবে, প্রচারক হিসেবে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ। তাদের ইতিহাসকে বিকৃত করে আজকে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে রাজনৈতিক ইসলাম নামে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চলছে। অতএব আমি এই প্রচারণাকে সামনে রেখে বলতে চাই, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) নিছক আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন না। আসমানি কোন কিতাব নিছক ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কিতাব ছিল না। আল্লাহ সোবহানাহু তা'আলা সমস্ত নবী প্রেরণের এবং সমস্ত আসমানি কিতাব নাযিলের একটি উদ্দেশ্য বলেছেন তা হলো- "লি-ইয়াকুমান্নাসু বিল কিসত" যাতে করে দুনিয়ার গোটা মানব জাতি ন্যায় ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এজন্যেই সমস্ত আসমানি কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) কে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ সোবহানাহু তা'আলার ঘোষণা- "আমি যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছি দলিল-প্রমাণসহ তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব এবং ইনসাফের দণ্ড, ন্যায়ের দণ্ড। যাতে দুনিয়ার সকল মানুষ- সাদা-কালো, ধনী-গরীব, আরব-

আযম, শ্রমিক-মালিক, নারী- পুরুষ নির্বিশেষে ন্যায় ও ইনসাফের উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কল্যাণ এবং নিরাপত্তা পেতে পারে।"

অতএব কোন আসমানি কিতাবকে নিছক আধ্যাত্মিক শিক্ষার গ্রন্থ আর আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) কে নিছক ধর্মগুরু মনে করার কোন কারণ নেই। ইসলাম মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা দেয়।

আমাদের এই উপমহাদেশে যারা ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম, বিশেষ করে শেষ নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসারী ও উত্তরসূরী হিসেবে এসেছিলেন তারাও নিছক আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করেন নাই।

সুধী মন্ডলী ভাই ও বোনেরা
আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, শেষ নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জামায়াতে ইসলামীও আজকের এই সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাস্তবায়ন চায় এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তি নিশ্চিত করতে চায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
জামায়াতে ইসলামী নতুন কোন ইসলামের সংজ্ঞা দেয়নি। ইসলাম সম্পর্কে নতুন কোন বক্তব্য নিয়ে আসেনি। আল্লাহর কোরআন, রাসূলে পাক (সা.) এর সুন্নাহ, খোলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রমে ইসলামের যে পূর্ণাঙ্গ দিক ও বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায় আধুনিক যুগসন্ধিক্ষণে সেই ইসলামকেই আল্লাহর জমিনে কায়েম করার লক্ষ্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী যাত্রা শুরু করেছে।

সুধী মন্ডলী ভাই ও বোনেরা
আমি একটু আগে বলেছিলাম ইসলামকে রাজনৈতিক ইসলাম আর আধ্যাত্মিক ইসলাম হিসেবে বিভাজনের একটি অপচেষ্টা, অপকৌশল চলছে। এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য, যাতে করে দুনিয়ার মানুষ ইসলামের মূল শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত ও ব্যর্থ হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
আমি বলেছিলাম মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র সিরাতের মাস, রবিউল আউয়াল মাস। এই মাসে তার আদর্শ নিয়ে চর্চা হচ্ছে। এই অবস্থানকে সামনে রেখে আমরা এই সম্মেলনে সমবেত হয়েছি। মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি ইসলামের কাজ করতে হয়, তাহলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং দুনিয়াবাসীকে জানাবার, বুঝাবার উদ্যোগ নিতে হবে। মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

(সা.) ১৩ বছর মক্কায় দাওয়াত দিয়েছেন সেখানে ইসলাম কায়েম হয়নি। মদীনা মক্কা থেকে বহুদূরে অথচ সেখানে মক্কার আগে ইসলাম কায়েম হয়েছে। কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে এ বিষয়টিও আজকে যেমন আমাদের বুঝতে হবে। তেমনি দুনিয়াবাসীকেও বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে। এখানে আমরা যে জিনিসটি পাই তাহলো ইসলাম গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়, বল প্রয়োগের মাধ্যমে কায়েম করার জিনিস নয়, ইসলাম কায়েম হবে মানুষের সমাজে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে।

মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় কোন সামরিক বাহিনী নিয়ে যাননি, সামরিক অভিযান পরিচালনা করেননি। মদীনাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। কোরআনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তার ভিত্তিতে মদীনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছে। সেই সাথে আমরা এটাও দেখি মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) হুদায়বিয়ায় আপাত দৃষ্টিতে নিজেদের জন্যে সম্মানজনক নয়, এমন সন্ধিতে স্বাক্ষর করেছেন। আমরা এটাও দেখি যে তের বছর মক্কায় অবর্ণনীয় নিপীড়ন সহ্য করেছেন, সেই মক্কা তিনি জয় করেছেন বিনা যুদ্ধে, রক্তপাত না ঘটিয়ে। মক্কা বিজয়ের পর যারা তাদেরকে ভিটামাটি ছাড়া করেছিল তাদের প্রতি প্রতিশোধের কোন কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশের মাটিতে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা.) কে যুদ্ধবাজ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে একটি সেমিনারের মাধ্যমে।

আমি এই কথাগুলোর মাধ্যমে যেটা বলতে চাচ্ছি তাহলো, ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ইসলাম অনুসরণ করতে হলে রাজনীতিতেও ইসলাম থাকতে হবে, অর্থনীতিতেও ইসলাম থাকতে হবে, সমাজ, প্রশাসনে ইসলাম থাকতে হবে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, শিক্ষায় ইসলাম থাকতে হবে। তেমনি এই ইসলাম কায়েমের পথ ও পদ্ধতি হলো গণতন্ত্র সম্মত। ইসলামের নাম দিয়ে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি যদি বলে, গণতন্ত্র হারাম, গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। তারা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে, মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গৃহীত পদ্ধতি হয় তারা জানেনা আর না হয় তারা জেনে শুনে ইসলামকে বিপন্ন করার জন্যে, ইসলামের অনুসারীদের বিপদগ্রস্ত করার জন্যে প্রতারণামূলকভাবে এই ধরনের উক্তি করে থাকে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
জামায়াতে ইসলামী তাই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যেমন বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে এবং মানুষের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে চেষ্টা করেছে, ইসলামের ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনার উপযোগী লোক তৈরী করছে, বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি করছে। তেমনি আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও জামায়াতে ইসলামী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে আসছে। ষাটের দশকে জামায়াতে ইসলামী সামরিক ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী দলসহ সকল রাজনৈতিক দলের সাথে মিলে কাজ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। ইতিহাস সাক্ষী ১৯৬৪ সালে এই অপরাধে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকে তৎকালীণ সামরিক স্বৈরাশাসক আইয়ূব খান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
এমনিভাবে ৮০'র দশকেও জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আন্দোলন করেছে, সংগ্রাম করেছে। গণতন্ত্রকামী সকল দল, সকল মহলের সাথে মিলে কাজ করছে। আজকের দিনে বাংলাদেশে যেই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজিত হওয়ার ফলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার পথে এই ফর্মুলাও জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত হয়েছিল।

অতএব, জামায়াতে ইসলামীকে জঙ্গিবাদী হিসেবে চিত্রিত করার কোন সুযোগ নেই। এরপরও মহল বিশেষ জামায়াতে ইসলামীকে সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমি এই প্রসঙ্গে একটু পরে কথা বলব।

গণতন্ত্রের জন্যে জামায়াতে ইসলামীর যে সংগ্রামী ভূমিকা এরই অংশ হিসেবে বিগত আওয়ামী দুঃশাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আমরা চারদলীয় জোট করেছিলাম। চারদলীয় জোটে আমরা শরীক হয়েছিলাম।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
চারদলীয় জোটে শরীক হয়ে জোট সরকার গঠনের মাধ্যম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জোট সরকার এই দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী সেখানে একটি সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এমনিভাবে' জোট সরকার

সার্বিকভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধনের উদ্যোগ নিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্যোগ নিয়েছে। শিল্প খাতে উন্নতি, অগ্রগতির বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিয়েছে। এই অবস্থায় জোটের বিপক্ষে আওয়ামী লীগসহ তাদের দোষররা নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে হরতাল, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে দেশে একটি অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত যে পরিস্থিতি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তার মোকাবেলায়ও জামায়াতে ইসলামী জোটকে অটুট, অক্ষুণ্ন রেখে এখনো দায়িত্বশীল, গঠনমূলক ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। ইনশাআল্লাহ সামনেও অব্যাহত রাখবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

জোটের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান, জানিনা কেন যেন তাদেরও মূল টার্গেট পরিণত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী। ঘুরে ফিরে জামায়াতে ইসলামীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়। জামায়াতে ইসলামী নাকি খুব বেশি এগিয়ে যাচ্ছে, এই জোটে নাকি জামায়াতে ইসলামী সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ঘুরে ফিরে আপনারা এই লেখালেখি দেখবেন। আবার আপনারাও মনে করেন জোটে শরীক হয়ে আমরা ইসলামের কথা বলা বাদ দিয়েছি। আমরা ইসলামী তেমন কিছু আদায় করতে পারি নাই। দুইটা জিনিস একসাথে সত্য হতে পারে না। আমরা জোটে ইসলাম কায়েম করার জন্য গিয়েছি, আমরা এটা বলি নাই। আমরা ইসলামের নাম নিশানা যারা বরদাশত করতে পারেনা, দুই-দুই বার ক্ষমতায় গিয়ে যারা ইসলাম নির্মূলের অপচেষ্টা করেছে তাদের ক্ষমতায় আসা বন্ধ করার জন্যে জোটে গিয়েছিলাম। এতে আমরা সফল হয়েছি না ব্যর্থ হয়েছি? ভবিষ্যতেও যাতে তারা ক্ষতায় আসতে না পারে এজন্যে আমরা জোটকে অটুট, অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা আন্তরিকভাবে বহাল রাখার পক্ষে, এতে আপনাদের কি সম্মতি আছে, না নাই?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আওয়ামী লীগ দুইবার ক্ষমতায় এসে প্রমাণ করেছে তারা ইসলামের প্রতি বৈরী শক্তি। ১৯৭২-৭৫ সালে তারা ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামের ভিত্তিতে দলগঠন নিষিদ্ধ করেছিল। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতির নাম নিশানা মিটিয়ে দিয়েছিল। একটি দুর্ঘটনায় বশবর্তী হয়ে অতীতের ভুলভ্রান্তি মাপ চেয়ে তারা ১৯৯৬ তে ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরে ইসলামের পক্ষে ভূমিকা রেখেছে না বিপক্ষে রেখেছে? কওমী মাদরাসা, আলিয়া মাদরাসা, উভয় মাদরাসা শিক্ষা ধ্বংস করার জন্যে তারা পদক্ষেপ নিয়েছিল, আবারও ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা করেছিল। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে তারা

১৯৯৬-২০০১ সালের জুলাই পর্যন্ত যে সুযোগ পেয়েছিল এই সুযোগে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করত। জোটের কারণে পারেনি। সামনেও ক্ষমতায় এসে এটা করতে চায়। এজন্য প্রধান টার্গেট জোট ভাঙ্গা। আর জোটে ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্যে তাদের প্রধান টার্গেট জামায়াতে ইসলামী।

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে টার্গেটের এক নম্বর লক্ষ্য জোটের প্রধান শরীক দলের মধ্যে স্নায়ু চাপ সৃষ্টি করা। যাতে করে জামায়াতে ইসলামীকে তারা বোঝা মনে করতে বাধ্য হয়। বিদেশী প্রভুদের আশির্বাদ লাভও তাদের একটি টার্গেট। সেই সাথে ইসলামপন্থী যত দল আছে তাদের মধ্যে ঈর্ষাকাতর মনোভাব সৃষ্টিও তাদের লক্ষ্য।

আমি এই বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের নিজেদের দলের নেতা-কর্মীদেরও সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। জোটের শরীক প্রধান দল এবং অন্যান্য দলের নেতা কর্মীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে কারণে আমরা জোট গঠন করেছিলাম সেই কারণ এখনও দূর হয়ে যায় নাই। অতএব জোটের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নাই। জোটকে আরো শক্তিশালী, আরো বেগবান করতে হবে এবং চারদলীয় জোটকে বাংলাদেশের জনমানুষের জোটে পরিণত করতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা
জামায়াতে ইসলামী সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট নয় একথা সকলেই জানে। জঙ্গিবাদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না তাও তারা জানে। এর পরেও জামায়াতে ইসলামীকে জঙ্গিবাদী হিসেবে চিত্রিত করার অপকৌশল চলছে। সাম্প্রদায়িকতার দোষে-দোষী করারও অপচেষ্টা চলছে। একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে আমার এই কথাটা শেষ করতে চাই। কাদিয়ানী সমস্যা নিয়ে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টির অপপ্রয়াস চলছে। বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের সংখ্যা এমন নয় যে তারা কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই ইস্যুতে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। এ প্রসঙ্গে তাফহীমুল কোরআনের সূরা আহযাবের তাফসীরে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। মাওলানা মওদূদীর বই আছে। কোন সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্টীর স্থাপনা দখল করা, বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উৎখাত করার নীতির সাথে জামায়াতে ইসলামীর অতীতেও সম্পর্ক ছিল না, আজো সম্পর্ক নেই। "খতমে নব্যুয়াত আন্দোলন" নামে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, তার কোন একটির সাথে জামায়াতে ইসলামীর সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঘুরে ফিরে এদের পেছনে জামায়াত আছে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এগুলোর পেছনে নাকি জামায়াত আছে। আমরা

প্রতিবাদ দেই, ছাপে না। কয়দিন পরে ছাপল আবার ব্যাখ্যা দিল যে, অমুক, অমুক, নাকি এই ক্যাম্পেইন- এ জড়িত, তারা জামায়াতের লোক। আমরা প্রমাণ দিয়ে বললাম ওদের সাথে জামায়াতের কোন সম্পর্ক নেই, ওরা জামায়াত বিরোধী কোন একজন পীরের মুরিদ। তাদের ভূমিকা জামায়াতের উপর চাপানোর কোন যুক্তি সংগত কারণ থাকতে পারে না।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাইরে জঙ্গিবাদ এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে প্রচারণা চলছে কারো কাছে তার কোন প্রমাণ ছিলনা, এখনো নাই। শুধুমাত্র গুটিকয়েক অর্বাচীন ব্যক্তি আহমদিয়া স্থাপনা দখলের জন্যে যে উগ্রতার পরিচয় দিয়েছে, লাঠি হাতে মিছিল করে যে ভিডিও চিত্র গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে, এই ঘটনাটাই বাইরের জগতকে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে যে, এখানে জঙ্গিবাদ আছে, এখানে সংখ্যালঘু নির্যাতনও আছে। এই কর্মটা যারা করছে তাদের সাথে ইসলামের কতটুকু সম্পর্ক আছে আমার জানা নেই। তবে তাদের এই কর্মকাণ্ড ইসলামের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করেছে, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, দেশের হক্কানী আলেম-ওলামা কোন খাঁটি ইসলামী দল এদের সাথে নেই।"

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ গঠন

২০০৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে ঢাকাস্থ পল্টন ময়দানে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি'র নেতৃত্বে মাদরাসা শিক্ষকগণের এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ফাজিল-কামিলের স্বীকৃতি আদায়সহ মাদরাসা শিক্ষগণের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দাবি বাস্তবায়নকল্পে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আহ্বায়ক ও তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা যাইনুল আবেদীনকে সদস্য সচিবের দায়িত্ব দিয়ে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ' গঠিত হয়।

ফাজিল ও কামিলের স্বীকৃতির পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক তথা বৈরিতা

মাদরাসার ফাযিল ও কামিল ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি কীভাবে দেয়া হবে, সেটা নিয়েই বিতর্কের সূচনা। ২০০২ সালেই চার দলীয় জোট মন্ত্রীসভা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিলকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মন্ত্রীসভা কমিটিকে এ বিষয়ে সুপারিশ করার যে দায়িত্ব দিয়েছে মন্ত্রীসভা কমিটি সে দায়িত্ব তিন বছরেও পালন না করায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলই হতাশায় ভুগছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যদি উদ্দ্যোগী হয়ে মাদরাসা ছাত্রদের এ দীর্ঘদিনের

ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য সম্মত হন, তবেই ঐ কমিটির নিকট আটকে পড়া বিষয়টির মুক্তি তথা সমাধান সম্ভব।

জামায়াতে ইসলামীর মন্ত্রীদ্বয় এটাই চান যে, পৃথক এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি যদি এ মূহুর্তে সম্ভব না-ই হয় তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হলেও অবিলম্বে স্বীকৃতির দাবি পূরণ হোক। যে দাবি ১৯৮৯ সালেই পূরণ হওয়া উচিত ছিল তা ২০০২ সালে জোট সরকার সম্মত হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে অযৌক্তিকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, আলোচ্য বিষয়টি বিবেচনা করে সুপারিশ করার জন্য সিনিয়র মন্ত্রী ও বিএনপি'র মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক ও শিক্ষা মন্ত্রী, আইন মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রী ও শিল্প মন্ত্রীকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠিত হয়। কেবিনেট সচিব ও শিক্ষা সচিব পদাধিকার বলে কমিটিতে আছেন।

ওদিকে জমিয়াতুল মুদাররেসীনের পক্ষ থেকে ২০০৪ সালে দাবি তোলা হয় যে, ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতি দান একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়। এ দাবি নিয়ে ২০০৫ সালে জা'বির তৎকালীন ভি.সিও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাত করেন। স্মরণযোগ্য, মাওলানা নিজামী ১৯৬০ সাল থেকে মাদরাসা ছাত্রদের এসব দাবি দাওয়া নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন। নিজামী সাহেব ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু এ দাবি পূরণের অপেক্ষায় ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতি বিলম্বিত হওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন।

আমীরে জামায়াত সারাদেশ থেকে মাদরাসা শিক্ষকগণের প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা করেন। ২০০৫ সালের ২ জুলাই পল্টন ময়দানে আহূত ও অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ কায়েম হয় এবং ফাযিল-কামিলের স্বীকৃতির দাবি আদায়ের জন্য পৃথকভাবে আন্দোলন করার প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ পাকের লাখো শোকরিয়া। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা সাঈদী সাহেবের আপোষহীন ও অক্লান্ত সাধনার ফলে ও জোট সরকারের মহানুভবতায় ২০০৬ সালে মাদরাসা ছাত্রগণ তাদের বহু প্রত্যাশিত স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়।

দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে আমীরে জামায়াত

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৩টি জেলায় একসাথে বোমা হামলা হয়। বর্বরোচিত সে হামলার নিন্দা জানিয়ে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জাতীয় সংসদে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিছু অংশ নিম্নে প্রদান করা হলো-

মাননীয় স্পীকার

আপনাকে ধন্যবাদ। বিগত ১৭ আগস্ট দেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে একই সময়ে যে বর্বরোচিত হামলা হয়- আমরা তার নিন্দা করেছি। বোমা হামলাকারীদেরকে দেশ, গণতন্ত্র এবং ইসলামের শত্রু হিসেবে অভিহিত করেছি। সরকার তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। ইতোমধ্যেই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অনেকেই গ্রেফতার হয়েছে। তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে দায়ী করা কোন দায়িত্বশীল কাজ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও প্রধান বিরোধী দল আর তাদের দোসরগণ প্রতিনিয়ত ঘটনার দায়-দায়িত্ব সরকারের উপর এবং সরকারের শরীক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর ওপর চাপানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের সমর্থক মিডিয়ার একাংশও যেনতেন প্রকারে আমাকে এবং জামায়াতে ইসলামীকে জড়ানোর অপকৌশলে লিপ্ত।

মাননীয় স্পীকার

আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘটনার সাথে সাথে মন্তব্য করেন, যেসব আলেম চারদলীয় জোট ত্যাগ করেছেন তাদের ফাঁসানোর জন্য জামায়াতের তত্ত্বাবধানে বোমা হামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ এর ইনকিলাবে প্রকাশিত বক্তব্যে তিনি বলেছেন, "সরকার জামায়াত বিরোধী আলেমদের নির্যাতন করছে।" তার দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক সাহেব বলেছেন, "নিজামীকে রিমাণ্ডে নিলে বোমা হামলার প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে আসবে" (যুগান্তর ১৯-৯-০৫)। বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেছেন, "নিজামীর বাড়িতে রেইড দিলেই পুলিশ বাংলা ভাই ও শায়খ আবদুর রহমানকে পেয়ে যাবে।" (আজকের কাগজ, ১২-০৯-০৫)। এভাবে প্রতিদিন আওয়ামী নেতৃবৃন্দ এবং তাদের দোসরগণ অসত্য বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। যা প্রকৃত ঘটনা ও ঘটনার নায়কদের সুকৌশলে আড়াল করার একটি অপপ্রয়াস বৈ আর কিছুই নয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসরগণ নিজেরাও ভাল করে জানেন যে, জামায়াতে ইসলামী এ ধরনের কাজে জড়িত থাকতে পারে না। জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে কেউ এমন একটি দৃষ্টান্তও দিতে পারবে না, যেখানে জামায়াত কোন প্রকার সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। তাদের আমলে সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের একটি তালিকা করা হয়েছিল। সেখানেও তারা জামায়াতে ইসলামীর কাউকে তালিকাভুক্ত করতে পারেননি। তাদের শাসনকালে উদীচীর অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে সকল বোমা হামলার সাথে জামায়াতে ইসলামীকে জড়িত করার চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এরপরেও তাদের এই প্রচারণা অব্যাহত রাখার কারণ হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাননীয় স্পীকার

আমি মনে করি তাদের এহেন প্রচারণার লক্ষ্য চারটি ঃ

এক. আওয়ামী লীগ মনে করে চারদলীয় জোটের কারণেই তারা ক্ষমতার বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছে। অতএব, ক্ষমতার যেতে হলে যেনতেন প্রকারে জোট ভাঙ্গতে হবে। আর জোট ভাঙ্গার জন্যে সরকার এবং জামায়াতকেই তারা তাদের সকল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বানিয়েছে। সম্প্রতি তাদের দোসর এক নেতা বলেছেন, জামায়াতকে যত ঘায়েল করা যাবে সরকার নাকি ততই দুর্বল হবে।

দুই. এ ধরনের বানোয়াট ও ভিত্তিহীন প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে তারা জোটের প্রধান শরীক দল বিএনপিকে তথাকথিত মৌলবাদের ও জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত করে বাইরের প্রভুদের আশীর্বাদ পেতে চায়।

তিন. ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আওয়ামী লীগ ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে দুই-দুইবার ক্ষমতায় এসে ইসলামের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মুছে ফেলার চক্রান্ত করেছে। তাদের এ চক্রান্ত বাস্তবায়নের পথে ইসলামী দলগুলোকে বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীকে প্রধান বাধা মনে করে বলেই জামায়াতের ভাবমর্যাদা নষ্ট করে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যেই তারা এ জঘন্য অপপ্রচারের আশ্রয় নিচ্ছে।

চার. বোমা হামলা ঘটনার তদন্ত চলছে। ১৭ আগস্টের ঘটনার নিষিদ্ধ ঘোষিত জামা'আতুল মুজাহিদীন নামে তথাকথিত একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র পাওয়া গেছে- সম্ভবত তাদেরকে আড়াল করার মধ্যেই আওয়ামী লীগের কোন রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত আছে। সে কারণেও জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর কূটকৌশলের অংশ হিসেবে তারা এটাকে সহায়ক মনে করতে পারে।

মাননীয় স্পীকার

আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি তারা জামায়াতকে সরাসরি জড়িত করতে ব্যর্থ হয়ে এখন কে কার আত্মীয় বা কে কবে কোথায় কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল তা আবিষ্কার করে গায়ের জোরে "জামায়াত জড়িত" একথা প্রমাণ করার অপকৌশল চালাচ্ছে।

কিন্তু মাননীয় স্পীকার, তারা যদি জ্ঞান পাপী না হন, তাহলে নিজেরাই সাক্ষী- এই দেশে মুসলিম লীগের নেতার ছেলে বাম রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়েছে। বাম ছাত্র রাজনীতির লোকেরা এখন ডানপন্থী রাজনৈতিক শিবিরে অবস্থান নিয়েছে। আপন দুই ভায়ের রাজনীতি, সংস্কৃতি চিন্তাতেও ফারাক আছে। অতএব, এই কূটকৌশলও কোন কাজে আসতে পারে না। বরং তাদের এই কৌশলই প্রমাণ করছে জামায়াতকে জড়িত করার বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণই তাদের কাছে নেই।

মাননীয় স্পীকার

জামায়াতে ইসলামী জন্মলগ্ন থেকে নিয়মতান্ত্রিক, সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জামায়াত এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল এবং প্রায় সকল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। জামায়াত সংসদীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য ভান্ডার ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে। এর কোন একটি বইয়ের কোন অধ্যায় এমনকি কোন বাক্য থেকেও কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি সমর্থন বা অনুমোদনের প্রমাণ দিতে পারবে না। ইসলাম কোন সন্ত্রাসবাদ বা বল প্রয়োগের নীতি অনুমোদন করে না। এ জন্যে সারা দুনিয়ার ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামের নাম নিয়ে যারা সন্ত্রাস করছে তাদেরকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং ইসলামের দুশমনদের ক্রীড়নক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আমরাও পরিষ্কার বলতে চাই, ইসলামের নাম নিয়ে যারা এই জঘন্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত তারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করতে চায় এবং সেই সাথে বাংলাদেশকে তথাকথিত

মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের আখড়া প্রমাণ করে বাইরের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চায়। তাদের সাথে ইসলামের এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত-প্রতিষ্ঠিত কোন ইসলামী দল বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক থাকতে পারে না। জামায়াতে ইসলামীর সাথে তো তাদের সম্পর্কের কোন প্রশ্নই উঠে না।

আমরা তাদের এই জঘন্য অপপ্রচারের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই এবং ন্যক্কারজনক প্রপাগাণ্ডার লক্ষ্য যে, প্রকৃত বোমা হামলাকারীদের আড়াল করে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করা ছাড়া আর কিছুই নয়- সে ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে এই মহান সংসদকে এবং মহান সংসদের মাধ্যমে দেশবাসীকে অবহিত করে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ।

৮ম জাতীয় রুকন সম্মেলন ২০০৬

২০০৬ সালের ০৬ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ৮ম জাতীয় রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা নিম্নরূপ-

সম্মানিত আমীরে জামায়াতের নির্দেশক্রমে আমি আজ এই রুকন সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইতোমধ্যে এই বিষয় সম্পর্কে আপনারা শুনে থাকবেন। দু'টি কারণে আমার কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হলো আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে;[১৬] দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে যে অবস্থানে আছে সে অবস্থানে থাকার কারণে।

জামায়াতের রুকন ভাই হই কিংবা বোন হই, ছোট দায়িত্বশীল হই কিংবা মাঝারি দায়িত্বশীল হই, জামায়াতে ইসলামীকে দেশের জনগণের কাছে উপস্থাপনের জন্যে আরও বেশী ইতিবাচক, বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক ভূমিকা আমাদের পালন করা প্রয়োজন। যদি আমরা বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক দিকগুলো বলিষ্ঠতার সাথে এবং পরিপক্কতার সাথে তুলে

[১৬] এটি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ৮ম কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে "জাতীয় নির্বাচন ও আমাদের করণীয়" বিষয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের বক্তব্য।

ধরতে সক্ষম না হই, তাহলে জনগণের কাছ থেকে আমরা যে আস্থা অর্জন করতে চাই সে আস্থা অর্জনে আমরা হয়ত ততটা সফল হবো না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এখনকার আলোচনার মাধ্যমে আমি আশা করি আমাদের নিজেদের মধ্যে একটি চেতনা ও উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং আরো বেশী করে জেনে বুঝে আমরা ভূমিকা পালন করতে পারবো। আমি আমার আলোচনার প্রথম পর্যায়ে যা বলতে চাই তার একটি বড় অংশ সম্মানিত আমীরে জামায়াত উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন। তা হলো বর্তমান জোট সরকারের অভূতপূর্ব কতগুলো সাফল্যের কথা। ব্যাখ্যা ছাড়াই আমি এখানে কয়েকটি সাফল্যের কথা বলতে চাই।

১. **সন্ত্রাস দমন ঃ** জোট সরকার এখানে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে সরকার কোন দল মতের দিকে তাকায়নি। মানুষের জীবন এবং সম্পদ বিনষ্ট করার জন্যে যারাই ভূমিকা পালন করেছে, সরকার তার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদেরকে দমনের ব্যবস্থা করেছে একথা সবাই স্বীকার করবে। সাম্প্রতিক কালে এতখানি সন্ত্রাস মুক্ত অবস্থা বাংলাদেশে ছিল না।

২. **দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নকল বন্ধ করা ঃ** একটি জাতির মেরুদন্ড হচ্ছে শিক্ষা। সেখানে যদি অবাধভাবে নকল চালু থাকে তাহলে সে জাতিকে কখনো দাঁড় করানো সম্ভব নয়। নকল এতখানি শিকড় গেঁড়ে বসেছিল যে, যাদের দায়িত্ব হচ্ছে নকল বন্ধ করা তাদের সামনেও নকল করাটা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়নি। একজন পিতা বা একজন মাতার নিকট সন্তানের নকল করাটা জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হওয়ার কথা, কিন্তু কখনও কখনও ভিন্ন রকম অবস্থা পরিলক্ষিত হতো। নকল করে যদি পড়ালেখা করা হয় পরবর্তীকালে রাষ্ট্র পরিচালনায়, সরকার পরিচালনায়, সমাজ পরিচালনায়, দল পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রেই এই নকল একটা বড় ধরনের অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়।

   একটি দল পরিচালনা সহজ কথা নয়। এখানে যেমন সৎ ও চরিত্রবান লোকের প্রয়োজন তেমনি দক্ষ এবং যোগ্য লোকের প্রয়োজন। নকল করে নকলবাজরা কখনো দক্ষ এবং যোগ্য হতে পারে না। রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সততা ও দক্ষতার প্রয়োজন আরো বেশী। বর্তমান জোট সরকার এ ব্যাপারে একটি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির ব্যাপারেও

যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে বছরের পর বছর সেশন জট অভিশাপ আকারে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল, সেখানে গত সাড়ে চার বছরে নতুন করে সেশন জট হয়নি বরং আগের জট কিছুটা খুলে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভপর হয়েছে।

৩. **শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে ঃ** অনেক দেশ এখন বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। অনেক প্রস্তাব এসেছে। অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, অনেকগুলো বিবেচনার মধ্যে আছে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ চিনি জনগণের জন্য প্রয়োজন তার বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু যতটুকু চিনি উৎপাদন হয়। এই চিনির কারখানাগুলো এতদিন পর্যন্ত শুধু লোকসানই দিয়ে এসেছে। আল্লাহর রহমতে এবারই প্রথম চিনি কলগুলো বাংলাদেশে লাভজনক একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

৪. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা হয়েছে ঃ** বিশেষ করে যারা চরম দারিদ্র্য সীমার মধ্যে বসবাস করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জোট সরকার বিগত বছরগুলোতে টার্গেট নিয়ে তাদের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ, বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, অনুদান প্রদান, ক্ষুদ্র লোন এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করেছে।

৫. **মাথাপিছু আয় বেড়েছে ঃ** ২০০১-২০০২ অর্থবছরে মাথা পিছু আয় ছিল ৩৪০ মার্কিন ডলার। আর এখন মাথাপিছু আয় দাড়িয়েছে ৪৮২ মার্কিন ডলার। তার মানে সরকারের এই সাড়ে চার বছরে মাথা পিছু গড় আয় বেড়েছে প্রায় দশ হাজার টাকার মত। অর্থাৎ এই পরিমাণ দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে ফ্রি ইকোনোমিতে, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে যেখানে অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ দেয়া হয় সেখানে সরকারের দায়িত্ব মূলত: দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কারণ বিশ্বটা এত ছোট হয়ে এসেছে যে, এক জায়গার দ্রব্যমূল্য আরেক জায়গার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ২০০১-২০০২ সালে যে পরিমাণ পেট্রোল আমাদের কিনতে হতো ৪০০ কোটি টাকা দিয়ে, সেই পরিমাণ পেট্রোল এখন আমাদেরকে কিনতে হয় ১৬০০ কোটি টাকা দিয়ে। এই তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের জনগণ দায়ী নয়, এই তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য জোট সরকার দায়ী

নয়। আপনারা জানেন এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে ইরাক যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলোতে তেল উৎপাদন হয় সে দেশগুলোর তেল উৎপাদনকে ব্যাহত করা হয়েছে। সংরক্ষণ এবং সরবরাহকে ব্যাহত করা হয়েছে, তেল বিশুদ্ধকরণকে ব্যাহত করা হয়েছে যার চাপ আজকে আমাদের উপরে পড়েছে। আমাদের দেশে যে তৈল বিক্রি হয় ৫৭ সেন্টে, এই তৈল ভারতে বিক্রি হয় ১৪৪ সেন্টে অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় ডাবল দামে। আমি কথাটা এই জন্যেই বলছি যে, গ্লোবাল সিচ্যুয়েশনে পৃথিবী ছোট হয়ে আসার কারণে, পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজ হওয়ার কারণে আজকে এক দেশের অর্থনীতি, দ্রব্যমূল্য, মার্কেট, বাজার ব্যবস্থা আরেক দেশের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। এটাকে জোর করে উল্টো দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

রুকন ভাই ও বোনেরা

আপনারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিফাইড ও ডিগ্রীর পাশাপাশি জামায়াতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত জনগোষ্ঠি। এই জন্য আপনাদের কাছ থেকে বাস্তব প্রতিনিধিত্ব সকলে আশা করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

২০০১-২০০২ সালে এই সরকারের প্রথম বাজেট। উন্নয়ন খাতের বাজেট তখন আমরা করেছিলাম শতকরা ৫৮ ভাগ টাকা বিদেশ থেকে এনে। আল্লাহর রহমতে জনগণের সহযোগিতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট শতকরা ৫৮ ভাগ ইন্টার্নাল সোর্স থেকে হয়েছে। দেশের সম্পদের মাধ্যমে আমরা আমাদের সিংহভাগে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছি। অর্থাৎ বাংলাদেশে সাড়ে চার বছরে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ১৫ ভাগেরও বেশী। এই কথাগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই যে সফলতা, সরকারের এই সফলতায় আমরা প্রথম অংশীদার হয়েছি। এই সফলতার পেছনে নিঃসন্দেহে জামায়াতের নিরলস প্রচেষ্টা এবং জামায়াতের লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনদের পরিশ্রম ভূমিকা রেখেছে। এই সাফল্যের জন্য দেশের ১৪ কোটি মানুষের অংশ হিসাবে জামায়াতে ইসলামী এখানে তাদের ইতিবাচক ভূমিকার সাফল্য দাবি করতে পারে।

এর সাথে সাথে জামায়াতে ইসলামী বিগত সাড়ে চার বছরে ক্ষমতার অংশীদার হিসাবে আরও যে কয়েকটি ভূমিকা পালন করেছে তা হচ্ছে;-

১. **বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনাল পলিটিক্স** ঃ সাংবিধানিক রাজনীতিকে স্থিতিশীল করার জন্য, সাংবিধানিক রাজনীতিকে দৃঢ় করার জন্য

জামায়াতে ইসলামী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনকে কলুষিত করার জন্যে, অসাংবিধানিক রাজনীতি এই দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য গত সাড়ে চার বছরে বারবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন কূটকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দোয়ায় অত্যন্ত সচেতন থেকে অসাংবিধানিক রাজনীতি যাতে বাংলাদেশের মাটিতে আবার চালু হতে না পারে সেজন্য রাজনৈতিক অঙ্গনে গত সাড়ে চার বছর জামায়াত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে।

২. **সংসদীয় রাজনীতিকে সচল রাখার চেষ্টা ঃ** দেশের সংসদীয় রাজনীতিকে অচল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। আপনারা ভাল করে জানেন (৮ম সংসদ) ইলেকশনের পর পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রধান বিরোধী দল প্রথমে তাদের স্পীকারকে দিয়ে আমাদের শপথ বিলম্বিত করেছিল। এখানে ব্যর্থ হয়ে তারা বলেছে আমরা শপথ নেব না, এরপর শপথ নিল। তারা বলল আমরা সংসদে যাব না, পরে সংসদে গিয়েছে। এরপর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তারা সংসদ বয়কট করেছে। তারপর যখন অনুপস্থিতির কারণে দেখল তাদের সদস্য পদ শূন্য হয়ে যাবে তখন লোক দেখানোর জন্য এবং তারা যাদেরকে খুশী করতে চায় সেই মহলকে খুশী করার জন্য তারা পার্লামেন্টে গিয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার পার্লামেন্টে গিয়ে তারা রুলস অব প্রসিডিউর অর্থাৎ সংসদের কার্য প্রণালী বিধি লংঘন করার ব্যাপারে অত্যন্ত জঘন্য নজির স্থাপন করেছে। সেখানে জামায়াতে ইসলামী মহিলাসহ বর্তমানে ২০ জন মাননীয় সংসদ সদস্য রুলস অব প্রসিডিউর অনুসরণ করে এক যুগান্তকারী নজিরই শুধু স্থাপন করেনি বরং সংসদকে সচল রেখে আইন পাস করতে সহযোগিতা করেছে। বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সংসদকে সচল রাখার চেষ্টা করেছে। যার ফলে তাদের পক্ষ থেকে সংসদকে অচল করার যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল সেটাকে আমরা বানচাল করতে সক্ষম হয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর এই ভূমিকা ইতিহাসে লেখা থাকবে বলে আমি মনে করি।

৩. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সম্মান এবং ধৈর্যের পরিচয় ঃ** আপনারা দেখেছেন গত সাড়ে চার বছরে বারবার গণতন্ত্র বিরোধী ষড়যন্ত্র

হয়েছে। আমরা সাড়ে চার বছর ক্ষমতার অংশীদার ছিলাম এটাকে কোন কোন মহল অপরাধ মনে করছে। জামায়াতে ইসলামীর ক্ষমতায় অংশগ্রহণ প্রধান বিরোধী দলের নিকটও বড় অপরাধ। কোন কোন শক্তিধর মহলের দৃষ্টিতেও অপরাধ। তারা একযোগে, যুগপৎভাবে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রযাত্রাকে বানচাল করে দেয়ার জন্য অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, আইন হাতে তুলে নিয়েছে এবং ভাংচুর, নৈরাজ্য, হত্যা, সন্ত্রাসের আমদানি করে দেশের পরিবেশকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদেরকে উত্তক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দকে উত্তক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রুকন ভাই-বোনদেরকে উত্তক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে আমরা উত্তেজিত হয়ে কিছু অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করি সে জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। মিডিয়ার মাধ্যমে তিলকে তাল এবং সত্যকে গোপন করে মিথ্যাকে সত্য বলে তুলে ধরে জামায়াতে ইসলামীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ তারা জামায়াতে ইসলামীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কার্যক্রমকে কখনই মেনে নিতে পারেনি।

আল্লাহর রহমতে আমরা সে ষড়যন্ত্র পাড়ি দিয়ে আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বলতে পারি, সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের মেয়াদ ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত। ২৮ অক্টোবর ইনশাআল্লাহ আমরা কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করব। আমরা আশা করি ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

৪. **অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে ঃ** আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে বলতে পারি ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে নিরপেক্ষ এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু পরিবেশে, আনন্দমুখর পরিবেশে, উৎসবের সাথে নির্বাচন হবে। কোন শক্তির ক্ষমতা নেই নির্বাচনের এই পরিবেশকে ব্যাহত করতে পরে। জনগণের অধিকারকে ছিন্ন করতে পারে। কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক আর নাই করুক এটা তাদের ব্যক্তিগত বা দলীয় ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করার মত কোন শক্তি বাংলাদেশে আছে বলে আমরা মনে করি না। এই

কথা জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন থেকে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই। আমরা তাদের চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছি। সাংবিধানিক রাজনীতি চালু করার মাধ্যমে ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে জাতীয় নির্বাচন হবে আপনারাও নিশ্চয় তার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

৫. **সরকারে অংশগ্রহণ করে সততা এবং যোগ্যতার পরিচয় ঃ** আমি আগেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমাদের ভূমিকা উল্লেখ করেছি। আমরা সরকারের নতুন পার্টনার হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের দোয়ায় সরকারে অংশগ্রহণ করে 'জামায়াতে ইসলামী একটি অযোগ্য দল', জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বোধহয় তা প্রমাণ হয়নি। বরং দুই দিক থেকে জামায়াতে ইসলামী সততা এবং যোগ্যতার একটি সফল দল হিসেবে আজ বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বীকৃত। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংসদে যেমন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকেন তেমনি তাদের নিজ নিজ এলাকায় সততা এবং যোগ্যতার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আপনারা জেনে খুশী হবেন আমরা হিসাব নিকাশ করে দেখেছি গত চার-সাড়ে চার বছরে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়নমূলক যে কর্মকান্ড করেছেন এই উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অতীতের তুলনায় একটি নযীর বিহীন উন্নয়ন কর্মকান্ড। আমি বিশ্বাস করি আগামী ২০০৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে ঐ সমস্ত এলাকার জনগণ তার উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করবে।

৬. **বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে এর ভাব মর্যাদা বৃদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করা ঃ** আপনারা জানেন জোট সরকারের এ সময়ে ইসলাম এবং উম্মাহ বিরোধী ষড়যন্ত্র বার বার নস্যাৎ করা হয়েছে। আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, নাইন ইলেভেনের ঘটনা, এই ঘটনার সাথে বাংলাদেশের মত গরিব দেশগুলো জড়িত নয়। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই ঘটনার পর পর বাংলাদেশের মত দেশগুলোর উপর একটি প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই কয়েক বছরে আপনারা আফগানিস্তানে যুদ্ধ দেখেছেন।, ইরাক যুদ্ধ দেখেছেন, আরো অনেক কিছু দেখেছেন। কিন্তু আমি এটা স্পষ্ট করে বলবো, আজকে যে জোট সরকার বেগম খালেদা জিয়া এবং মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে, এই জোট সরকার

এখানে সকল প্রকার রক্তচক্ষুকে পাশ কাটিয়ে, সকল প্রকার প্রতিকূল আবহাওয়াকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। এই দেশ তার বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি, জাতীয় উন্নয়ন অবকাঠমো, রাজনীতি, কৃষ্টি-কালচার সবকিছুই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে করবে। অন্যের চাহিদানুযায়ী করবেনা। সাড়ে চার বছরে কমপক্ষে আমরা ইতিবাচক তেমন কিছু যোগ করতে না পারলেও আমরা যে আপোষকামী কোন শক্তি নই, জোট সরকার যে আপোষকামী নয় বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব স্বকীয়তায় ঐতিহ্যমন্ডিত একটি সরকার এটা প্রমাণ হয়েছে। এ জন্য বিদেশে বাংলাদেশের সমাদর বেড়েছে। আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কয়েকটি দেশ সফর করার এবং সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার। আমি দেখেছি আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই ইতিবাচক দিকগুলোর কারনেই জোট সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা দেশ-জাতি, ইসলাম এবং উম্মাহর স্বার্থে অপরিহার্য। এখানে যারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করতে চায়, তারা মনে করে, বাংলাদেশ এভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পিছনে, বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনীতিকে দৃঢ় করার ব্যাপারে, বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিকে সচল করার ব্যাপারে, বাংলাদেশের আত্মনির্ভরশীলতার পিছনে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন ও সাফল্যের পিছনে, জামায়াতে ইসলামী মূল নিয়ামক শক্তি। এই জন্য জাতি, দেশ, ইসলাম ও উম্মাহ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা জামায়াতে ইসলামীর অবস্থানকে দুর্বল করতে চায়।

জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান

গোটা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা হচ্ছে এদেশে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। আর ক্ষমতাসীন সরকারের জামায়াতে ইসলামী হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। এই যে অবস্থান, এ অবস্থানকে তারা দুর্বল করতে চায়। আমি স্পষ্ট বলতে চাই, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী নির্বাচনে যাতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান দুর্বল হয়। আগামী নির্বাচনে তারা জামায়াতে ইসলামীর বিজয়কে কঠিন থেকে কঠিনতর করতে চায়। এই জন্য তারা চতুর্মুখী আক্রমণ করছে। এই আক্রমণ তারা তীব্রতর করার চেষ্টা করবে। এটা তাদের লক্ষ্য এবং তাদের সিদ্ধান্ত।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমরা কি করবো? আমরা কি এই চ্যালেঞ্জ জানতে পেরে হতাশ হবো? আমরা কি এই চ্যালেঞ্জ জানতে পেরে দুর্বল হবো? আমরা কি আপোষের পথে যাবো? না আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আগামী নির্বাচনে অংশ নেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতে জামায়াতে ইসলামী তার দীর্ঘ ইতিহাস অনেক চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করেছে। জামায়াতে ইসলামীর উপর অনেক যুলুম হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর কণ্ঠ চেপে ধরার মত অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অনেক কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কিন্তু মহান রাব্বুল আ'লামিন, যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক, যার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই আমরা জামায়াতে ইসলামী করি। সেই আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে জামায়াতে ইসলামী তার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পেরেছে।

আমরা বিশ্বাস করি এই চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। যখনই ইসলামের জন্য সোচ্চার কণ্ঠ ও বলিষ্ঠ আওয়াজ উঠবে, যখনই ইসলামের কথা দিন দিন মানুষের হৃদয়কে জয় করবে, মানুষ এই দ্বীনের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে এই দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত হবে তখনই এ ষড়যন্ত্র বাড়বেই, আমরা তা জানি, জানি বলেই অতীতে যেমন আমরা আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা করে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি। ইনশাআল্লাহ ২০০৭ সালের নির্বাচনের এই চ্যালেঞ্জকে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে আমরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো এবং আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে আরেকধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই জন্য আমি বিনীতভাবে কয়েকটি করণীয় আপনাদের সামনে বলতে চাই। জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত আমি যতটুকু বললাম, দিন দিন আরো আপনারা বুঝতে পারবেন, জানতে পারবেন। কারণ আপনারা মাঠের কর্মী, আপনারা ময়দানের কর্মী, আপনাদের রয়েছে জনসম্পৃক্ততা। আপনারা যেমনি দেশকে ভালোবাসেন, তেমনি দেশের জনগণকে ভালোবাসেন। আপনারা যেমনি দেশের অগ্রগতি চান, তেমনি ইসলামের প্রতি রয়েছে আপনাদের গভীর ভালোবাসা। আপনারা ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখতে চান। সেই কারণে যতটুকু বুঝ আমাদের সৃষ্টি হলো বা হয়েছে এটাকে আরো বেশী পরিপুষ্ট করার জন্য এটাকে আরো বেশী পরিপূর্ণ করার আহ্বান জানিয়ে আমি বারটি করণীয় সম্পর্কে আপনাদেরকে বলতে চাই।

এক. সকল স্তরের রুকন ভাই-বোনদের এক নাম্বার করণীয়- এখন থেকে নির্বাচনে বিজয় লাভ করাই হবে আমাদের সাধনা ও ধ্যান। ২০০৭ সালের নির্বাচনের কথা আমি বলছি, আমীরে জামায়াত বলেছেন। ঐ নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে আমাদের চেষ্টা আছে, নিয়মিতভাবে জাতীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক হচ্ছে। আমরা পর্যালোচনা করছি। ময়দানের অবস্থা মূল্যায়ন করছি। আমরা আমাদের অবস্থান বুঝার চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের শরীকদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের সামনে দেশ ও জাতির স্বার্থ আছে যা আমীরে জামায়াত বলেছেন। সবকিছুকে সামনে রেখে আমরা যতগুলো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এখন থেকে সেই আসনগুলোকে বিজয়ী করাই হবে আমাদের সাধনা এবং ধ্যান। সাথে সাথে জোটের অন্যান্য প্রার্থীদেরকে বিজয়ী করার জন্যও ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

দুই. এই কয়েকমাস, জুন মাসে আপনাদের সংগঠনকে গুছিয়ে নেয়ার পর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাবেন। ২০০৭ এর জানুয়ারি মাসে ইলেকশন হবে ইনশাআল্লাহ।[১৭] আবার এর মধ্যে দু'টি ভাগ আছে। অক্টোবর পর্যন্ত এক ধরনের পরিস্থিতি। অক্টোবরের পর কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আরেক ধরনের পরিস্থিতি। দুই রকমের পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসবে। জুলাই থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত এক রকম। আবার ২৮ অক্টোবর থেকে ইলেকশনের আগের দিন পর্যন্ত আরেক রকম। এই ছয়টা মাসে ব্যাপক গণসংযোগ করতে হবে। গণসংযোগ বলতে আমি ব্যক্তিগত গণসংযোগ বুঝাচ্ছি, গণসংযোগ বলতে জামায়াতের পক্ষ থেকে গণসংযোগ বুঝাচ্ছি, গণসংযোগ বলতে জোটের পক্ষ থেকে গণসংযোগকে বুঝাচ্ছি। তিন ধরনের গণসংযোগকে আমি বুঝাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে গণসংযোগ, জামায়াতের পক্ষ থেকে গণসংযোগ, জোটের পক্ষ থেকে গণসংযোগ, এই ছয় মাস হবে প্রকৃত পক্ষে গণসংযোগের ছয় মাস।

তিন. কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। আপনাদের কাছে পরিষ্কার- আমি কাদেরকে কর্মী বুঝাচ্ছি। আর এখানে যে কর্মীর কথা বলা হচ্ছে। তারা নির্বাচনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে আমি সেই কর্মীর কথা বলছি। দুই ধরনের কর্মী সংখ্যা আমাদেরকে বাড়াতে হবে। জেলা আমীরগণ জেলা মজলিসে শূরার বৈঠকে, থানার বৈঠকে, কর্মপরিষদের বৈঠকে বিলম্ব না করে এই কর্মী বানানোর অভিযান আপনাদের যার যার মত করে শুরু করতে হবে। এবং এই কর্মী, ঐ যে

---

[১৭] প্রায় দু'বছর পরে ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ ৯ম সংসদ নির্বাচন হয়।

গণসংযোগের কথা বললাম সেই গণসংযোগেও যাতে সক্রিয় হয় সেই ধরণের কর্মী বানাতে হবে। জেলা মজলিসে শূরা, জেলা কর্মপরিষদ, জেলা সংগঠনের বৈঠকে এখন মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, মূল আলোচ্য বিষয়ই হবে ২০০৭ সালের নির্বাচন।

চার. নির্বাচনী এলাকা কেন্দ্রীক জেলার যাবতীয় কাজ একিভূত ও কনসেন্ট্রেটেড করতে হবে। প্রয়োজনে সাংগঠনিক কাজ পুনর্বিন্যাস করে নিতে হবে। আপনারা বসে ঠিক করবেন এই ছয়টি মাস গতানুগতিক রুটিন ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কতটুকু পরিবর্তন করবেন। আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে নির্বাচনে আমাদেরকে জিততে হবে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আপনাদের যা করা দরকার তা হলো- আমাদের সাপ্তাহিক বৈঠক- একটা হয় সাংগঠনিক, দুটি হয় দাওয়াতী, আকেরটি তারবিয়াতী। প্রয়োজনে তিনটা হবে দাওয়াতী, একটা হবে সাংগঠনিক। সাংগঠনিক কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণের কাজ নিয়ে আসতে হবে। ঠিক তেমনি শূরার বৈঠক, নিয়মিত বৈঠক যা হয়, মূল এজেন্ডা থাকবে নির্বাচন। এইভাবে প্রয়োজনে আমাদের সাংগঠনিক কাজকে পুনর্বিন্যাস করে ফেলতে হবে। নির্বাচনটাই হলো আমাদের এক নাম্বার কাজ। সম্মানিত জেলা আমীরগণ এখানে আছেন, রুকন ভাই- বোনেরা এখানে আছেন। নতুন করে সার্কুলার দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। আপনাদের মনে থাকার কথা ১৯৯১ সালে ১৮টি আসন, ১৯৯৬ সালে ৩টি আসন, আবার ২০০১ সালে ১৭টি আসন। একেকটি পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য এক এক রকম ফলাফল হয়েছে এবং আমাদের অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

কখন কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে এটা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। সেজন্য কোন জায়গা থেকে আমরা বিজয়ী হলাম এটা বড় কথা নয়। জামায়াতের অবস্থানটাই হচ্ছে বড় কথা। আমরা যেখান থেকে যেভাবে পারি আমাদের আসনকে বিজয়ী করে অবস্থানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। এটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। কোন প্রকার ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা, এলাকা ভিত্তিক সংকীর্ণতায় এখানে ভুগলে চলবে না। উদার এবং আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করতে হবে, পরিচ্ছন্ন করতে হবে। যাতে দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা আমাদের অবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা যেখানে আছেন সেখান থেকেই আমরা সেই ভূমিকা পালন করতে পারি। কোন প্রকার ওয়াসওয়াসা, কোন প্রকার সংশয়, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমাদের অগ্রযাত্রার পথে যাতে কোন বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে

না পারে সেইভাবে আমাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে। জেলা সংগঠন সেইভাবে পাহারাদারের ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

পাঁচ. সরকারের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আমি সরকারের কতগুলো সাফল্যের কথা বললাম, এগুলো উল্লেখ করে এই ভাবমূর্তি রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা সরকারের অংশীদার। সেজন্য ইতিবাচক ভূমিকা আমাদেরকে পালন করতে হবে। যে কারণে আমি কিছু পয়েন্ট দিয়েছি। আমীরে জামায়াতের বক্তব্যের মধ্যেও অনেক পয়েন্ট এসেছে। আমরা বিভিন্ন কর্মীসভা, জনসভাতেও অনেকগুলো তথ্য আপনাদেরকে দেয়ার চেষ্টা করি সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

ছয়. জামায়াতের ভূমিকা উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে হবে। আমি জামায়াতের ভূমিকার কথা বলেছি। সেগুলোই হুবহু বলতে হবে। জামায়াতের উজ্জ্বল ভূমিকার ব্যাপারে আমি ছয়টা পয়েন্ট বলেছি। সেই পয়েন্টগুলোই আপনারা মানুষের কাছে তুলে ধরবেন।

সাত. তথ্য সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য রেডিও. টিভি. পত্রিকার ভূমিকা আমাদেরকেই পালন করতে হবে। অমুক পত্রিকা আমাদের খবর ছাপে না, ওখানে আমাদের কভারেজ নাই, এই সমস্ত আফসোস করে কোন লাভ নেই। আমরা কামনা করি এদেশে দিন দিন বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা প্রাধান্য পাক।

তাদের ভূমিকা দেখে আমরা নিজেরা নিরব ভূমিকা পালন করব না। তথ্য সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য আমরা নিজেরাই রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের ভূমিকা পালন করব। এজন্য সকল রুকন ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এজন্য দৈনিক সংগ্রামসহ প্রয়োজনীয় পত্রিকা নিয়মিত পড়তে হবে। দৈনিক সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর নিউজ পড়তে হবে। বিশেষ করে আমীরে জামায়াতের বক্তৃতা, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা। মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। আমরা সকল পত্রিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সকল পত্রিকার শুভ কামনা করি।

কিন্তু আমাদের দলের জন্য দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা জামায়াতের সিদ্ধান্ত, জামায়াতের নীতি, জামায়াতের অবস্থাটা স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরছে। অতিসম্প্রতি যে নৈরাজ্য, আমাদের গার্মেন্টস ব্যবসাকে বানচাল করে দেয়ার জন্য যে চক্রান্ত তার চিত্র দৈনিক সংগ্রামে এসেছে। কোটা প্রথা উঠে গেলে, প্রচার করা হয়েছিলো যে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসা হুমকির মুখে পড়বে। কিন্তু পড়ে নাই। কোটা প্রথা উঠে যাবার পরও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এই যে, বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা হচ্ছে, ফুটবল খেলার একুশ লক্ষ গেঞ্জি সাপ্লাই দেয়ার অর্ডার আছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এইটাকে যারা দেখতে পারে না তারা ষড়যন্ত্র করেছে, পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশকে যারা চিরদিন নিজেদের বাজার বানিয়ে রাখতে চায়, বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক তা যারা চায় না, বাংলাদেশকে যারা তাবেদার রাষ্ট্র বানাতে চায় তারাই অত্যন্ত কূটকৌশলের মাধ্যমে একটার পর একটা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাকে আপনাকে জানতে হবে। জনগণের কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে এবং দেশের জনগণকে সচেতন করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সাথে নিয়ে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা কোন শক্তিকে অন্তরায় সৃষ্টি করতে দেবনা। এই মনোভাব পোষণ করে আমাকে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে।

আট. সর্বোচ্চ আর্থিক ও সময় কুরবাণী করতে হবে। আর্থিক কুরবাণীর ক্ষেত্রে আপনারা নজির স্থাপন করেছেন। গত নির্বাচনে আপনারা অবিশ্বাস্য ভূমিকা পালন করেছেন। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য যারা জামায়াতে ইসলামীর অভ্যন্তরীণ বিষয় জানেনা। মহাসমাবেশ, উলামা সমাবেশ আপনারা সফল করেছেন। অনেকে ভাবে, জামায়াতে ইসলামী একটার পর একটা প্রোগ্রাম করে কিভাবে? আজকে যে ঐতিহাসিক রুকন সম্মেলন হচ্ছে এই রুকন সম্মেলনের প্রতিটি পয়সা রুকন ভাই-বোনদের ঘাম নিংড়ানো। এটা জামায়াতের বাইরে থেকে অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ এই দৃষ্টান্ত জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতির সামনে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত, বিরল দৃষ্টান্ত, অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত। এটা জামায়াতে ইসলামীর ভাই-বোনেরা বার বার প্রমাণ করেছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যারা এই সংগঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার জন্য শপথ নিয়েছেন, যারা জামায়াতকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন, যারা জামায়াতের মিশনকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তারা আগামী নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের বিরুদ্ধে যে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে সেই ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার জন্য যার যেখানে থেকে যতটুকু সময় দেবার প্রয়োজন সেই সর্বোচ্চ সময় দেবেন এবং আর্থিক সম্পদ যতটুকু দেয়ার প্রয়োজন তার সবটুকু দেবেন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে ফরিয়াদ করতে হবে- "আমরা তোমার কাছে হাজির হয়েছি তুমি আমাদের বাকি চাহিদা পূরণ করে দাও হে রাব্বুল আ'লামিন।"

নয়. ভোটার না হয়ে থাকলে ভোটার হতে হবে। ভোটার লিস্টভুক্ত হওয়া একটি কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা সবসময় চলবে। কেউ ভোটার না হয়ে থাকলে খোঁজ নিন, ভোটার হতে হবে।

দশ. যে পরিমাণ পোলিং এজেন্ট নির্বাচনে লাগে তার চেয়ে তিনগুণ পুরুষ এবং মহিলা এজেন্ট বাছাইকরে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করতে হবে। পোলিং এজেন্ট যা লাগে তার কমপক্ষে তিনগুন দিতে হবে। তিনগুণের নিচে না। কারণ যাদের মোকাবিলা করে আমরা ইলেকশনে বিজয়ী হতে চাই নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে তাদের ভরাডুবি হবে। তারা ভদ্রভাবে নির্বাচন করতে জানেনা, কিন্তু কিভাবে কূটকৌশল অবলম্বন করতে হয় এটা তারা ভালো করে জানে। এটা মোকাবিলা করতে পারবে পোলিং এজেন্ট, যদি তিনি সাহসী, যোগ্য, বলিষ্ঠ, সচেতন এবং চোখ-কান খোলা রাখতে পারেন। এজন্যই এই পয়েন্টটা আমি আপনাদের সামনে গুরুত্ব দিয়ে পেশ করলাম।

এগার. জোটের শরিকদের সাথে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সম্পর্ক আরও আন্তরিক এবং জোরদার করতে হবে। ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না এ দায়িত্ব শুধু জেলা আমীরের একার নয়। এ দায়িত্ব সকল রুকন ভাই-বোনদের। এ দায়িত্ব আমাকে-আপনাকে পালন করতে হবে।

বার. সার্বিক আনুকূল্য পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকতে হবে। মানুষ মাত্রই আমরা খুবই অসহায়। মানুষ না অতীত ভালো করে জানে, না বর্তমান জানে, না ভবিষ্যৎ জানে। মানুষ যে কথা বলে তার মধ্যেও সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা আছে। এটা কে পূরণ করবে? এটা পূরণ করবে মহান রাব্বুল আ'লামিন। আমরা একটা জিনিস পরিপূর্ণ করতে পারি সেটা হলো আমাদের আন্তরিকতা। এ আন্তরিকতার ক্ষেত্রে কেউ ভাগ নিতে পারে না। আমরা পরিপূর্ণ করতে পারি আমাদের নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও কেউ ভাগ নিতে পারেনা।

আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে আমাদের লক্ষ্যে সফল হতে চাই তাহলে সব কিছু করে আমাকে আপনাকে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করতে হবে নিয়মিতভাবে। বিশেষ করে শেষ রাতে। কিন্তু শেষ রাতে কার দোয়া কবুল হয় তা কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৭৭নং আয়াতে বলা হয়েছে।

অনেকগুলো ডেফিনেশন দেয়া হয়েছে ওরা "ধৈর্যশীল, নিজের বিপদ দেখেও ওরা সত্যপরায়ন, ওরা নিরহংকার, ওরা ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পরও সহজ-সরল জীবন-যাপন করে। ওরা ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পরও ওদের মধ্যে অহংকার স্পর্শ করতে পারে না। ওরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। ওরা সময় ব্যয় করে, ওরা চিন্তা করে, ওরা মেধা কাজে লাগায়, ওরা সম্পদ খরচ করে,

আর রাত্রির শেষভাবে উঠে মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে। ওরা তো তারা যাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে–

অর্থাৎ "ওরা তো তারা যারা কর্মরত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, বিশ্রামরত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।" (সূরা আলে ইমরান- ১৯১)

প্রিয় ভাইবোনেরা

আমরা যে জমিনে বসবাস করি, সে জমিনে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে, আযানের ধ্বনি উঠে। যে জমিনে মানুষদের হয়ত অর্থ এবং বিত্তের অভাব থাকতে পারে কিন্তু এ জমিনের মানুষদের হৃদয়ে রয়েছে প্রোজ্জ্বল ঈমান। এ জমিনের মানুষেরা লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা গড়ে তুলে নিজেদের পকেটের পয়সা দিয়ে। সেই জমিনে আমরা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করি। আল্লাহর দ্বীনকে যারা মিটিয়ে দিতে চায়, আল্লাহর দ্বীনের পথে যারা প্রতিবন্ধকরা সৃষ্টি করতে চায়, মসজিদের দেশ বাংলাদেশে যারা ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতিকে বন্ধ করতে চায়, যারা আমাদের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চায়, তাদের মোকাবিলায় ঐ আল্লাহর উপর ভরসা করে আমাদেরকে এগুতে হবে। আমরা বলব, "হে মহামহিম, রাব্বুল আ'লামিন তোমার উপর ভরসা করে আমরা নেমে পড়েছি মাঠে, তুমি আমাদেরকে তোমার রহমত এবং বরকতের ফেরেশতা দিয়ে ঘেরাও করে রাখো। ওদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তুমি আমাদের জন্য আকাঙ্খিত বিজয় এনে দাও।" এই কথা যেন আল্লাহর দরবারে আমরা আকুতি করে বলতে পারি এ আবেদনটুকু রেখে এবং ভাই-বোনেরা আপনারা কষ্ট করে যেভাবে আল্লাহর দ্বীনের মহব্বতের পরিচয় দিয়েছেন, যে কষ্ট আজকে আপনারা করলেন, তা সত্যই প্রশংসার দাবীদার। এটাকে অব্যাহত রেখে একটি সুন্দর বাংলাদেশের কল্পনা করে আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি, আমাদের রুকন সম্মেলন সেইভাবে আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দান করুক সেই কামনা করে আপনাদেরকে আরেকবার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ

৩ জুন, ২০০৬ শনিবার, ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ৮ম কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এম.পি'র প্রদত্ত সমাপনী ভাষণ ঃ

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাসতাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যিআতি আ'মালিনা মাঁইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লাল্লাহু ওয়া মাঁইয়ুদলিলহু ফালা হাদিয়ালাহ। ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু। লা নাবীয়া বা'দাহু। আল্লাহুম্মা আলহিমনী রুশদি ওয়া আয়িযনি মিন শাররি নাফসি।

জামায়াত নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত রুকন ভাই ও বোনেরা, গতকাল পর্যন্ত আবহাওয়া ছিল খুবই প্রতিকূল। আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ মেহেরবাণীতে গতকাল বিকেল থেকে আবহাওয়া এখনও অনুকূলে আছে। আমরা আশা করছি আমাদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পর রুকন ভাই-বোনেরা নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা আবহাওয়া ভাল রাখবেন। আল্লাহ তা'য়ালার এই মেহেরবানীর জন্যে শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নেই। তাঁর শিখানো ভাষা আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, বলার মাধ্যমেই শুকরিয়া আদায় করছি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই সম্মেলনে সংকীর্ণ জায়গায় রুকন ভাই ও বোনদের এই প্যান্ডেলের মধ্যে অসহ্য গরম তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে। সবরের একটি বড় রকমের পরীক্ষায় আমাদের ভাই ও বোনেরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। এজন্যে আমি তাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারবাদ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমরা অতীতে রুকন সম্মেলন ৩ দিনের কমে কোথাও করি নাই। ১৯৭৯ সালে হোটেল ইডেনের সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হয়। সেই সম্মেলনে আমাদের রুকন সংখ্যা ছিল ৪৪৮ জন। তখন ৩ দিন সেখানে অবস্থান করতে আমাদের অসুবিধা হয় নাই। এরপর আমরা লালবাগ রহমত উল্লাহ মডেল স্কুলেও রুকন সম্মেলন করেছি। অবশেষে পরপর কয়েকটি সম্মেলন আমরা করেছি গাজীপুরে জামেয়া ইসলামীয়ার মাঠ এবং তার আশে পাশের

জায়গা জমি নিয়ে।[১৮] ২০০২ সালে প্রায় ১০ হাজারের অধিক রুকন নিয়ে ১০ ও ১১ জানুয়ারী, ৭ম রুকন সম্মেলন আমরা সেখানেই করেছিলাম। তারপরও আমাদের কষ্ট হয়েছে।

২০০৪ সালে রুকন সম্মেলনের জন্যে চেষ্টা করেছি। জায়গা তালাশ করে আমরা শেষ পর্যন্ত রুকন সম্মেলনের জন্যে মুনাসিব কোন জায়গা বের করতে পারি নাই। আজকের ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের রুকন সম্মেলনও বোধ হয় আমাদের সবাইকে বলে দিচ্ছে, অতীতে যেভাবে তিন দিনের সময় নিয়ে যে পরিবেশে আমরা সম্মেলন করতাম অনুরূপ একটি সম্মেলন করতে হলে এই পল্টন ময়দানের চেয়ে দশগুণ বড় একটা জায়গা আমাদের জন্যে প্রয়োজন। ১০ ভাগের এক ভাগ জায়গায় প্রচণ্ড গরমে, ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আপনারা যে শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন এটা জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্যেরই একটি অংশ। আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই সেই সাথে আপনাদের এই ধৈর্য এবং শৃঙ্খলাবোধের জন্যে আমি গর্ববোধ করি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সামনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে সাধ্যমত আমাদের করণীয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি লিখিত এ বক্তব্য সামনে রেখে জেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ে জনগণের কাছে যেয়ে যারা বক্তব্য রাখেন, ময়দানে যারা বক্তব্য রাখেন তারা এর উপরে আরেকটু পড়াশোনা করে, আরেকটু আত্মস্থ করে, মুসলিম উম্মাহর কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের কথা এবং সেটা মোকাবিলার উপায়ের ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে, জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে আপনারা একটি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আমাদের সামনে "আদর্শ রুকন" শীর্ষক বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য দিয়েছেন। এটা ইনশাআল্লাহ বই আকারে পাবেন।[১৯] এগুলো রুকন হিসেবে আমাদের সামনে পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। আমি আশা করি আমরা এটা থেকে যথেষ্ট খোরাক পেয়েছি, সামনেও আমরা খোরাক পাওয়ার চেষ্টা করব।

---

[১৮] ৭ম রুকন সম্মেলনে রুকন সংখ্যা-১৩০২১, পুরুষ রুকন-১০৭৬৩, মহিলা রুকন-২২৫৮ জন।

[১৯] ইতিমধ্যেই এটা "আদর্শ রুকন" নামে জামায়াত প্রকাশনা থেকে বই আকারে ছাপা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর খুব লম্বা হয় নাই। তেমন উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন আমার হাতে আসেনি অতএব প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে খুব বেশী কথা বলার সুযোগ নেই। তারপরও যতটুকু হয়েছে, আমি আশা করি আপনাদের কাছে জামায়াতের আমীর হিসেবে জবাবদিহি করার এটি একটি ব্যবস্থা। আমি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেছিলাম, বিগত রুকন সম্মেলন ছিল ২০০১ এর নির্বাচনের তিন মাস পর এবং সরকার গঠনেরও তিন মাস পর। আর এই সম্মেলন হচ্ছে পরবর্তী নির্বাচনের ছয় মাস আগে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিকভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিকভাবেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন শুধু একটা পর্ব নয়। এর সাথে দেশের ভবিষ্যৎ জড়িত, দেশের ভাগ্য জড়িত এবং ইসলামী আন্দোলনের ভাগ্যও জড়িত। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় পরিবেশ- পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে জামায়াতে ইসলামীকে দেশের স্বার্থ, ইসলামের স্বার্থ, মুসলিম উম্মাহর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দায়িত্বশীল, গঠনমূলক এবং বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্বাচনে ভালো করার চেষ্টা করতে হবে, নিজেদের সিট বাড়াবার চেষ্টাও করতে হবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত বাস্তবতা হলো আমরা '৮৬ তে ১০টি আসনে জিতেছিলাম, '৯১ তে ১৮টি আসনে, '৯৬তে ৩টি আবার ২০০১-এ ১৭টি। রাতারাতি একলা সরকার গঠন করার মত আসন জিতার স্বপ্ন বোধ হয় আমরা দেখি না। কিন্তু আমাদেরকে ৩০০ আসনে দাওয়াত সম্প্রসারণ এবং সংগঠন মজবুত করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে গোটা দেশবাসীর আস্থা অর্জনের মাধ্যমে এই দেশের রাজনীতিতে একটি কার্যকর ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি অবশ্যই রাখতে হবে। আগামীতে কয়টা আসনে আমরা নমিনেশন দিতে পারবো, কয়টা পারবো না, এটা বড় কথা নয়। একটি-দু'টি নির্বাচনকে টার্গেট রেখে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে না। জামায়াতে ইসলামী সুদূরপ্রসারী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। অতএব আমার এলাকায় আগামী নির্বাচনে আমি নমিনেশন পাই, বা না পাই, এই এলাকাকে ইসলামী আন্দোলনের বেইজ এরিয়া হিসেবে গড়ে তুলতেই হবে এর কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে যার যার জায়গায় আমাদেরকে কাজ করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূলত জনগণের কাছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বকে তুলে ধরার একটি সুযোগ হয়। যেখানে আমরা আমাদের প্রার্থী দিতে পারবো সেখানেই শুধু নয়, যেখানে আমাদের প্রার্থী নাই, জোটের প্রার্থী আছে সেখানেও যদি আমরা আপন মনে করে দেশ- জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভূমিকা রাখি, জনগণের সামনে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের স্বীকৃতি আদায়

করতে পারি, তাহলে সেটা আগামী দিনের পথকে সুগম করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যাতে আমাদের সব সময় মন-মগজে সজাগ থাকে, সক্রিয় থাকে এ বিষয়টি আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ থাকল। উদ্বোধনী অধিবেশনের বক্তব্য, "আদর্শ রুকন" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা এবং নির্বাচন প্রসঙ্গে সেক্রেটারী জেনারেলের পরামর্শগুলোকে সামনে রেখে মাঠে-ময়দানে যদি আমরা এগুলোর বাস্তবরূপ দিতে সক্ষম হই তাহলেই এই রুকন সম্মেলনকে আমরা সার্থক এবং সফল করতে সক্ষম হব। আমি আশা করি মাঠে- ময়দানে গিয়ে এর আলোকে যার যার জায়গায় সবাই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবেন। আল্লাহর দেয়া মেধা-প্রতিভাকে উজাড় করে দিয়ে.এই সিদ্ধান্ত আপনারা বাস্তবায়ন করবেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

রুকন হিসেবে আমাদের জন্যে বিবেচ্য বিষয় দু'টি- একটি হলো আনুগত্য আর অপরটি হলো প্রতিনিধিত্ব। আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রধান আনুগত্য হলো আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.)। এরপর আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) বিধান বাস্তবায়নকারী নেতৃত্বের। জামায়াতে ইসলামী নিছক একটি সংগঠন নয়। এটা দ্বীন কায়েমের পূর্ণাঙ্গ সংগঠন হওয়ার কারণে এ সংগঠনের নেতৃত্বের আনুগত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্য নয়। একটি ইন্সটিটিউশনের, একটি প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য এবং সে আনুগত্য শর্তহীন নয়। শর্তগুলো আপনাদের জানা আছে। আমি আশাবাদী জামায়াতে ইসলামীর রুকন ভাই এবং বোনদের মধ্যে আনুগত্য আছে। এই আনুগত্যেরই প্রমাণ আজকের এই রুকন সম্মেলন। এই রুকন সম্মেলনের জন্য আমরা বাইরের কোন শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে তেমন কোন অর্থনৈতিক সাহায্য নিতে যাইনি। সামনে আমাদের নির্বাচনও আছে। এই সম্মেলন মূলত: রুকন ভাই ও বোনদের কুরবাণীর ফলশ্রুতি। সেই সাথে এখানে ধৈর্যের সাথে, শৃঙ্খলার সাথে সম্মেলনের প্রতিটি প্রোগ্রাম অনুসরণ করাটাও আনুগত্যেরই একটি নিদর্শন।

আমরা মহাসমাবেশ ডেকেছিলাম। সমালোচকরা বলছে আমরা দশ কোটি থকে ত্রিশ কোটিরও বেশী টাকা খরচ করেছি। তারা তাদের ধারণা মতে ধরে নিয়েছে যে, এতবড় একটা মহাসমাবেশ করতে হলে কারো দৃষ্টিতে ৪০ কোটি, কারো দৃষ্টিতে ১০ কোটির বেশি খরচ হতে পারে। আল্লাহ ভালো জানেন। জেলা সংগঠনের রুকন, কর্মীদের সাথে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে আপনারা এই প্রমাণ রেখেছেন সংগঠনের ডাকে যে কোন মুহূর্তে সাড়া দিতে আপনারা প্রস্তুত। আল্লাহ তায়ালার এটা একটা মেহেরবানী।

এমনিভাবে জাতীয় উলামা সমাবেশ সফল হওয়ার পেছনেও আমাদের ভূমিকা ছিল, অবদান ছিল। এরপরও কিছু কিছু ব্যাপারে আমীরে জামায়াত হিসেবে আমার মনে এখনও কিছুটা অনুযোগ- অভিযোগ আছে। আমি অকপটে সেটা বলতে চাই। জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘদিন থেকে পরিকল্পনা নিয়ে আসছে, জামায়াতে ইসলামীর শববেদারী, শিক্ষা বৈঠক ইত্যাদির বক্তব্যগুলো চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সিলেকটেড গুটিকয় জনশক্তির কাছেই এটা যায়। আর জনগণ শুধু জামায়াতে ইসলামীর জনসভার বক্তব্য শোনার সুযোগ পায়। আর মিছিলে শ্লোগান শোনার সুযোগ পায়। যেটা অন্য দলও করে। অতএব, এই যে দাবি, জামায়াতে ইসলামী নিছক রাজনৈতিক দল নয়, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। এই ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, আখিরাতের ভয়-ভীতির জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, রাসূলের (সা.) মহব্বতের জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র গঠনের জন্য কি প্রোগ্রাম নেয়া হয়, জনগণের জানার সুযোগ হয় না। এই সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বছরের পর বছর পরিকল্পনায় আমরা উল্লেখ করে আসছি। শববেদারীকে গণশববেদারীতে পরিণত করতে হবে, যাতে করে জামায়াতে ইসলামীর এই আত্মশুদ্ধি; তাজকিয়ায়ে নফস, তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র গঠনের এই কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি যথাযথ গুরুত্বসহকারে আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে এটা মনে করতে পারছি না।

দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় আমাদের সেক্রেটারী জেনারেল আপনাদের দৃষ্টিতে এনেছেন অন্যভাবে। আমি আরেকভাবে আনতে চাই। বর্তমানে মিডিয়ার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিডিয়ায় আমাদের নেতিবাচক কথাই বেশী আসে। পজিটিভ কথা আসার এখনও সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। একটি পত্রিকা আমাদের বক্তব্য মোটামুটি হুবহু দেওয়ার চেষ্টা করে। এই পত্রিকাটি যদি জনগণের কাছে আমরা পৌছাতে পারতাম তাহলে মিডিয়ার নেতিবাচক ভূমিকাকেও এটা প্রভাবিত করতে পারত। এত বড় সংগঠন; ২২,০০০ রুকন, দুই লাখের উপরে কর্মী, এক কোটির মত সহযোগী সদস্য।[২০] এই রকম একটা সংগঠনের ব্যাকিং থাকা সত্ত্বেও "সংগ্রামের" মত একটা পত্রিকা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারছেনা। ত্রিশ হাজারের উপরে সার্কুলেশন হলে পত্রিকাটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত। আমরা বারবার বলে আসছি কিন্তু

[২০] ৮ম সম্মেলনের সময় মোট রুকন সংখ্যা ছিল-২১৫৩৮ জন, পুরুষ রুকন-১৬২৬৬ এবং মহিলা রুকন-৫২৭২ জন।

আপনাদের হৃদয়ে কোন আবেদন পৌঁছাতে পেরেছি বলে আমি এখনও মনে করছিনা। এটা আমার একটা অনুযোগ। আমি জানিনা আপনারা কিভাবে নিবেন।

এরপর আর একটা কথা আমি বলেছিলাম ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপরই জামায়াতে ইসলামীর মৌলিক কাজ দাওয়াত, সংগঠন এবং ব্যক্তি গঠন। অতীতে রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এই মৌলিক কাজগুলো আমরা যেভাবে চেয়েছি, সেভাবে করতে পারিনি। ২০০১ এর নির্বাচনের পর থেকে নিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত মোটামুটি একটা অনুকূল আবহাওয়া, একটা অনুকূল পরিবেশে আমরা ছিলাম। আমি প্রথম বছরই বলেছিলাম এই অনুকূল পরিবেশ কতদিন থাকবে আমি জানিনা। সময়ের সদ্ব্যবহার করে বিগত পঁচিশ বছরে এই মৌলিক কাজগুলো যতদূর নিতে পারিনি, এই পাঁচ বছরেই ততদূর নিতে হবে। ২০০১ এর নির্বাচনের পরপরই বলেছিলাম, এরপর যখনই সময় সুযোগ এসেছে এটার পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিভিন্ন জেলায় নিজে সফরে গিয়ে, সরেজমিনে তদারক করে জানার চেষ্টা করে আমি ষোল আনা সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এক্ষেত্রেও যথেষ্ট দুর্বলতা আমরা দেখিয়েছি। আত্মসমালোচনায় প্রত্যেকের কাছে নিশ্চয়ই এটা ধরা পড়বে। অতি সম্প্রতি ছোট্ট একটা আপিল করেছিলাম, সাংঘাতিক খরায় সকলেই অতিষ্ঠ ছিলেন, আমাদের রুকন ভাইদের কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। "আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে "ইস্তেস্কার" নামাজ আদায়ের জন্যে আহ্বান করা হউক।" আমি রাবেতার কনফারেন্সে যাওয়ার আগে আপিলটি করে গিয়েছিলাম। খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি খুব কম জেলায় এ ডাকে সাড়া দেয়া হয়েছে। হয়ত মনে করা হয়েছে এটার তো সাংগঠনিক গুরুত্ব বোধ হয় নাই। এটা তো বোধ হয় আনুগত্যের পর্যায়ে পড়ে না। আমার মনে হয় এই মূল্যায়ন সঠিক হয়নি।

প্রিয় রুকন ভাই ও বোনেরা

এই আনুগত্যের ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে ইতিবাচক দিকগুলোকে সামনে রেখে যেমন মোবারকবাদ জানাতে চাই তেমনি এখনও অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা রয়ে গেছে। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে।

"প্রতিনিধিত্ব" এ ব্যাপারেও "আদর্শ রুকন" শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত এসেছে। জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনকে সর্বোচ্চ ফোরাম বলা হয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ফোরাম। যদি কখনও খোদা নাখাস্তা, খোদা নাখাস্তা আমীরে

জামায়াতের সাথে মজলিসে শূরার বড় রকমের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার ফোরাম এই রুকন সম্মেলন। কিন্তু এই রুকন সম্মেলন আমাদের কর্মী সমর্থকদের নির্বাচিত কোন ফোরাম নয়। বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় দেড়-দুই কোটি মানুষ এখন জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত। মাঠে ময়দানে জামায়াতের নির্বাচন আপনারা করেন। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা নির্বাচন আপনারা করেন। সাংবিধানিকভাবে প্রতিনিধি বলা না হলেও মূলত: রুকন যারা হয়ে যান, তারা স্থায়ীভাবে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। এই প্রতিনিধিত্ব করার দুইটি দিক।

প্রথম দিক হলো- ইসলামের প্রতিনিধিত্ব। ইসলামের সঠিক দাওয়াত, ইসলামের সঠিক শিক্ষা, ইসলামের সঠিক পরিচয় মানুষের কাছে তুলে ধরার মত সামর্থ্য রুকনদের হওয়ার কথা। ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই রুকন করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। তাই প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে শুধু মুখের কথায় নয় আমল দ্বারা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব আমাদের করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) 'সত্যের সাক্ষ্য' বইটিতে শাহাদাতে ক্বাউনি এবং শাহাদাতে আমলী, মৌলিক সাক্ষ্য এবং বাস্তব সাক্ষ্যের ব্যাপারে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, মূলত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে হলে ঐ দিকগুলো আমাদের অর্জন করতে হবে।

প্রতিনিধিত্বের আরেকটি দিক হলো ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্ব। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে আমরা সবাই বলি, এটা নিছক রাজনৈতিক দল নয়, নিছক ধর্মীয় দল নয়। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি সংগঠন। কিন্তু প্লাটফর্মে দাঁড়ালে দেখি রাজনৈতিক বক্তৃতার সময় যারা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী নন তাদের বক্তৃতার সাথে আমাদের বক্তৃতার মৌলিক কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার যারা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন-সংগঠন করেন, ধর্মীয় ব্যাপারে, দ্বীনি ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও পার্থক্য খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি এটা আমার অনুভূতি বলছি। এটা বুঝিয়ে বলার মত ভাষা আমার নিজের কাছেও যথেষ্ট পরিমাণে নেই। এই ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা আছে এটা আমি পরিষ্কার বলতে চাই। আমাদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর মত একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর রুকন হওয়ার মুহূর্তে আমরা একটি গঠনতন্ত্রকে সামনে রেখে শপথ নিয়েছি। শপথ বাক্যটাই যদি আমরা বারবার একটু সামনে আনি, রুকনিয়াতের গোটা দায়িত্ব পালনের অনুভূতি, ঐ শপথ বাক্যগুলো সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম। এই শপথের সূচনায় কালেমা শাহাদাত- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল ও বান্দা। আর এর সমাপনী বক্তব্য-

(নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার ইবাদাত, আমার হায়াত ও আমার মওত আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের জন্য) – আল কুরআন, সূরা আল আনআম, ১৬২।

এর মাঝে আকিদার প্রসঙ্গ আছে, এর মাঝে বিশেষ করে কর্মনীতি, স্থায়ী কর্মনীতি আছে। এই স্থায়ী কর্মনীতি যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকে তাহলে কোন প্রকার দায়-দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের প্রভাব আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমি আশা করব আজকে 'আদর্শ রুকন' এই বিষয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি যেভাবে এসেছে এটাকে আমাদের শপথ বাক্যের সাথে মিলিয়ে আমরা নিজেদেরেকে সত্যিকারের ইসলামের এবং জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে আত্মনিয়োগ করব। আমাদের সংগঠনের জীবনী শক্তি, প্রাণশক্তি হিসেবে দুটো বিষয় যা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) থেকে আমরা পেয়ে আসছি। একটি পরামর্শ, আর একটি হলো মুহাসাবা।

পরামর্শ দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রেও আমার অবজারভেশনে কিছু দুর্বলতা দেখে থাকি। পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে আমরা যারা শরিক হয়েছি, দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে, ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমার দিলে কোন বাস্তব পরামর্শ দেয়ার মত কোন আইডিয়া দান করেন, সেটা একটা আমানত। সেটাকে যথাস্থানে, যথাযথভাবে পেশ করতে হবে। অন্যান্য আন্দোলন সংগঠনে পরামর্শ দেয়াটা অধিকার। আমাদের আন্দোলনে পরামর্শ দেয়াটা একটা দায়িত্ব। একটা আমানত। অভিযোগ আছে দায়িত্বশীলদের মধ্যে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে নাকি কিছুটা অসুবিধা আছে। যদি কোথাও থেকে থাকে এটা দূর হওয়া দরকার। পরামর্শ দিতে হবে, অবশ্য পরামর্শ যদি আকাশ-কুসুম চিন্তার ভিত্তিতে হয়, ইউটোপিয়ান (অবাস্তব) আইডিয়ার ভিত্তিতে হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। মাঠে-ময়দানে কাজ করার মাধ্যমে, ঘাত-প্রতিঘাত

মোকাবেলার মাধ্যমে যে আইডিয়া আসে সেটা বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত হতে বাধ্য। তার আলোকে যদি পরামর্শ আসে সে পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তবে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রেও উদারতা থাকতে হবে, পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রেও উদারতা থাকতে হবে।

পরামর্শের সাথে মুহাসাবার বিষয়টি- যেটা ছিল আমাদের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য, আমি লক্ষ্য করছি মুহাসাবার এই বিষয়টি এখন পরিত্যক্ত হয়ে আসছে। এটা আমাদের জন্য সুখকর নয়, কোন শুভ সংবাদ নয়। আমরা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নই। অতএব ভুল-ত্রুটি সংশোধনের স্থায়ী প্রক্রিয়াই হল মুহাসাবা। মুহাসাবা করার জন্যে যে সৎ সাহসের প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে সেই সৎ সাহসের অভাব আছে। অনেকে বলেন, মুহাসাবা করলে সম্পর্ক খারাপ হয়। মুহাসাবা করলে নাকি রুকনিয়াত চলে যেতে পারে! তো আমি কি রুকনিয়াত রাখার জন্যে ইসলামী আন্দোলনে এসেছি? নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ইসলামী আন্দোলনে এসেছি। অতএব এই ভয়-ভীতি অমূলক। মুহাসাবা হতে হবে সংশোধনের নিয়তে, পদ্ধতি অনুসরণ করে। কাউকে জব্দ করার জন্যে নয়, কাউকে আটকাবার জন্যে নয়। ইখলাসের সাথে মানুষের সংশোধনের জন্যে। বরং মুহাসাবার ক্ষেত্রে যেমন সৎ সাহসের অভাব আছে, তেমনি আমাদের কারও কারও মধ্যে মুহাসাবা গ্রহণ করার মত উদারতা এবং সৎ সাহসের অভাব আছে। দুটোই আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। সংগঠনে গতিশীলতা আনয়নের জন্যে, পরামর্শ এবং মুহাসাবার প্রাকটিস যথাযথভাবে সংগঠনের মধ্যে চালু করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

এর পর আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে আনতে চাই তা হলো- আমাদের এই আন্দোলনের মূল পুঁজি ইখলাস, ইখলাস এবং ইখলাস। "খালেসাতান লিল্লাহ"। আমি আন্দোলনে শরিক হয়েছি আখেরাতে নাজাতের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ইলমে হাদিসের কিতাবের সহীহ বোখারীর প্রথম হাদীস- "ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত"। নিয়তটার উপরেই সকল কার্যক্রমের মূল্যায়নটা নির্ভর করে। এই পরামর্শ দান ও মুহাসাবা করা সৎ সাহসের কাজ। এটা গ্রহণের সৎ সাহসের অভাবেরও মূল রয়েছে এখলাস। সত্যিকার অর্থে যদি এখলাস থাকে এখলাসের ভিত্তিতেই যদি আমি কারও সংশোধন চাই, এখলাসের ভিত্তিতেই যদি আমি কোন পরামর্শ দেই তাহলে এটা মানুষের দিলের উপরে অবশ্যই আছর করবে। কারণ এখলাসের সাথে কথা বললে সেটা হয় মনের কথা দিলের কথা। এখলাস ছাড়া কথা বললে সেটা হয় আরটিফিশিয়াল, কৃত্রিম কথা। কৃত্রিম কথার মধ্যে নৈতিক কোন প্রভাব থাকে না। এখলাসের বিষয়ে আমরা

যদি কোন তরবিয়াত ক্যাম্পের বক্তৃতার বিষয় রাখি আমার মনে হয়, যে কোন রুকন-ভাই ও বোনকে বক্তৃতা করতে দিলে তারা এক ঘন্টা, দেড় ঘন্টার সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারবেন। এর উপরে বক্তৃতা দেয়া যত সহজ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে এখলাসের পরিচয় দেয়াটা অত সহজ নয়।

কিন্তু এটাকে সহজ বানাতে হবে। যদি আমরা এটাকে সহজ বানাতে পারি, তাহলে অনেক সাংগঠনিক সমস্যার জটিলতা থেকে আমরা আমাদের সংগঠনকে মুক্ত রাখতে পারব। ইখলাসের মূল দাবিই হলো ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, রাগ-বিরাগ, ক্রোধ-আক্রোশের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ-জাতি, সর্বোপরি ইসলামের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই ইখলাস ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন অপরিহার্য, যে কোন সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও এর গুরুত্ব অনেক বেশী।

আমি একটু আগে বলছিলাম, ইসলামী আন্দোলন ঈমানের দাবি এবং আখেরাতে নাজাতের জন্যেই আমরা ইসলামী আন্দোলনে এসেছি। দুনিয়ার সাফল্য অবশ্যই কাম্য। এর ব্যাপারে কোন পার্থক্যের সুযোগ নেই। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের সংগ্রামের ডাক দিয়ে এর প্রধান পুরষ্কার হিসেবে ঘোষণা করেছেন মাগফিরাত, নাজাত এবং জান্নাতকে। জাগতিক সাফল্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার ব্যবহৃত ভাষা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "ওয়া উখরা' আর একটা আছে, 'তুহিব্বুনাহা'- তোমাদের কাছে সেটা খুবই আকর্ষণীয়। তোমরা সেটা খুবই পছন্দ কর। সেটি কী? "নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব" আল্লাহর সাহায্যে নিকটতম বিজয়।

জাগতিক সাফল্য গৌণ আমি এটা বলব না। কিন্তু এই জাগতিক সাফল্যের শুভ সংবাদ তাদের দেয়া হয়েছে, যারা কেবলমাত্র আযাবুন আলীম থেকে নাজাতের জন্যে, মাগফিরাতের জন্যে, আল্লাহ তা'য়ালাকে রাজি-খুশি করার জন্যে, জান্নাতের জন্যে, ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। জাগতিক সাফল্যের পরে আসে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। এটা একটা বড় আমানত। এই আমানতের সদ্ব্যবহার করা, ইনসাফ করতে সক্ষম হওয়া, স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে ইনসাফ করতে সক্ষম হওয়া তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা দুনিয়াকে লাথি মেরে আখিরাতের সাফল্যকে অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মধ্যে পরিষ্কার থাকতে হবে। সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলে আছি, না হলে নাই এটা কিন্তু এই চিন্তাধারার, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী বিষয়।

আমি এরপরে যে বিষয়টির কথা বলতে চাই তা হলো, এই আন্দোলনে যোগদানের সুযোগ পাওয়া আল্লাহ তা'য়ালার মেহেরবানী। আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ মেহেরবানী। তিনি তাঁর কিতাবে হার্কিমে বলেছেন, "হুয়াজ তাবাকুম"।

তিনি এই আন্দোলনের জন্যে তোমাদেরকে বাছাই করেছেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন দ্বীন কায়েমের আন্দোলন ফরজ। এটা অনেক বড় বড় আলেম ওলামাও তো বলেন না। এরা অল্প শিক্ষিত অথবা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত লোকেরা এটা কোথায় পেলো! আসলে এই দ্বীন কায়েমের আন্দোলন কোন শ্রেণীবিশেষ, গোষ্ঠীবিশেষের জন্য ঠিকাদারি নয়। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে চান তাকে এই কাজের জন্য বাছাই করেন। যাদেরকে বাছাই করেন তাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান। সূরা মায়িদার ৫৪ নং আয়াত এখানে স্মরণযোগ্য।

এখানে দুইটা বিষয় আমরা দেখি, একটা হলো দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে কারো ঠিকাদারি নেই, স্থায়ী ইজারাদারি নেই। যারা এই দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের সুযোগ পায়, তারা যদি এর হক আদায় কর, আল্লাহ তা'য়ালা যদ্দিন তারা হক আদায় করে, ততদিন এর উপর রাখেন। যদি হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়, তাদের পিছু হটিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে এ দায়িত্বে নিয়ে আসেন। এক নম্বরে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ভালোবাসেন। এটা আমাদের জন্য বড় আবেগের। ইকামতে দ্বীনের ফরজিয়াতের অনুভূতি তারাই লাভ করতে সক্ষম হয় যাদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের দৃষ্টি পড়েছে। সেই সাথে তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কোন নিন্দুকের নিন্দা, সমালোচকের সমালোচনার ধার ধারে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাড়তি নিয়ামত। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে চান তাকে এই নিয়ামত দান করেন। এই দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলনের অংশগ্রহণের সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একটি বাড়তি মর্যাদা। কিন্তু সেই সাথে এই মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হলে এর পরিণাম-পরিণতিও কিন্তু ভয়ংকর। এটাকে আমাদের সামনে রাখতে হবে।

এই আন্দোলনে ছবর এবং তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই আন্দোলনে অতীতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন- আম্বিয়ায়ে কেরাম আ'লাইহিমুসসালাম, সিদ্দিকীন, ছালেহীন এবং শুহাদা। তারা সকলেই নানা রকমের বিপদ-আপদ, মুছিবতের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। হাদীসে কুদসিতে আছে- "সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা নবীগণের উপর, অত:পর দ্বীনি মর্যাদার দিক থেকে পরবর্তীগণের, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণের।

সবচেয়ে বেশী বিপদ মুসিবতের সম্মুখীন যারা হয়েছেন তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)। এর পর আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসরণের দিক দিয়ে যারা যত অগ্রসর, তাদের উপর তত বেশী বিপদ মুছিবত এসেছে। এই আন্দোলনে যারা অংশ নেয়, তাদের ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসা অতিক্রম করে আন্দোলনে টিকে

থাকতে হলে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অপরিহার্য। আর এই সম্পর্কের ভিত্তিই হল ছবর এবং তাওয়াক্কুল। আল্লাহ পাক বলেন–

"ছবর কর, ছবর তোমার বৃথা নয়। তুমি ছবর করলে তোমার সাথে আল্লাহ আছেন।" অন্যত্র "নিশ্চয়ই আল্লাহ ছবরকারীদের সাথে আছেন।"

এই ছবরের ব্যাপারে আমি বাস্তবে দু'একটা কথা বলতে চাই। প্রতিকূল অবস্থা আসলে অথবা বিজয় সুদূর পরাহত মনে হলে আমাদেরকে হতাশা-নিরাশা পেয়ে বসে। যদি দেখা যায় সাংঘাতিক প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে, সাংঘাতিক সমালোচনা হচ্ছে, সাংঘাতিক বিরোধিতা হচ্ছে সেই সময় অস্থিরতা আসে। এই অস্থিরতা এবং পেরেশানী কিন্তু ছবর ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। আমাদেরকে বিষয়টা সামনে রাখতে হবে। পরীক্ষা কার জন্য কিভাবে আসবে এটা আল্লাহ তা'য়ালার ফায়সালা। সবার জন্য এক ধরনের পরীক্ষা আসা জরুরি নয়। কিন্তু এ পথে যারাই পা বাড়ায় পরীক্ষা তাদেরকে স্পর্শ করে। পরীক্ষার স্তর তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকে আমরা যে চতুর্মুখী সমালোচনা নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এটা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে গুণ আমাদেরকে সাহায্য করে সেই গুণের নামই ছবর এবং তাওয়াক্কুল।

আমি এর পরে ইসলামী ঐক্যের উপর একটি কথা বলে আমার কথা শেষের দিকে নিতে চাই। ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে আমাদের মুহতারাম সাবেক আমীরে জামায়াত যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তাঁর সঙ্গী-সাথী হিসেবে আমরাও চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখনও বাঞ্ছিত মানে ইসলামী ঐক্য আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। কিন্তু এ বিষয়টি আমাদের কাছে সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আছে এবং থাকবে। এই ইসলামী ঐক্যের লক্ষ্যেই আমরা কোন ইসলামী দলের বিপক্ষে কোন কথা বলি না, সকল ইসলামী দলের খেদমতকে আমরা স্বীকৃতি দেই। বর্তমানে জঙ্গিবাদের প্রসঙ্গে এসেও আমরা যে জোরালো বক্তব্য দিয়েছি, তা শুধু জামায়াতে ইসলামীর পক্ষেই দেইনি; এদেশের সমস্ত পরিচিত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী দলের পক্ষে দিয়েছি, ব্যক্তির পক্ষে এবং আলিম-ওলামার পক্ষে দিয়েছি। আমাদের এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই; অনেক সময় লক্ষ্য করি কারো কারো মধ্যে পেরেশানী সৃষ্টি হয়, হায় হায় কি হয়ে গেল, এই ধরনের একটা উক্তিও কেউ কেউ করে থাকেন। এ হীনমন্যতাবোধ আমাদের মধ্যে থাকা চলবে না। আমি মনে করি আমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য সব ইসলামী দল যদি ইখলাসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাতে আমাদের মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ ইসলামী

আন্দোলনকে আমরা দোকানদারি মনে করি না। আর একটা দোকান বাড়লে আমাদের গ্রাহক কমে যাবে এই ধরনের সংকীর্ণ চিন্তা জামায়াতে ইসলামীতে নাই, অতীতে ছিলনা, এখনও নাই, সামনেও থাকবে না। যদি কেউ ইখলাসের সাথে ছোট ছোট দলকে এক করে বড় একটি ইসলামী শক্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাতে আমাদের ঈর্ষাকাতর হওয়ার কিছু নেই। ইখলাস থাকলে অবশ্যই সেটা আমাদেরও সহায়ক শক্তিতে পরিণত হবে। আর যদি ইখলাস না থাকে তাহলে তাদের বিষয়টা দেখার জন্যে আল্লাহ কি যথেষ্ট নন? আমাদের দিক থেকে আমরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছি কিনা সেটাই দেখতে হবে। এরপরও যদি কিছু ঘটে, সে বিষয়টি আল্লাহ তা'য়ালার উপরে সোপর্দ করতে হবে। 'উফাওয়িদু আমরি ইলাল্লাহ।'

আমার আরও কিছু বলার ছিল। গত বছর আমরা দীর্ঘ দিন যাবত প্রস্তুতি নিয়ে এখানে প্রতিনিধি সম্মেলন করেছিলাম। সেটা নিয়ে একটা অবাঞ্ছিত-অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা পত্রিকায় আসল। আজকের এই সম্মেলন আমাদের দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতির পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কালকে কে বা কারা একটা সমাবেশ করেছে। তাদের ঐ সমাবেশকে ভণ্ডুল করার জন্য নাকি আমরা তড়ি ঘড়ি করে এই রুকন সম্মেলন করছি। দ্বীনের লেবাস পরে এইভাবে যারা নির্জলা মিথ্যা বলতে পারে, আর যাই হোক দ্বীনের ব্যাপারে তাদের ইখলাস আছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

অতএব এরা কিছু কথাবার্তা বললে আমরা যেন হীনমন্যতার শিকার না হই। আবারও এ বিষয়টা আপনাদের সামনে রাখতে চাই।

ইসলাম কায়েম হওয়ার ক্ষেত্রে, ইসলাম কায়েম করার ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী যেই পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করছে, বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে, এর কোন বিকল্প নেই। এটা বাস্তব সম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসেবে যারা পরিচিত, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের গৃহীত নীতি, পদ্ধতি এবং কৌশলকে তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন, স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা যেন নিজেদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার না হই। এই বিষয়টি আমি বিশেষভাবে আপনাদের দৃষ্টিতে আনতে চাই।

সবশেষে আমি বলতে চাই, এই আন্দোলনে যোগদান আল্লাহর মেহেরবানীতে, টিকে থাকাটাও আল্লাহর মেহেরবানীর উপর নির্ভর করে। এই আন্দোলনের সাফল্যও তাঁরই সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অতএব লোভ-লালসা এবং ভয়-ভীতি উভয় দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার মালিক তিনি। তাঁর সাথে আমাদেরকে গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। উত্তম নামাজ এবং তাঁর কিতাব

আল কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা বাঞ্ছিত মানে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। উত্তম নামাজ এবং কুরআনের সাথে সম্পর্কের পাশাপাশি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সর্বক্ষণ নিজের দিলটাকে রুজু রাখার উপায় হলো দু'আ। দু'আ সর্বোত্তম জিকির, দু'আ সর্বোত্তম ইবাদত। নামাজ ইটসেলফ ইবাদত এবং দু'আ।

আমরা মাঠে-ময়দানে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করব। আর সেই দায়িত্ব যাতে যথাযথভাবে পালন করতে পারি এজন্য আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য কামনায় সব সময় দিলটা যেন তাঁর দিকে থাকে।

বিশেষ বিশেষ সময়ের গুরুত্ব আছে। কিন্তু আমি মনে করি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দিলটাকে রুজু রাখার ব্যাপারে চব্বিশ ঘন্টাই আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। চলার পথে নির্জন-নিরালায় যখনই সুযোগ হয় আল্লাহ তা'য়ালার শিখানো দু'আ, আল্লাহর রাসূলের (সা.) শিখানো দু'আ এগুলোর প্র্যাকটিস করার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক গভীর নিবিড় হতে পারে এবং এই সম্পর্কের বাঁধন যত মজবুত হবে ততই এ পথের চড়াই উৎরাই মোকাবেলায় আমরা সাহস হিম্মত করতে পারব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার শিখানো দু'আগুলোর মধ্যে ছবরের তৌফিক চাওয়াটা স্থান পেয়েছে। এ প্রসংগে সূরা আল বাকারার ২৫০ ও সূরা আলে ইমরানের ১৪৭ আয়াত উল্লেখযোগ্য।

প্রিয় রুকন ভাই ও বোনেরা

আমি এই কয়টি কথার মাধ্যমে আবারও মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের শুকরিয়া জানাচ্ছি এই রুকন সম্মেলন সফল হওয়ার জন্যে। সেই সাথে ভাই-বোনদেরও আমি শুকরিয়া জানাচ্ছি। অবর্ণনীয় কষ্ট সত্ত্বেও তারা এই সম্মেলনের প্রতিটি অনুষ্ঠান, প্রতিটি প্রোগ্রাম মনোযোগের সাথে অনুসরণ করেছেন। আমি আশা করব এই সম্মেলন আমাদের সাংগঠনিক জীবনে সুদূরপ্রসারী একটি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। সেই সাথে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীকে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দিবে। এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবার সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে সাথে নিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের দরবারে দু'আ করার আহ্বান জানাচ্ছি। দু'আর সাথে সাথেই আমাদের এই সম্মেলনের সকল আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় হামলা- রক্তাক্ত ও ভয়াল ২৮ অক্টোবর, ২০০৬

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলংকজনক ও শোকাবহ অধ্যায়। ঐদিন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় সন্ত্রাসীরা সুপরিকল্পিত ও নিষ্ঠুরভাবে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সড়কে জামায়াতে ইসলামীর শান্তিপূর্ণ সমাবেশে লগি-বৈঠা, বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দিনভর এক তরফা হামলা চালিয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শহীদ হয়েছিল জামায়াত-শিবিরের ৬ জন তরুন তাজা নেতাকর্মীসহ ১৪ জন, আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করেছে প্রায় সহস্রাধিক। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সেদিন বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এ মর্মান্তিক ও পৈশাচিক দৃশ্য অবলোকন পূর্বক বিস্ময় ও বেদনায় বিমুঢ় হয়ে গিয়েছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব স্বয়ং বিবৃতি দিয়ে তাঁর উদ্বেগ ও সমবেদনার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র হামলাকারী ও তাদের গডফাদারদের বিবেক, মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধের অস্তিত্বের প্রমাণ আজো পাওয়া যায়নি।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর জোট সরকারের মেয়াদ শেষে সন্ধ্যায় বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ২৮ তারিখ রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজুদ্দিন আহমদের হাতে সংবিধানে ধার্য করা প্রধানমন্ত্রীর যাবতীয় ক্ষমতা এসে যায়। ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি কে.এম. হাসানের শপথ গ্রহণের কথা ছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে ধিকৃত সেনা প্রধান জেনারেল মইনউদ্দীনের যোগসাজশে ওয়ান ইলেভেন সৃষ্টির অনাকাঙ্খিত উপাখ্যান সৃষ্টির অপপ্রয়াস এই নারকীয় হামলার প্রধান উদ্দেশ্য বলে পরবর্তীকালে দেশ প্রেমিক ও বিবেকবান নাগরিকদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। আর ১/১১ এর পথ ধরে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সুক্ষ্ণ কারচুপি কৃত প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসে। বিচার বিভাগ নাকি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল সরকার আইন বিচার ব্যবস্থাকে নিজস্ব গতিতে চলতে দিবে। কিন্তু বিস্ময় ও বেদনার সাথে শহীদ পরিবারসহ দেশবাসী জানেন- সরকারবাদীর মতামতকে তোয়াক্কা না করে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

শিউরে ওঠা সেই কালো অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২৮ অক্টোবর (২০০৬) চার দলীয় জোট সরকারের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারী জেনারেলসহ (দু'জন সাবেক মন্ত্রী) কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সমাবেশ ছিল বিকাল ৩টায়। সকাল থেকেই সভার মঞ্চ তৈরীর কাজ চলছিল। হঠাৎ করেই সকাল ১১টার দিকে জনৈক আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে লগি-বৈঠা হাতে বিশাল বাহিনী জামায়াতের সমাবেশ স্থলে স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে হামলা চালায়। এ সময় জি.পি.ও এলাকায় অবস্থানরত ১৪ দলের শত শত কর্মী লগি-লাঠি নিয়ে তাদের সাথে যোগ দিয়ে জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মঞ্চ পুড়িয়ে দিতে এগিয়ে যেতে থাকে বায়তুল মোকাররম উত্তর সড়কের দিকে। এ পরিকল্পিত ও নারকীয় হামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক এক এম.পি পিস্তলসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 'নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে যা' টিভি ফুটেজে দেখা যায়।

সেদিন পুরো পল্টন মোড় জুড়ে ছিল হামলাকারীদের তাণ্ডবলীলা। লগি-লাঠি দিয়ে জামায়াত-শিবিরের অসংখ্য নেতাকর্মীকে হতাহত করা ছাড়াও নির্যাতন করা হয়েছে শত শত দাঁড়িটুপিওয়ালা পথচারীকে। তারা শিবির নেতা মুজাহিদুল ইসলাম ও জামায়াত কর্মী জসিম উদ্দীনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরও তাদের লাশের উপর ওঠে পাশবিক নৃত্য-উল্লাসে মেতে ওঠে। মূমুর্ষ মুজাহিদকে নরপিশাচরা লগি-সঙ্গিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিজেদের স্বভাব-সুলভ জিঘাংসা চরিতার্থ করে। দফায় দফায় হামলা চলে দুপুর ২টা পর্যন্ত। এ সময় বার বার পুলিশকে অনুরোধ করা হলেও রহস্যজনক কারণে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

লগি-লাঠিধারীদের এই তাণ্ডবের মধ্যেও বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতের জনসমাবেশ শুরু হয়। আসরের নামাজের বিরতির পরে বক্তব্য রাখেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবদুস সুবহান, আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ ও সভার সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান প্রমুখ।

সবশেষে বক্তব্য দিতে দাঁড়ান আমীরে জামায়াতে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। মাওলানা নিজামীর বক্তব্য শুরু হওয়ার ৪/৫ মিনিট পর ৪.৪৩ মিনিটে পল্টন মোড়ে উত্তেজনা দেখা যায়। এ সময় নির্মাণাধীন র‍্যাংগস টাওয়ারের ছাদ থেকে সমাবেশ লক্ষ্য করে ১০/১২টি বোমা ও প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে দফায় দফায়

গুলী ছুঁড়ে ১৪ দলের সন্ত্রাসীরা। এ সময় পুলিশ নিজেদেরকে নিরাপদ স্থানে হটিয়ে নেয়। দু'জন সাবেক মন্ত্রীর সাথে থাকে তাদের মাত্র দু'জন গানম্যান। এবারে শুরু হয় শেষ আঘাত হিসেবে সন্ত্রাসীদের মরণ কামড়ের আক্রমন। সমাবেশ ভণ্ডুল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। মাগরিবের আযানের পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসে যখন বি.ডি.আর পল্টন মোড়ে অবস্থান নেয়। উল্লেখ্য, রহস্যজনক কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশের আই.জি.পি'র নীরবতায় শেষ মুহূর্তে খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপে বি.ডি.আর না পৌঁছলে জামায়াত-শিবিরের অধিকাংশ নেতাই হয়ত লাশ হয়ে যেতো বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের মন্তব্য।

লাশ নিয়ে সেই পুরনো রাজনীতি

লাশ নিয়ে রাজনীতি আওয়ামী লীগের জন্য নতুন কিছু নয়। সেদিন আওয়ামী হায়েনারা মীরপুরের জামায়াত কর্মী হাবিবুর রহমানকে পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। লাশটি টেনে হিঁচড়ে গুম করতে চেয়েছিল। আওয়ামী লীগ শহীদ হাবিবুর রহমানকে নিজেদের কর্মী দাবি করে তাঁর লাশের ছবি ব্যবহার করে পোস্টারও ছেপেছিল। ১৯৭০ সালে পল্টন ময়দানে আওয়ামী তাণ্ডবের শিকার দু'জন ইসলামী ছাত্র সংঘের শহীদ কর্মী থেকে এ পর্যন্ত কতবার যে তারা এরূপ করেছে তার সংখ্যা কম নয়। ২৮ অক্টোবর, ২০০৭ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক প্রকাশিত "ইতিহাসের কালো অধ্যায় ও সেই ভয়াল ২৮ অক্টোবর" শীর্ষক দৈনিক সংগ্রাম ম্যাগাজিন ২০০৭, ইত্যাদি পাঠে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতির মানবতা বিরোধী নৃশংস রুপের মাত্র এক দিনের ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের সচিত্র মসিচিত্র দেখা যাবে। এসব স্মৃতিকথায় যে সব দরদী মনীষার কথা আছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নীচে শুধু অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করছি:- "এ পৈশাচিক দৃশ্য টিভিতে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। মাতৃস্নেহ না থাকুক, সামান্য মানবতাবোধ থাকলেও তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানাতেন। এতে অন্তত: এটুকু প্রমানিত হতো যে, লগি-লাঠি দিয়ে নিরীহ নিরপরাধ ও নিরস্ত্র মানুষ হত্যার নির্দেশ তিনি দেননি।[২১]

[২১] অধ্যাপক গোলাম আযম "জীবনে যা দেখলাম" ৮ম খন্ড।

২৮ অক্টোবরের নির্মম হামলায় নিহত শহীদদের নাম, ঠিকানা ও বয়স

১. শহীদ সাবের হোসেন, বয়স-৩২, জামায়াত কর্মী, পূর্বধলা, উপজেলা- জলঢাকা, জেলা নীলফামারী।

২. শহীদ মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, ৩য় বর্ষ বি.বি.এ অনার্স, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, বয়স- ২২, শিবিরের সদস্য, চাটখিল, নোয়াখালী। বর্তমান কালকুনি, মীরপুর, ঢাকা।

৩. শহীদ হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন, বয়স-২১, ২য় বর্ষ অনার্স (পদার্থ বিদ্যা), ঢাকা কলেজ, ১১৯/১/খ, পূর্ব বাসাবো, ঢাকা।

৪. শহীদ সাইফুল্লাহ মুহাম্মাদ মাসুম, ১ম বর্ষ অনার্স (ইংরেজী), তিতুমীর কলেজ, ঢাকা। বয়স- ১৮, শিবির কর্মী, মাদারটেক সবুজবাগ, ঢাকা।

৫. শহীদ আবদুল্লাহ আল ফয়সল, ২য় বর্ষ অনার্স (ইসলামের ইতিহাস), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স, ২৪, মোস্তফা নগর, সানারপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৬. শহীদ মুহা. রফিকুল ইসলাম, বয়স-১০, শিবির কর্মী, চরযাত্রাপুর, কুড়িগ্রাম।

৭. শহীদ মুহা. হাবিবুর রহমান, বয়স-৪০ জামায়াত কর্মী, মৃধাকান্দি, শিকার মঙ্গল, কালকিনি, মাদারীপুর।

৮. শহীদ মুহা. জসিম-১ বয়স-৩৪, জামায়াত কর্মী, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

৯. শহীদ মোঃ জসিম-২ বয়স-৩৪, জামায়াত কর্মী, সুধিয়া, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

১০. শহীদ রুহুল আমীন, বয়স-৪৫, রুকন, জেলা অফিস সেক্রেটারী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

১১. শহীদ আরাফাত হোসেন, বয়স-২৩, জামায়াত কর্মী, দরিপলিতা, মাগুরা।

১২. শহীদ আব্বাস আলী, বয়স-২৬, জামায়াত কর্মী, জিলা, সদর, মেহেরপুর।

১৩. শহীদ জাবেদ আলী, বয়স-৫৫, খাজুরা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

১৪. শহীদ মোঃ শাহজাহান আলী, এম.এ, বয়স-২৫, দুর্গাপুর, কুমিল্লা (শিবির সদস্য)

কেন্দ্রীয় উলামা সমাবেশে মাওলানা নিজামীর ঐতিহাসিক ভাষণ

৩০ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে কেন্দ্রীয় উলামা-মাশায়েখ কমিটি জাতীয় প্রেসক্লাবে ওলামা-মাশায়েখদের নিয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছিলেন ঃ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন ওয়াসসালাতু ওয়াসসলামু আ'লা সায়্যিদিল মুরসালীন ওয়া-আ'লা আলিহী ওয়া-আসহাবিহী আজমাঈন। ওয়া আ'লাল্লাজিনাত্তাবা উহুম বি-ইহ্সানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন।

আজকের এই উলামা-মাশায়েখ সম্মেলনের[২২] শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শায়খুল হাদীস মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী) ও উপস্থিত উলামায়ে কেরাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি দেশে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই দু'টি মেরুকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক মেরুতে আছে চারদলীয় জোট, যার প্রধান শরীক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এর সাথে আছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টির দুটি অংশ। এই ধারার রাজনীতির সাথে রয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। এ ধারার সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের গণমানুষের মেজরিটি অংশ জড়িত। অপর মেরুতে অবস্থান আওয়ামী লীগের। তাদের সাথে রয়েছে ১৪ দল বা মহাজোট। এই জোট সম্পর্কে আমি আমাদের চারদল আয়োজিত মহাসমাবেশে বলেছিলাম, ১৪ দল মানে আওয়ামী লীগ আর মহাজোট মানেও আওয়ামী লীগ। আর আওয়ামী লীগ মানে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের পরিচয় কী? সেদিন শুধু একটি দিক বলেছিলাম। তারা লাঠিতন্ত্রে আর ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। আজকে ওটার সাথে তাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করে কথা বলতে চাই। এই দলের প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। মূলতঃ মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী আওয়ামী

[২২] এটি ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬ কেন্দ্রীয় ওলামা মাশায়েখ কমিটি কর্তৃক জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত ওলামা মাশায়েখ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রদত্ত বক্তৃতা।

মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিলেন। '৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে শরীক ছিল এবং ঐ জোটের প্রধান দল ছিল। তার সাথে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক- প্রজা পার্টি (কেএসপি) এবং মরহুম আতাহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে যুক্ত হয়েছিল নেজামে ইসলাম পার্টি। তার সাথে আর একটি ইসলামী দল জড়িত ছিল খেলাফতে রাব্বানী পার্টি। তাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নাম ছিলো তমদ্দুন মজলিস। আর ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল ছাত্র শক্তি।

যুক্তফ্রন্ট যখন গঠন হয় তখন ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ছিল না। তখন তাদের নামের সাথে মুসলিম শব্দ যুক্ত ছিল। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ইসলামের পক্ষের শক্তি হিসেবেই ছিলেন। নেজামে ইসলাম তখন পর্যন্ত এ দেশের ওলামায়ে কেরামের সর্ববৃহৎ সংগঠন ছিল। খেলাফতে রব্বানী পার্টিও তখন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ইসলামী দল হিসেবে পরিচিত ছিল। মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেছেন, সেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করা হবে না বলে উল্লেখ ছিল। আমি প্রসঙ্গত বলতে চাই 'কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করব না' এটা কিন্তু ইতিবাচক ইসলামী কথা নয়। এটা একটা নেতিবাচক কথা। ১৯৫৪ সালের পূর্বে আন্দোলনের সময় সরাসরি কুরআনের শাসনের কথাই ছিল। '৫৪-তে এসে হলো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন করা হবে না। '৭০ সনে নির্বাচনী বক্তৃতায় মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কণ্ঠের ক্যাসেট আপনারা খুঁজে পেলে অথবা পত্র-পত্রিকায় দেখবেন তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করবে না। নির্বাচনকে সামনে রেখে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না। এই কথাটা তারা অতীতেও অনেকবার বলেছেন। বাস্তবে '৭২-'৭৫-এ ক্ষমতায় এসে তারা কী করেছেন? সেটাই হলো তাদের আসল রূপ। '৫০- এর দশকের কথা আমি বলতে চাই না। '৫৬ সালের ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিরোধী তারা কোন ভাষায় করেছিলেন ঐ কথাও আমি বলতে চাই না। '৫৮-এর পার্লামেন্টে ডেপুটি স্পীকারকে হত্যা করে কি তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিলেন ঐ প্রসঙ্গও আমি এখানে টানতে চাই না। অতীতের অনেক কথা। '৬০-এর দশকের রাজনীতিতে একদিকে ভোটাধিকার গণতন্ত্র এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না এ কথাও বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে ১৯৭২ সালে যে সংবিধান তারা উপহার দিয়েছিলেন সেখানে ছিল সোস্যালিজম এবং সেক্যুলারিজমের কথা।

তাদের শাসনামলে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামের চিহ্নগুলো মুছে ফেলা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক' আয়াতটি মুছে ফেলা হয়েছিল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি ঠিক সেভাবে তুলে দেয়া হয়েছিল যেভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই পরিচয়টিকে সামনে রাখতে হবে।

ধর্মভিত্তিক বা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পর ১৯৭৫-এ গিয়ে সকল রাজনৈতিক দল এমনকি আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশাল গঠন করা হয়েছিল। এটাই তাদের পরিচয়। ১৯৭২-৭৫-এ তাদের কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হয় আওয়ামী লীগ ইসলামের বিপক্ষের একটি শক্তি, গণতন্ত্রের বিপক্ষের একটি শক্তি।

১৯৭৫- এর পর ২১ বছর তারা ক্ষমতার বাইরে ছিল। আবার '৯৬ তে ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েছিল। আমি অনেক অনুষ্ঠানে বলেছি এটা ছিল একটা জাতীয় দুর্ঘটনা। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের সাথে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের ভুল বুঝাবুঝি এবং তিক্ততার সুযোগে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ কি করেছে? ইসলামের পক্ষে কোন একটি কাজও তাদের নেই। তারা ১৯৭২-১৯৭৫-এ যা করেছিলেন তার চেয়েও বেশি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংসদে তাদের সে পরিমাণ সদস্য ছিল না, যে পরিমাণ সদস্য থাকলে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারতো এবং ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করতে পারতো। কিন্তু ইসলমী শক্তিগুলোকে নির্মূল করার জন্য তারা যে কৌশল প্রণয়ন করে তা ছিল- "কাউকে মারতে হলে আগে তার একটি বদনাম রটনা কর"।

এ দেশের ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য দেশের ভেতরে বাইরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি প্রচারণার আশ্রয় নেয়া হয়। সেই প্রচারণার মূল বক্তব্য ছিল- বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস করছে, ইসলামের নামে সন্ত্রাস করছে। এর প্রমাণ স্বরূপ তারা দুটি দলিল পেশ করে। একটি আওয়ামী লীগ শাসনামলে সকল দূতাবাসে ইংরেজি এবং আরবী ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় পুস্তিকার নাম ছিল "আল এরহাব বি-ইসমিল ইসলাম" ইংরেজি পুস্তিকার নাম ছিল "টেররিজম ইন দ্যা নেইম অব ইসলাম"। সারা দুনিয়ায় এই দুটি পুস্তিকার

মাধ্যমে বাংলাদেশের আলেম-উলামা, সকল ইসলামী শক্তিকে তারা সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের মনে বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির ব্যাপারে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে তারা চিরদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল। আর তাদের রাজনৈতিক প্রতিযোগী, প্রতিপক্ষ বিএনপি যাতে ইসলামী দলগুলোর সাথে ঐক্য গড়তে না পারে, ঐক্য গড়লে পশ্চিমা বিশ্বের বিরাগভাজন হয়, পশ্চিমা বিশ্বের আশীর্বাদ নিতে সক্ষম না হয়, সে জন্যই এই প্রচারণা চালানো হয়।

শুধু প্রচারনার মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা নিজেরা কিছু জঙ্গি সংগঠনের জন্ম দেয়। হরকাতুল জিহাদের নাম কখনও শুনিনি। কবি শামসুর রাহমানের বাড়িতে কে বা করা তার উপর চড়াও হয়। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। প্রাথমিকভাবে তাদের পরিচয় পাওয়া গেল-তারা সবাই ছাত্রলীগ করত। তাদের কাছ থেকে জবানবন্দী নিয়ে পাওয়া গেল তারা আসল দোষী নয়। তাদেরকে এই কাজ করতে কিছু সংখ্যক হুজুর উদ্বুদ্ধ করেছে। একটা গুজব রটানো হলো। ঐ গুজবটা কী? একটা ইসলামী সংগঠন যার নাম হরকাতুল জিহাদ। অন্তত আমি মতিউর রহমান নিজামী এ ঘটনার পর প্রথম এই নামটির সাথে পরিচিত হয়েছি। এর আগে এই নামের সাথে আমার পরিচয় ছিল না। আপনাদের কারও পরিচয় ছিল কিনা আমি জানি না।

এরপর আস্তে আস্তে আরও কিছু উগ্রপন্থী তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের নাম আসতে থাকে। এর মধ্যে যশোরের উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের মর্মান্তিক ঘটনায় অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তখন আমি দেশের বাইরে আরব আমিরাত সফরে ছিলাম। পত্রিকায় দেখেছি অনুষ্ঠানে হাসান ইমাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তার কোন এক ছাত্র তাকে একটি চিরকুট পাঠায় "স্যার, আপনি মঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি সরে যান"। হাসান ইমাম মঞ্চ ত্যাগের অল্প পরেই সেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয়। যদি সেদিন হাসান ইমামকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো তাহলে উদীচীর ঘটনা কারা ঘটিয়েছিল তা বেরিয়ে আসতো। এই সত্য আবিষ্কারের জন্য "মদিনা হুজুর" নামে একজন নিরীহ মানুষের কাপড়ের দোকানে অস্ত্র লুকিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইসলামী ছাত্র শিবিরেরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। তরিকুল ইসলাম সাহেবকে এই মামলার আসামী করে তাকেও হয়রানির শিকার বানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শাসনামলের ঐ ঘটনার তদন্ত করে আসল দোষী কারা তা প্রকাশ করা হয়নি। কারণ ঘটনা ঘটানো হয়েছে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে-ইসলামী শক্তিগুলোকে টেররিস্ট প্রমাণ করার জন্য।

এর পরে রমনা বটমূলে যে ঘটনা ঘটল সেখানেও ছিলেন হাসান ইমাম। দুষ্ট ছেলেরা ঠাট্টা করে বলতো- যেখানে হাসান ইমাম, সেখানেই বোমা। বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথেই বিটিভির মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে হাসান ইমাম ধারাভাষ্য দেয়া শুরু করে। এটা কারা ঘটিয়েছে এবং দশ মিনিটের মধ্যে কালো কাপড়ে সাদা অক্ষরে লেখা ব্যানার নিয়ে মিছিল শুরু হয়েছিল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখার ঘটনা ঘটলো। সেই মুফতি হান্নানের পারিবারিক পরিচয় সেই সময়ের পত্র-পত্রিকায় এসেছে- তার চাচা কি করে, তার ভাই কি করে। দেখা গেছে সে আওয়ামী ঘরনার লোক।

আওয়ামী লীগ আমলে মুফতি হান্নানকে গ্রেফতার করা হয়নি, জোট সরকার গ্রেফতার করেছে। অন্তত এই একটা ব্যাপারে জোট সরকারের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। শেখ হাসিনার প্রাণনাশের জন্য যে ব্যক্তিটি ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে ছিল সে শেখ হাসিনার শাসনামলে ধরা পড়েনি। কিন্তু জোট সরকারের আমলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিচার হবে, বিচার প্রক্রিয়া চলছে।

আওয়ামী আমলে কমিউনিস্ট পার্টির মহাসমাবেশেও বোমা বিস্ফোরণ হলো। তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, ঐ মৌলবাদীরা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, না আমরা তার এই কথার সাথে একমত নই। নারায়নগঞ্জে আওয়ামী লীগের নিজেদের অফিসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনারও কোন তদন্ত করা হয়নি।

এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদের অভ্যুত্থান ঘটছে দেশে-দেশের বাইরে এটা প্রমাণ করে ইসলামী শক্তি নির্মূল করার একটি পটভূমি, একটি প্রেক্ষাপট তৈরী করার জন্য আওয়ামী লীগ ৫ বছরব্যাপী এসব কাজ করেছে। তাদের আমলে তারা শায়খুল হাদীস সাহেবকেও পুলিশ হত্যার মামলায় জড়িয়ে ঐ উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেলকে গ্রেফতার করার পর ঢাকার অলিতে গলিতে ডিবি পুলিশ পাহারা বসিয়েছিল যাতে কোন প্রতিবাদ মিছিল না হতে পারে। অথচ তারা গণতন্ত্রের কথা বলেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে জুমার নামাজ শেষে মিছিল বের হতে পারে এটা অনুমান করে তারা মসজিদের মধ্যে টিয়ার গ্যাস মেরেছে, গুলি ছুঁড়েছে। জুতা পায়ে মসজিদর মধ্যে

ঢুকে কিভাবে মুসল্লীদের লাঠি পেটা করেছে, জুতা পেটা করেছে, লাথি মেরেছে এই দৃশ্য সম্ভবত ইহুদী-খ্রিস্টান দেশেও পাওয়া কঠিন। এটা হলো আওয়ামী লীগের পরিচয়।

কওমী মাদরাসা ধ্বংস করার জন্য সেখানে লাদেন বাহিনী, আল-কায়েদা বাহিনী আবিষ্কার করা হয়েছে। কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে এবং গোটা মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী প্রচারণা শুরু করা হয়েছিল। এগুলো নাকি জঙ্গি তৈরির আস্তানা। আমি আমার দুটি পুস্তিকায় প্রমাণ করেছি দুনিয়ার পরিচিত প্রতিষ্ঠিত কোন ইসলামী দলের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। ওলামায়ে কেরাম জঙ্গিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ ইসলাম তথাকথিত জঙ্গিবাদ অনুমোদন করে না।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বৃটিশদের উপমহাদেশ ত্যাগ করা পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম সন্ত্রাসের পথে আন্দোলন করেননি। তারা নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদের স্বাক্ষর রেখেছেন। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের সাধনা ছিল দেশের আলেম উলামা এবং ইসলামী দলকে সন্ত্রাসী হিসেব চিত্রিত করে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আর সেই সাথে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদরাসাগুলোকে জঙ্গি তৈরির আখড়া হিসেবে চিহ্নিত করে এগুলোকে কিভাবে কোণঠাসা করা যায় সে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এই হলো ১৪ দল ও মহাজোটের প্রধান শরীক দল আওয়ামী লীগের কিঞ্চিত পরিচিতি। এর সাথে বাকী ১৩ দলের যারা আছেন তাদের লোকজন থাক আর না থাক তাদের কণ্ঠ আরও বেশি জোরেশোরে বেজে উঠে। তারা কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, কেউ অতি বিপ্লবী এবং ধর্মকে আফিম মনে করার মত লোকও সেখানে আছে। নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী লোকেরা সেখানে আছে।

মরহুম শেখ মুজিবকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি যা চেয়েছিলেন তাকে কিছু লোক তার বিপরীতে নিয়ে গেছে। অনেক ঘটনাই এর সাক্ষী। তাকে দিয়ে একদলীয় বাকশাল গঠন করা হলো। সেই অশুভ শক্তি এখন আওয়ামী লীগের পেছনে। ১৪ দলের ১৩ দল আওয়ামী লীগের জন্য আন-লাকি থার্টিন হিসেবে প্রমাণিত হবে, হবেই ইনশাআল্লাহ। তাদের কারও সিট (সংসদে আসন) নেই। নির্বাচনেও ভবিষ্যৎ নেই। তারা শেখ হাসিনাকে পয়েন্ট অব নো রিটার্নে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। এরা সবাই উগ্র ধর্মবিরোধী, ইসলাম বিরোধী, ইসলাম বিদ্বেষী।

কাজেই আওয়ামী লীগ নিজে ইসলামের বিপক্ষে ভূমিকা রাখছে, তার সাথে এরা যোগ হয়ে আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধী ভূমিকাকে আরও জোরদার করছে। তার সাথে যোগ হয়েছে এলডিপি এবং জাতীয় পার্টি। এখন এদের কারণে মহাজোট হলো না মহাজট হলো এটাও ভবিষ্যতের রাজনীতির ইতিহাস বলে দিবে।

এই মহাজোটের মূল শক্তি আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের এই চিত্রটাকে আমরা সামনে রাখতে চাই। গত ২৯ ডিসেম্বর-২০০৬ শায়খুল হাদীস আজিজুল হক সাহেবের একটি বক্তব্য আমি কোন এক পত্রিকায় দেখলাম "শত্রুরা এবং বিভিন্ন মহল আওয়ামী লীগকে ইসলামের বিপক্ষের শক্তি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।" এটা প্রমাণ করার কি দরকার আছে? আওয়ামী লীগ নামে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের অবস্থান ইসলামের বিপক্ষে, বিপক্ষে এবং বিপক্ষে। জ্ঞানপাপী এবং বিবেকবর্জিত ব্যক্তি না হলে আর কেউ বলতে পারে না যে, আওয়ামী লীগকে ইসলামের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কোন জুড়ি নেই। ইসলামের বিপক্ষেই তাদের অবস্থান। সেক্যুলারিজমের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তারা ধর্মহীনতার স্বার্থই দেখেছে বারবার।

বাংলাদেশে ইসলাম একটি ফ্যাক্টর। নির্বাচনের আগে তারা নিজেদের বেশ-ভূষায় কিছু পরিবর্তন এনে, কিছু শ্লোগানে পরিবর্তন এনে, কোন কোন সময় কিছু কিছু ইসলামের নাম ব্যবহারকারীদের আশীর্বাদ নিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করে থাকে।

আমি পরিষ্কার বলতে চাই, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আর ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা এক জিনিস নয়। এ দেশের ছোট বড় যত ইসলামী দল আছে তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোকে গড়ে তোলার কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য আছে, অর্থনীতি কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তাদের বক্তব্য আছে, শিক্ষা-সংস্কৃতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাদের বক্তব্য আছে।

পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ তাদের দর্শন হিসেবে লিখিত দিয়েছে তারা সেক্যুলার-ধর্মনিরপেক্ষ। আর বাস্তবে তারা প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ যে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তার আসল পরিচয় ধর্মহীনতা। এরপর তারা

নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্লোগান দেয় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ।" এটা ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি ইসলামী লেবাসধারী দুই-চারজনকে স্টেজে বসিয়ে আশীর্বাদ নেয়া ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার আরেকটি কৌশল। তাদের সর্বশেষ কৌশল হলো শায়খুল হাদীস আজিজুল হক সাহেবকে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করাতে সফল হওয়া। ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। যিনি তাদের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, তিনিই পরবর্তীতে বলেছেন, এটা রাজনৈতিক কৌশল। আর কিছু বলার দরকার আছে কি? নির্বাচনী কৌশল! তার মানে নির্বাচনে সুবিধা আদায়ের জন্যে হুজুরদেরকে ব্যবহার করার একটি উদ্যোগ। আমি ঐ চুক্তির ব্যাপার পরে আসছি।

বলছিলাম দুটি পক্ষ। এক পক্ষে আছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টি। এই পক্ষের প্রধান শরীক দল বিএনপি। আমরা যেভাবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই এভাবে বিএনপি বলে না। কিন্তু ইসলামের ভিত্তিতে যারা রাজনীতি করতে চায় তাদেরকে নিষিদ্ধ করতে হবে এই কথাও তারা বলে না। বরং আওয়ামী লীগ ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করেছিল। তারা ইসলামী সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করেছিল, আর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী এনে "বিসমিল্লাহ" যোগ করেছিলেন। সেক্যুলারিজমের জায়গায় "আল্লাহর প্রতি ঈমান হবে সকল কর্মকাণ্ডের উৎস" এই কথা সংযোজন করেছিলেন। সমাজতন্ত্রকে সামাজিক ন্যায় বিচারে রূপান্তরিত করেছিলেন।

খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ মরহুমসহ এ দেশের ওলামায়ে কেরাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এই একটি ভাল কাজের জন্যে এবং এই কাজটি করে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু বাংলাদেশের ভেতরে নয়, বাংলাদেশের বাইরেও মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিও সহানুভূতি টানতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। অতএব, বিএনপি যত দিন 'বিসমিল্লাহ' এবং 'আল্লাহর প্রতি ঈমানের' এই দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে- এ দেশের আলেম ওলামা, ইসলামী দলের সহানুভূতি এবং সমর্থনও ততোদিন তাদের প্রতি থাকবে। কোন দিন যদি তারা এই দর্শন ত্যাগ করে, তাহলে তখন তাদের প্রতি সমর্থনের ভিত্তিই থাকবে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিসমিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণার উপরে তারা আছে বলে আমরা মনে করছি।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই উদ্যোগের কারণে আজকে খেলাফত আন্দোলন বলেন, খেলাফত মজলিস বলেন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বলেন আর ইসলামী ঐক্যজোট বলেন, জামায়াতে ইসলামী বলেন, এই সব ইসলামী দল গণমানুষের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। বিএনপি আমাদের মত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা না চাইলেও ইসলামী রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থা যারা কায়েম করতে চায় তাদেরকে তারা সম্মান করে। তারা তাদের কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করার পক্ষপাতি নয়। এখনও পর্যন্ত নয়। ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ ভাল জানেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের উদ্যোগেই মাদরাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিমের সার্টিফিকেট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এর সমমান পায়। ১৯৯১-এর পরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সার্থক উত্তরসূরী বেগম খালেদা জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রের উপরে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেন।

আর এবার ক্ষমতায় এসে জোট সরকারের যাত্রা শুরুর সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষাকে উন্নত ও যুযোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিটি করা হয়েছিল। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রস্তাবকে সামনে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফাজিল ও এবং কামিলকে যথাক্রমে স্নাতক ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান প্রদানের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে এবং পার্লামেন্টে এ ব্যাপারে আইনও পাস হয়েছে। একই সাথে কওমী মাদরাসার সনদেরও স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইসলামের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটা জোট সরকারের একটা বড় প্রয়াস ছিল।

জোট সরকার কর্তৃক সরকার গঠনের পরপরই দেশের ভেতরে-বাইরে আওয়ামী বলয় প্রপাগাণ্ডা জোরদার করে যে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান হয়েছে, ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে। এই প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের প্রধান শরীক দলের উপরে তারা মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়, যাতে করে ইসলামী দলগুলোকে তারা বোঝা ভাবতে বাধ্য হয়।

এভাবে ইসলামের নামে জঙ্গি তৎপরতা মূলত ইসলামী আন্দোলনকে খতম করার এবং জোট সরকারকে বেকায়দায় ফেলারই একটা নীল নকশার অংশ ছিল। এটা আরও জোরদার করার জন্য তারা উৎসাহবোধ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বিমান হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর। এটার

জন্য আসল দায়ী কারা? এর রহস্য উদঘাটন না করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য তদন্ত ছাড়াই মুসলমানদের উপর এর দায়-দায়িত্ব চাপানো হলো। এই অজুহাতে আফগানিস্তানে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলো। আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসন চলছিল। তালেবানদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের সাংঘাতিক এলার্জি। অতএব, আফগানিস্তানে এই ঘটনা ঘটার পর আমাদের বন্ধুরা উৎসাহিত হলো। যদি এটা প্রচার করে পশ্চিমা বিশ্বকে বিশ্বাস করানো যায় যে, বেগম খালেদা জিয়ার সরকারে তালেবান আছে, পার্লামেন্টে তালেবান আছে, তাহলে বোধ হয় আফগানিস্তানে যেভাবে যুদ্ধ করে তালেবান সরকারের পতন ঘটিয়ে তাদের পছন্দের সরকার গঠন করেছিল, একটা হস্তক্ষেপ হয়েছিল, যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশেও তাই করা হবে। কিন্তু সে রকম কিছু না ঘটায় হতাশ হয়ে তারপর তারা পার্লামেন্টে আসে।

এভাবে এই প্রচারণার একটা পর্যায়ে বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা হলো। জোট সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল, তখন যে ব্যক্তিটির দিকে শেখ হাসিনা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন সে ব্যক্তিকে এখন নৌকা মার্কায় নির্বাচন করতে হচ্ছে এবং যে প্রতিষ্ঠানটির নাম নিয়েছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানটির প্রধানকে এখন নৌকা মার্কায় নির্বাচন করতে হচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তির কারণে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব তাদের সাথে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন অথবা করতে গিয়ে একটা পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। আমি কথা বেশি বাড়াতে চাই না। কথায় কথা আসে। আমি বলতে চেয়েছিলাম একটা ঐ পক্ষ আর তাদের চরিত্র এই।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বলা হয় জামায়াতে ইসলামী এই পাঁচ বছরে কি করেছে ইসলামের পক্ষে? আমি বেশি কথা বলতে চাই না। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চক্র এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াসমূহ পরবর্তী আফগানিস্তানে পরিণত করার ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করেছিল। সংসদের ভেতরে-বাইরে তাদের এ চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য জামায়াতে ইসলামী এ দেশের আলেম উলামাদেরকে সাথে নিয়ে এককভাবে ভূমিকা পালন করেছ। পার্লামেন্টে আফগান ও ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে কে কথা বলেছিল? দেশের পত্র-পত্রিকার পাতা খুলে দেখেন আফগানিস্তানে যুদ্ধ যখন চলে তখন জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে আমি যে কথা বলেছি তার ধারে কাছেও আর কেউ বলেছে কিনা? ইরাক যুদ্ধের আগেও বলেছিলাম সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইরাকের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ আর সম্প্রসারিত হবে। যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি সংসদে একই বক্তব্য রেখেছি।

সংসদে খতমে নবুয়্যত প্রসঙ্গে কেবল আমিই কথা বলেছি। ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে তিনজন মুফতি পার্লামেন্টে ছিলেন। পার্লামেন্টের নথিপত্র খুঁজে দেখেন কেউ এ ব্যাপারে একটি কথাও বলেছেন কিনা? আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছি এবং আমি কথা বলতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়েছি। আমি প্রমাণ দিয়ে বলেছি রাসূল (সাঃ) কে যারা শেষ নবী মানেন না তারা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। ওলামায়ে কেরামের এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ওআইসির ফিকাহ একাডেমীর রেজুলেশন পড়ে শুনিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছি।

ইসলামের ভিত্তিতে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জামায়াতে ইসলামী ভূমিকা রেখে আসছে। এ জন্য আমরা মনে করি আমাদের সাংগঠনিক দিকটি সম্প্রসারিত করতে হবে, মজবুত করতে হবে। ইসলামী দল একক শক্তিতে অথবা সবগুলো ইসলামী শক্তি সম্মিলিত শক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে আসার আগে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও চালু করা যায় কিনা এর ইতিহাস তো গোটা পঞ্চাশের দশকে আছে। একটু আগেও বলেছি '৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্টের শরীক দল আওয়ামী লীগেরও সাথে মুসলিম ছিল, আর বাকি তিনটির দুটি ডাইরেক্ট ইসলামী দল ছিল। শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবও ইসলামের পক্ষের শক্তি ছিলেন। কিন্তু সরকার গঠন করার পরও ইসলামী রাষ্ট্র হয়নি। কাজেই জামায়াতে ইসলামী বাস্তববাদী। জামায়াত জনগণকে সাথে নিয়ে, জনগণকে তৈরি করে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নিয়ে ইসলামের পক্ষে অর্থবহ পরিবর্তন আনতে চায়। এ কথা আমরা সংসদের ভিতরেও বলেছি, বাইরেও বলেছি এবং সর্বক্ষণ আমরা এ কাজে আছি। এ কাজের বিপক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে যেসব চক্রান্ত হচ্ছে আমরা সেগুলোর মোকাবিল করছি এবং এগুলোর মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা শুধু জামায়াতের পক্ষে কথা বলিনি, এ দেশের সকল উলামায়ে কেরাম এবং সকল ইসলামী দলের পক্ষে পার্লামেন্টের ভেরত-বাইরে কথা বলেছি। অতএব, জামায়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

আমি এখন আসতে চাই, চুক্তি প্রসঙ্গে। আসলে এ চুক্তিটা আহামরি এমন কিছু বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এতে কোন পক্ষের খুশি হওয়ার, পুলকিত হওয়ার কিছু নেই। আবার কোন পক্ষের রুষ্ট হওয়ারও তেমন কিছু নেই। আমি লক্ষ্য করছি-উলামায়ে কেরাম এতে গর্বিত হননি, শংকিত হয়েছেন-হায়! হায়! কি সর্বনাশ হয়ে গেল!

আওয়ামী লীগের অবস্থান এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বেরও পক্ষে নয়, ইসলামী মূল্যবোধেরও পক্ষে নয়। আজিজুল হক সাহেবের সাথে একটি চুক্তিতে সাময়িক কিছু বিভ্রান্তি হতে পারে এবং এটা আওয়ামী লীগের ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার একটি কূটচাল ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনাক্রমে তিনি কূটচালের শিকার হয়েছেন।

এতে এক নাম্বারে বলা হয়েছে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন তারা করবে না। এটা কি নতুন কথা? এটা তো আওয়ামী লীগ ১৯৫৪-তেও বলেছে, ১৯৭০-এও বলেছে। কিন্তু দুই দুইবার ক্ষমতায় গিয়ে তারা কি করেছে সেটা সবার জানা আছে।

তারা চুক্তি করেছে-কওমী মাদরাসার সনদের সরকারি স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। আচ্ছা এই কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি দিল কে? এটা দিয়েছে জোট সরকার। জোট সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে আর আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা এর বিরোধিতার করেছে। কওমী সনদের স্বীকৃতিকে নিয়ে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা ব্যঙ্গ করে লেখালেখি করেছে। আওয়ামী লীগ নিজেও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে। তারাই নাকি এটা বাস্তবায়ন করবে। এটার বাস্তবায়ন যদি ওলামায়ে কেরাম, আসাতেজায়ে কেরাম এবং ছাত্ররা চান তাহলে জোট সরকারকে ক্ষমতায় আনার কোন বিকল্প নেই।

তারা চুক্তি করেছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে। বলুন তো এটা কি চুক্তি করে বলার জিনিস। উনারা কি চেয়েছেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তারা চেয়েছেন, যারা আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) সর্বশেষ নবী মানে না তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু জলিল সাহেব স্পষ্ট বলেছেন, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার নেই। তাহলে এখানে ধোঁকা খেয়েছেন। মোমেনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ধোঁকা দেয় না, ধোঁকায় পড়েও না। এখানে রীতিমত ধোঁকা খাওয়া হয়েছে। ইতিহাস এটা প্রমাণ করবে।

তারা আরো চুক্তি করেছেন, সনদ প্রাপ্ত আলেমরা ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবেন। সনদবিহীন কোন ব্যক্তি ফতোয়া দিতে পারবেন না। ফারায়েজের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কাছে আসা কি বন্ধ হয়েছে? বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আসা কি বন্ধ হয়েছে? আওয়ামী লীগ শাসনামলে ফতোয়া দানকে নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টে রায় প্রদান করা হয়। যে জাস্টিস সাহেব এই রায় দিয়েছিলেন তিনি এখন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী। আওয়ামী রাজনীতির ধারক-বাহক হিসেবে তিনি

কলাম লেখেন, নিবন্ধ লেখেন। এর পরে রায় স্থগিত আছে। এই রায় স্থগিত থাকার কারণে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া দেয়ার অধিকার সংরক্ষিত আছে এবং ভাল করে এই কেস ডিল করলে ঐ রায় বাতিলের সুযোগ আছে।

কাজেই এখানে তারা নতুন কিছু অর্জন করেছেন এটা মনে করার কোন কারণ নেই। চুক্তির শেষ পয়েন্টটা হলো, নবী-রাসূল ও সাহাবা কেরামের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও কুৎসা রটনা দণ্ডনীয় অপরাধ। আওয়ামী লীগের আমলে দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে কি আওয়ামী লীগ কোন ব্যবস্থা নিয়েছিল? দাউদ হায়দারকে তারা নিরাপদে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে কোন আইনের আওতায়? তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন হয়েছিল এ দেশে কুরআনের বিরুদ্ধে, রাসূলের বিরুদ্ধে বলার কারণে, তখন আওয়ামী লীগের ভূমিকা কি ছিল? তসলিমা নাসরিনের ইসলাম অবমাননা, কুরআন অবমাননা, আল্লাহর রাসূলের অবমাননার ব্যাপারে তারা কি তসলিমা নাসরিনের বিপক্ষে না পক্ষে ছিল?

এ চুক্তিটা আওয়ামী লীগের জন্য একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং হুজুরদের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের সমস্যা-তাদের প্রগতিশীল বন্ধুরা সাংঘাতিকভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা যদি পড়তেন, বদরুদ্দিন ওমরের লেখা যদি পড়তেন; আরও অনেকেই লিখছে কত বলবো? এর ফলে আওয়ামী লীগ তাদের ঘরের মধ্যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। তারা যে সমস্ত সমঝোতা করেছে বুঝে শুনেই করেছে। চুক্তি বলেই কি মানতে হবে? আবদুল জলিল সাহেব বলছেন এটা একটা কৌশল। পরের দিনই শেখ হাসিনা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতিনিধিদেরকে বলেছেন, বাংলাদেশ একটি সেক্যুলার দেশ, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এই চুক্তি যদি আন্তরিকতার সাথে স্বাক্ষর করে থাকেন তাহলে তাদের বলতে হবে যে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা আজ থেকে বর্জন করছি। তারা এটা বলেননি। বরং হুজুরদের দিয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হুজুরদের দিয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয় আওয়ামী লীগের অবস্থান ইসলামের বিপক্ষে প্রমাণের চেষ্টা করছে।

আমরা এ ধরনের কথা বলি না। আমি বলছিলাম এ চুক্তি আওয়ামী লীগের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগকে এ সমস্যা উৎরাতে হবে।

একথা তারা বললেই হয়, 'এ রকম চুক্তি অতীতে কত করেছি। চুক্তি করলেই মানতে হবে কেন'? আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করেছে,

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, সেই আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়্যত আন্দোলনের মহাসচিব তিনিও কিন্তু ১৪ দলের কাছে গিয়ে তাদের সাথে সমঝোতা করেছেন। তাহলে জোট সরকারের আমলে কাদিয়ানী স্থাপনা দখল করার জন্যে যারা উগ্র কর্মসূচি দিয়েছিলেন তারা আসলে ওদেরই লোক। সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য বাংলাদেশে উগ্রবাদীরা আছে, ধর্মান্ধতা আছে, সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়, এই সব কথার প্রমাণ পশ্চিমা জগতের কাছে সরবরাহ করার জন্য তারা ভাড়ায় খেটে এ কাজগুলো করেছেন। এদের ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ এবং সোচ্চার থাকতে হবে।

জোট সরকারের ইসলামের পক্ষের আরেকটা অবদানের কথা বলছি। আওয়ামী লীগ কওমী মাদরাসা ধ্বংস করার জন্য কওমী মাদরাসায় লাদেন বাহিনী, আল-কায়েদা বাহিনী আবিষ্কার করে তাদের উপর আঘাত করেছে। আর আলীয়া নেসাবের মাদরাসা বন্ধ করার জন্য এমপিও বাতিল করার সিদ্ধান্ত পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করছিল। ৩০০ মাদরাসার এমপিও তারা বাতিল করেছিল। এর পরে আরও শত শত নতুন মাদরাসা এমপিওভুক্ত হয়েছে। জঙ্গিবাদের মোকাবিলায় জোট সরকার সন্তোষজনক ভূমিকা রেখেছে।

জঙ্গিবাদকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের পক্ষের মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা একযোগে বাংলাদেশের বিপক্ষে পশ্চিমা বিশ্বকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য সাধনা করেছেন, প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন।

আমাদের প্রতিবেশী দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু মিডিয়ার সাথেও তাদের চুক্তি হয়েছে। আমি এই কিছুদিন আগে একটি বই দেখেছিলাম "Bangladesh the next Afghanistan"। এ বই আমাদের প্রতিবেশী দেশের একজন বুদ্ধিজীবী লিখেছেন। প্রকাশনা উৎসব হয়েছে সেদিন, যেদিন গাজীপুর ঐ জেএমবির লোকেরা আত্মঘাতী বোমা হামলায় কয়েকজন এডভোকেটকে হত্যা করেছে। এ বই যারা লিখেছেন তাদেরকে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছেন আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা। যাদের নাম ওখানে আছে তারা আওয়ামী সমর্থক।

এর মোকাবেলায় জোট সরকার আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। এ দেশের মানুষ যাদের কাছ থেকে, যাদের মুখ থেকে ইসলামের কথা শুনে আসছে তারা জঙ্গি নয়।

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা যে অল্প দিনে সম্ভব হয়েছে তার প্রধান কারণ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয় কারণ এ দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী দলগুলো জঙ্গিবাদকে অনুমোদন করে না।

তারা সমস্বরে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করেছেন, যারা ইসলামের নাম নিয়ে জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছে তারা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী। তারা ইসলামের দুশমনদের হাতের পুতুল, হাতের খেলনা। এ কারণেই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন সফল হয়েছে, তেমনি জঙ্গিবাদের অপবাদ থেকে বাংলাদেশকে আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করেছেন। এ দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী দল-সংগঠন যে এ অপবাদ থেকে মুক্ত এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জোট সরকার এবং জোট সরকারের শরীক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রেখেছে।

আমি এ কয়টি কথা বলে আপনাদের কাছে উল্লেখিত চুক্তি সম্পর্কে একটা চুটকি বলে আমার কথা শেষ করতে চাই। যদিও আমি চুটকি বলতে অভ্যস্ত নই। উর্দূ ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যার অর্থ 'হাতি দেখায় বাহিরের দুই দাঁত, কিন্তু খেতে ব্যবহার করে ভিতরের দাঁত'। এ চুক্তি হাতির বাহিরের দাঁত। ওলামায়ে কেরামকে সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে এ বিভ্রান্তি যাতে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনকে স্পর্শ করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

অতীতের ন্যায় চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় এনে আওয়ামী লীগের বৈরী মনোভাবের মোকাবিলা করে এ দেশের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে হেফাজত করতে হবে। আগামী নির্বাচনে চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করে আওয়ামী অপরাজনীতিকে, তাদের গণতন্ত্রের উপরে লাঠিতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এ অশুভ চক্রান্তকে আবার পরাজিত করতে হবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে দেশের সকল ওলামায়ে কেরাম এবং দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এ আহ্বান ও আবেদন জানিয়ে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

উনিশতম অধ্যায়

জোট সরকারের সাফল্যে দু'জন মন্ত্রীর ভূমিকা

২০০১ সালে দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে চার দলীয় জোট সরকার গঠন করে। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে দেশবাসী ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করে ৪ দলীয় জোটকে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী আসনে বিজয়ী করে সরকার গঠনের সুযোগ করে দেয়। জোটের অন্যতম শরীক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করে। আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপরে প্রথমে কৃষি ও পরে শিল্পমন্ত্রণালয় এবং সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের উপরে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়। বিগত পাঁচ বছরে (২০০১-২০০৬) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের দুজন শীর্ষ নেতা ও মন্ত্রী দেশবাসীর সামনে প্রমাণ করে দিয়েছেন, যে এ যুগেও সকল প্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও যাবতীয় অন্যায়-অবিচার হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে সততা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে সরকার পরিচালনা করা সম্ভব।

পরবর্তীকালে কেয়ারটেকার সরকার নামে কথিত দু'বছর মেয়াদী (২০০৭-০৮) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে দুর্নীতি বিরোধী সাঁড়াশী অভিযানে জামায়াতের এই দুজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাদের তিনটা মন্ত্রণালয়ে কোন প্রকার দুর্নীতির প্রমাণ না পাওয়া তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সফল মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

চারদলীয় ঐক্যজোট ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয় লাভ করে। এ নির্বাচনে জামায়াত পার্লামেন্টে ১৭টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের পর্যায় অতিক্রম করার পর আসে সরকার গঠনের পালা। চারদলীয় জোট সরকার গঠন করে। জামায়াতকে কৃষি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রদান করা হল এককভাবে বিএনপির হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। এখানে জামায়াতের কোন পছন্দ-অপছন্দকে বিবেচনা করা হয়নি। মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর ২০০১ তারিখ সন্ধায়। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন। মাওলানা নিজামী অল্প দিনের মধ্যেই সমস্যাগ্রস্থ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা

করে দেশ ও জাতির সেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ২০ মে ২০০৩ তারিখে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দু'টো মন্ত্রণালয়েই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন তিনি। মন্ত্রণালয় পরিচালনায় তিনি যে দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য এবং উদাহরণ যোগ্য।

বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনাব নিজামীর দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। জামায়াতে ইসলামীর আমীর, সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী এবং চারদলীয় ঐক্যজোটের শীর্ষ নেতা হিসেবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে সরকারের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি বিবেচনা করা হত।

কৃষি মন্ত্রণালয়ে মাওলানা নিজামীর অবদান

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই মাওলানা নিজামী কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েই তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সক্রিয় হন। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনপূর্বক রফতাণীযোগ্য কৃষি পণ্যের ব্যাপক উৎপাদনের লক্ষ্যে সচিবালয় থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত কৃষি সেক্টরে তিনি প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চার করতে মনোযোগী হন।

কৃষকদের বহু কষ্টার্জিত উৎপাদিত ফসলে ন্যায্য পাওনা, উন্নত সার বীজ, কীটনাশকসহ যাবতীয় কৃষি উপকরণের সহজ লভ্যতার উপর জনাব নিজামী বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাদের যাবতীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সফরের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, বিজ্ঞানী ও কৃষকদের মাঝে অভূতপূর্ণ প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। মাওলানা নিজামী কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন কালে "চাষীর বাড়ি, বাগান বাড়ি" শ্লোগানকে দেশব্যাপী জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত করেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিটি কৃষকের বাড়িকে এক একটি বাগান বাড়ি হিসেবে গড়ে তুলে নিজেদের চাহিদা পূরণ, বাড়তি উপার্জন এবং স্বাবলম্বীতা অর্জন সহজ হয়েছে।

মাওলানা নিজামীর ব্যক্তিগত অভিপ্রায় দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান পৃথকভাবে ফলজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

তাঁর দিক নির্দেশনায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ছাড়িয়ে উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলাও সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের কৃষি উন্নয়নে মাওলানা নিজামীর অন্যান্য উন্নয়ন যোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো বিএডিসি বীজ উইং শক্তিশালী করণ, মাটির গুণগত মান পরীক্ষাকরণ, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পর্যালোচনা, কৃষিবিদ কৃষিবিজ্ঞানীদের যথাযথ পদোন্নতি এবং ব্লক সুপারভাইজার পদবী আপ-গ্রেড আকারে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পদ চালু করায় তাদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা বেশ বেড়ে যায়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাওলানা নিজামীর অবদান

২০০৩ সালের ২৫ মে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ২০ মাস দায়িত্ব পালনের পরে মাওলানা নিজামীকে বাকী প্রায় ৪০ মাসের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সরকার প্রধানের উদ্দেশ্য– ভেঙ্গে পড়া বিপর্যস্ত রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতকে পুনরুজ্জীবিত গতিশীল ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনা।

দায়িত্ব নিয়েই মাওলানা নিজামী দেশের শিল্প ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চারের ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পান। বাংলাদেশের শিল্পখাতের সমস্যাগুলো তিনি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে পৃথক শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। এ নীতি প্রণয়নকালে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা ও সংগঠন উন্নয়ন সহযোগী সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করেন। নতুন শিল্পনীতি অনুযায়ী ২০০৫ সালে ৩২টি শিল্পকে থ্রাসট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলোর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। দেশের সামগ্রিক শিল্পখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি দিক নির্দেশনা কমিটিও গঠন করা হয়।

চার দলীয় জোট সরকারের আমলে মাওলানা নিজামীর দায়িত্বাধীন শিল্পমন্ত্রণালয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যা দেশের শিল্পাংগনে নতুন প্রাণ স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। দেশের মিশ্রসারের চাহিদা এ্যামোনিয়াম ফসফেট ডিপিএ-১ ও ডাইএ্যামোনিয়াম ফসফেট ডিপিএ-২, নামে দুটি নতুন সার কারখানা স্থাপিত হয়। তাঁরই ঐকান্তিক ইচ্ছায় কর্ণফুলী পেপার মিলের বন্ধকৃত কস্টিক ক্লোরিন প্লান্ট, খুলনা হাডবোর্ড মিল এবং রংপুর সুগার মিল পুনঃচালু হয়। এ দুটো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানই এতটা লাভজনক প্রমাণিত হয় যে গত

এক যুগের লোকসানের স্থালে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো ৭০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

লবণ উৎপাদিত হয় দ্বিগুন, ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ উন্নয়নের জন্য হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারী শিল্পকে সাভারে স্থাপিত চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়া ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ ও অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের জন্য পৃথক শিল্প নগরী গড়ার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। মাওলানা নিজামী মন্ত্রণালয়ের বিসিকের মাধ্যমে উন্নয়নযোগ্য অর্জন হলো, ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৭৫ জনের নতুন কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রফতানি আয় বৃদ্ধি, বিএসটিআই- এর আধুনিকায়ন, ফুড ফর্টিফিকেশন এলায়েন্স গঠন, ন্যাশনাল এসিডিটেশন এবো গঠন ইত্যাদি।

সফল মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে একটি সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং জোট নির্ভর রাজনীতির প্রবর্তন এবং চার দলীয় জোটের প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক অবদান রাখার জন্য আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ রাজনীতি সচেতন মানুষের নিকট একজন গ্রহণযোগ্য ও সম্মানীত ব্যক্তিত্ব। জোটের রাজনীতির প্রবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা কেননা এর মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে একই প্লাটফর্মে আনা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তিনি কার্যকর ভূমিকা পালন করেন।

২০০১ সাল থেকে চারদলীয় জোট সরকারের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পিত হয়। তিনি সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে অত্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করাকালীন সময়ে তিনি মাদারীপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদারীপুর এবং নিজ জেলা ফরিদপুরে অসংখ্য সামাজিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের অবদান

২০০১ সালে জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ যখন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন, তখন তা একটি দুর্বল বা লো প্রোফাইল মিনিস্ট্রি হিসেবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তাঁর দায়িত্ব পালনের ৫ বছরের মেয়াদের শেষে এটি হাই প্রোফাইল তথা আলোচিত মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়।

তিনি নিয়মিতভাবেই তাঁর মন্ত্রণালয়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সারপ্রাইজ ভিজিটে যেতেন। এর মাধ্যমে তিনি মন্ত্রনালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তাদের দুর্নীতি কমানোর চেষ্টা করেছেন এবং তাতে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিশু সদন (সরকারী এতিমখানা) নির্মান করেন। যা সমাজের ভাগ্যহত ও অনগ্রসর কিশোর কিশোরীদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে ব্যপকভাবে সাহায্য করে। মন্ত্রণালয়ের বাজেট মাত্র ৫ বছরে ৫ গুনেরও বেশী বৃদ্ধি পায়।

তিনি তার মন্ত্রীত্বের ৫ বছরে ছোট খাট নানা অনুষ্ঠান ছাড়াও ৪০টিরও বেশী আলোচিত প্রোগ্রাম করেন যেখানে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যোগ দেন। তার যোগ্য নেতৃত্বে ২০০৪ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম প্রতিবন্ধী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি 'মুক্তা' নামক একটি মিনারেল ওয়াটারেরও প্রবর্তন করেন। যা প্রতিবন্ধীদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত এবং বাজারজাতকৃত। তার এই উদ্যোগের কারনে বাংলাদেশের নাম তখন বিশ্ব দরবারে ভিন্নভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। তার সময় প্রতিবন্ধী অলিম্পিকেও বাংলাদেশ সফলতা অর্জন করে।

এছাড়া সুদ মুক্ত ঋণ ও এসিডদগ্ধদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাতা প্রদান করা হয় তার সময়ে। জনাব মুজাহিদ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ঘুরে ঘুরে নিজে এই ভাতা বিতরন করতেন। তাই তার সময়ে গ্রামের অভাবী মানুষ সুদ খোর মহাজন এবং বেসরকারী সংস্থার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সরকারের কাছ থেকে বিশেষত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাত থেকে ঋন নিতে শুরু করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে জামায়াতের রচিত সাহিত্য

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ সন পর্যন্ত জামায়াত ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী যে সকল সাহিত্য রচনা করেছে তার কিছু নিম্নে দেয়া হল ঃ

সন		বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১৯৮১	১	মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	পরিচিতি (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
১৯৮২	১	তাফহীমুল কুরআন সারসংক্ষেপ আমপারার তাফসীর	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য	অধ্যাপক গোলাম আযম
১৯৮৩	১	সংগঠন পদ্ধতি	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
	২	ইসলামী বিপ্লব সাধনে অধস্তন দায়িত্বশীলদের ভূমিকা	অধ্যাপক মুহা. ইউসুফ আলী
১৯৮৪	১	অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী	অধ্যাপক গোলাম আযম
১৯৮৫	১	জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী-২	-
১৯৮৬	১	জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (১ম খণ্ড)	আব্বাস আলী খান
১৯৮৭	১	বাইয়াতের হাকিকত	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী	অধ্যাপক গোলাম আযম
	৩	রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা	অধ্যাপক গোলাম আযম
১৯৮৮	১	পলাশী থেকে বাংলাদেশ	অধ্যাপক গোলাম আযম
১৯৮৯	১	An Introduction to Bangladesh Jamaate Islami	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
	২	ইসলামী আন্দোলন সমস্যা ও সম্ভাবনা	মাও. মতিউরর রহমান নিজামী
	৩	ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ	মাও. মতিউরর রহমান নিজামী
১৯৯০	১	জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি	অধ্যাপক গোলাম আযম
১৯৯১	১	ইসলামী আন্দোলন সবরের পথ	মাও. আব্দুস শহীদ নাসিম
১৯৯২	১	খাঁটি মুমিনের সহীহ জযবা	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন	অধ্যাপক গোলাম আযম
	৩	রুকনদের মান বৃদ্ধির গুরুত্ব	অধ্যাপক গোলাম আযম
১৯৯৩	১	দেশ গড়ার ডাক	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান	আব্বাস আলী খান
১৯৯৪	১	সমাজ কল্যাণ ম্যানুয়াল	সরকার মুহা. রমজান আলী
১৯৯৫	১	ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন	অধ্যাপক মুহা. ইউসুফ আলী

সন		বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১৯৯৭	১	মৃত্যু যবনিকার ওপারে	আব্বাস আলী খান
১৯৯৮	১	ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী	আব্বাস আলী খান
	২	বাংলাদেশের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ	অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
	৩	মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি	অনু. আব্বাস আলী খান
	৪	রুকনিয়াতের আসল চেতনা	অধ্যাপক গোলাম আযম
	৫	একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ ঃ তার থেকে বাঁচার উপায়	আব্বাস আলী খান
১৯৯৯	১	ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির আত্ম পর্যালোচনা ও মানোন্নয়ন	অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
২০০১	১	ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	২	জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
২০০২	১	মুমিনের পারিবারিক জীবন	অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
২০০৩	১	এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতংকিত করেছে বিশ্বের মানুষকে	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	২	রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	৩	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামকে সচেতন থাকতে হবে	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
২০০৪	১	ইসলামী ঐক্য মঞ্চ চাই	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	নারী সমাজে দাওয়াত ও সংগঠন সম্প্রসারণের উপায়	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	৩	ইসলামী আন্দোলনে কর্মীর কাজ	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
২০০৫	১	ইসলামী ঐক্য আমাদের করণীয়	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	২	প্রসঙ্গঃ জঙ্গিবাদ বোমাহামলা ও ইসলাম	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	৩	বোমা হামলাকারীরা দেশ গণতন্ত্র ও ইসলামের শত্রু	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	৪	আসুন বোমাবাজদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিহত করি	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	৫	Islam and Democracy	Muhammad Kamaruzzaman
২০০৬	১	আদর্শ রুকন	অধ্যাপক গোলাম আযম
	২	তাফহীমুল কুরআন সারসংক্ষেপ ২৯ পারার তাফসীর	অধ্যাপক গোলাম আযম
	৩	দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে	মাও. মতিউর রহমান নিজামী
	৪	ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঃ ওলামায়ে কেরামের বলিষ্ঠ ভূমিকা	মাও. মতিউর রহমান নিজামী

২০০৬ সালের রাজনৈতিক সংকট এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র

২০০৬ সালের অক্টোবর মাস শেষে চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ পূর্তিতে সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার কথা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান দায়িত্ব ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা। সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরগ্রহণকারী প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কথা।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসতে থাকে। আওয়ামী লীগ চার দলীয় জোট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য বহু চেষ্টা করেও সফল না হওয়ায় তারা বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে মাঠে নামে। তাদের একটি দাবি ছিলো সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে. এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করা চলবে না। বিশ বছর পূর্বে আইনজীবী থাকাকালে তিনি নাকি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের আরেকটি দাবি ছিলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম. এ আযিযসহ নির্বাচন কমিশনের সকল কমিশনারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

ক্ষমতাসীন জোট ইস্যুগুলো নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে সংলাপের আহ্বান জানায়। আওয়ামী লীগ ৫ সদস্যের একটি তালিকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিবের নিকট পাঠায়। চার দলীয় জোট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে দুইজন এবং বাকি তিন শরিক দল থেকে একজন করে প্রতিনিধির নাম দেয়। এদিকে সংলাপ কমিটিতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের কেউ থাকলে আওয়ামী লীগ সংলাপে না আসার একটি অযৌক্তিক দাবি পেশ করে।

পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক আবদুল জলিল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মধ্যে সংলাপ চলে। সংলাপে প্রধান উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছতে না পাড়ায় দুই সপ্তাহের দীর্ঘ সংলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হতে থাকে। তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ তাঁর "শান্তির স্বপ্নে" বইয়ে তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন-

"মূলত ২৩ অক্টোবর ২০০৬ তারিখই ছিলো জোট সরকারের শেষ কার্যদিবস। কেননা এরপর পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের ছুটি। ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবস ২৮ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখ সরকারের শেষ দিন। এদিনকে সামনে রেখে দু'দলই মাঠ দখলে রাখার অভিপ্রায়ে শক্তি প্রদর্শনে তৎপর হলে সারাদেশ জুড়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার এক ধরনের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ২৭ অক্টোবর ২০০৬ তারিখ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে সংবিধান সমুন্নত রেখে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাষণ শেষ হতেই চারদিকে হামলা, ভাংচুর আর লুঠতরাজের সংবাদ আসতে থাকলো। চট্টগ্রামে ২৯ অক্টোবর থেকে লাগাতার হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হলো। ঢাকার রাজপথ দখলে দুই দলের মারমুখী কর্মীরা থেকে থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো।

এমতাবস্থায় দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ দেখিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি কে. এম. হাসান প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "কোনো বিশেষ মহল বা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও এদেশের নাগরিকদের স্বার্থের কথা ভেবেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তাঁর এ সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করলেও সাংবিধানিক সংকট তখন শুরু হয়েছে মাত্র।

২৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে পুরো দেশ যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশই সেদিন বস্তুত অচল হয়ে পড়েছিলো। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঝরে গিয়েছিলো অনেকগুলো তাজা প্রাণ। শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে মানুষ এতো হিংস্র হতে পারে, নিজ চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রকাশ্য দিবালোকে বিভিন্ন চ্যানেলে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে এসব নৃশংস ঘটনা ঘটলো। রাতে নির্মম এসব হত্যাকান্ডের দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।

সাবেক প্রধান বিচারপতি কে.এম হাসান প্রধান উপদেষ্টা পদ গ্রহণে অসম্মতি জানানোর সাথে সাথে বিচারপতি হামিদুল হকও সেই পথে হাঁটলেন। বিচারপতি এম.এ. আজিজও একটি সাংবিধানিক পদে কর্মরত থাকায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের ভেতর থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সংবিধান নির্দেশিত আর কোনো উপায় থাকলো না। ১৪ দলীয় জোট বিচারপতি মাহমুদুল হকের ব্যাপারে আগ্রহী হলে চার দলীয় জোট তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টা ইস্যুতে ২৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখ বিকেলে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানেও বিষয়টি সুরাহা না হলে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫৮ (গ) ৬-এর অনুচ্ছেদ মোতাবিক স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব চার দলীয় জোট স্বাগত

জানালেও ১৪ দলীয় জোট সংবিধানপ্রদত্ত সকল পন্থা প্রয়োগ না করেই সর্বশেষ পন্থা অনুসরণ করায় বিষয়টির সমালোচনা করে এবং এ ব্যাপারে তাদের অসম্মতি জানায়।

২৯ অক্টোবর ২০০৬ তারিখ বিকেলে বঙ্গভবনে মহামান্য প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে চারদলীয় জোট উপস্থিত থাকলেও ১৪ দলীয় জোট অনুপস্থিত ছিলো।

৩১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখ সন্ধ্যায় দশজন উপদেষ্টাকে নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হলো। এ দশজন উপদেষ্টা হলেন বিচারপতি মো. ফজলুল হক, ড. আকবর আলী খান, লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী, সি.এম.শফি সামি, ধীরাজ কুমার নাথ, এম. আজিজুল হক, মাহবুবুল আলম, ডা. সুফিয়া রহমান, বেগম ইয়াসমীন মুরশেদ ও বেগম সুলতানা কামাল।

দেশকে স্থিতিশীল করে বিশ্বাসযোগ্য একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাজ শুরু করলো। ২ নভেম্বর ২০০৬ তারিখ উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। প্রশাসনেও অনেক রদবদল করা হলো। র‍্যাবের মহাপরিচালকসহ অনেকের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হলো। পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে রদবদল করা হলো। নতুন আইজি ও ডিএমপি কমিশনার হিসেবে যথাক্রমে মো. খোদাবকস ও এ.বি.এম. বজলুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়া হলো। কিন্তু এসব কার্যক্রম আন্দোলনকারী দলসমূহকে আশ্বস্ত করতে পারলো না।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ও টানাপোড়েনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সরকারের চার উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ, ড. আকবর আলী খান, সি.এম. শফি সামি এবং বেগম সুলতানা কামাল ১১ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে একযোগে পদত্যাগ করেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার অতি দ্রুতই তাদের শূন্যস্থান পূরণে উদ্যোগী হয়। ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে ড. শোয়েব আহমেদ, প্রফেসর মইনউদ্দিন খান, মেজর জেনারেল রুহুল আমিন চৌধুরী এবং শফিকুল হক চৌধুরী নতুন উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। উপদেষ্টা পরিষদের হঠাৎ এ পরিবর্তনের কারণে ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের ব্যাপারে ধীরে ধীরে শঙ্কা বাড়তে থাকে। ১৪ দলীয় জোট তখনো নির্বাচনের 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' তৈরি হয়নি বলে চাপ অব্যাহত রাখে, অন্য দিকে চারদলীয় জোট নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

১৮ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে পল্টন ময়দানে ১৪ দলের সমাবেশে জাতীয় পার্টি ও এল.ডি.পি (ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী) যোগ দিলে ১৪ দলের পরিকল্পিত নির্বাচনী মহাজোট গঠিত হয়।

২০ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দলের দাবি অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ সঠিক রেখে সকল দলের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় পিছিয়ে দেয়া হয়।

৩ জানুয়ারি ২০০৭তারিখে হোটেল শেরাটনে জনাকীর্ণ এক সংবাদসম্মেলনে মহাজোট প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টার পদ আঁকড়ে থাকা, ভোটার লিস্টের ত্রুটি ও 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' তৈরি হয়নি বলে ২২ জানুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা দেয়। তারা ৭ ও ৮ জানুয়ারি সারাদেশে অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে তাদের চলমান সমঝোতা প্রক্রিয়া এবং দেশকে ভয়াবহ এক সংঘর্ষ থেকে বাঁচানোর যে চেষ্টা চলছিলো তা এক মুহূর্তে ফিকে হয়ে যায়। দিনে দিনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিকে মোড় নিচ্ছিলো। ৭-৯ জানুয়ারি সারাদেশে অবরোধ পালিত হলো। ভাংচুর, বিক্ষোভ, মিছিল আর বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে পুরো দেশ অচল হয়ে পড়লো।

মহাজোট ঘোষণা করলো, সরকার যদি নির্বাচনী কর্মকাণ্ড নিয়ে এগিয়ে যায় তাহলে ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে অবরোধ ও বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হবে। ২১ ও ২২ জানুয়ারি দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। তাতেও কাজ না হলে এরপর থেকে শুরু হবে লাগাতার কর্মসূচী। মহাজোটের এরকম কঠোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকলো। সংবিধানে উল্লিখিত নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করে চারদলীয় জোটও নির্বাচনের পক্ষে অনড় থাকলো।

এসময় ক্ষমতাধর কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করে জানালো, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী সহায়তা করলে জাতিসংঘ শান্তি মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য তারা জাতিসংঘকে অনুরোধ করবে। প্রচ্ছন্ন ও হুমকির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনুধাবন করতে আমার অসুবিধা হলো না।

(১১ জানুয়ারি) প্রথমে খবর ও পরে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে টেলিফোন পেলাম। আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল মি. গুইহিনো কোনোরকম ভনিতা না করেই জানালো, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতীত নির্বাচন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এরকম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি ভূমিকা রাখে তাহলে জাতিসংঘ শান্তি মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও জাতিসংঘের মনোভাব নিয়ে আমি নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাথেও কথা বললাম। তারাও একমত হলো, রাষ্ট্রের এ পরিস্থিতি মহামান্য প্রেসিডেন্টকে অবগত করে তাঁর দিক-নির্দেশনা চাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রসিডেন্টের সাথে কথা বলার জন্য সময় চাইলাম।

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে প্রেসিডেন্ট এক সময় সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারির পক্ষে মত দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ তিনি ভেঙে দেবেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির আশাঙ্কায় রাত এগারোটা থেকে সান্ধ্য আইন জারি করা হবে। প্রেসিডেন্ট রাতে জাতির উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ভাষণ দেবেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনূস অথবা ড. ফখরুদ্দিনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন।... কিন্তু তিনি (ড. ইউনূস) প্রধান উপদেষ্টা হতে আগ্রহী হলেন না।

*ড. ইউনূস অস্বীকৃতি জানানোর পর ড. ফখরুদ্দিনের নাম উঠে আসে। মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী ড. ফখরুদ্দিনের বাসায় যান এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন।... প্রায় আধঘন্টা পর তাঁর স্ত্রী ফোন করে তাঁর সম্মতির কথা জানালেন।"**

আওয়ামী লীগের অপরাজনীতির কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. ফখরুদ্দিন আহমেদকে নিয়োগ করা হয়। ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ ক্ষমতা গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি ইয়াজ উদ্দিন আহমেদকে প্রধান উপদেষ্টা করে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুরু হয় অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকারের শাসন। দেশ এক অজানা গন্তব্যের দিকে এগুতে শুরু করে।

সমাপ্ত

* "শান্তির স্বপ্নে" জেনারেল মইন ইউ আহমেদ।